সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

কথাশিল্পী হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর জীবনকালেই সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাকে বলে বিশুদ্ধ মননচর্চার ক্ষেত্র সেই প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর শিখরস্পর্শী সাফল্য সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়ত সেভাবে অবহিত নই। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর এই একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*-তে পাঠক তাঁর প্রতিভার সেই অন্যদিকটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। গল্প-উপন্যাসের মতো এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক স্বল্পপ্রজ লেখক। আবার তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যের মতোই প্রবন্ধগুলোও তাঁর গভীর জীবনবোধ, বিষয়কে তার সমগ্রতায় দেখার চোখ এবং শিল্পীর দায়বদ্ধতায় তাঁর বিশ্বাসকে তুলে ধরে।

লেখক বা সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব, উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টি, বুলবুল চৌধুরীর প্রতিভা, রবীন্দ্র সঙ্গীতের শক্তি, সূর্যদীঘল বাড়ি বা গান্ধী চলচ্চিত্র, ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ কিংবা কায়েস আহমেদ বা অভিজিৎ সেনের মতো সমকালীন লেখকদের রচনা প্রভৃতি যে-বিষয়েই তিনি কথা বলুন না কেন, তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক্ষমতা আমাদেরকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। এমনকি যেখানে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই সেখানেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে আমরা পারি না।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতোই প্রবন্ধগুলোও হয়ত একটানে পড়া যায় না কিংবা পড়েই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। ভাবতে-ভাবতে পড়তে হয়, আবার পড়তে-পড়তে থমকে ভাবতে হয়। কখনো তা পাঠককে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

'জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের গোটা সত্তাটিকে' প্রকাশের যে দায়িত্বের কথা ইলিয়াস বলেছেন 'চিলেকোঠার সেপাই' বা 'খোয়াবনামা'র পেছনে তাদের স্রষ্টার সে নিখাদ দায়বোধ ও দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতির চিনে নিতেও প্রবন্ধগুলো আমাদের সাহায্য করে।

ISBN 984 410 087 9

প্রকাশকের নিবেদন

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মৃত্যুর পরপরই এই একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লেখক বইটির জন্য একটি ভূমিকাও লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর, লেখকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ১৯৯৭-এর একুশের বইমেলায় আমরা প্রকাশ করেছিলাম তাঁর শেষতম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল।* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর প্রবন্ধগ্রন্থ *সংস্কৃতির ভাঙা সেতুর* বাংলাদেশ সংস্করণের দায়িত্ব নিয়েও নানা কারণে এতদিন আমাদের পক্ষে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেরিতে হলেও লেখকের এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটি এদেশের পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি। আমাদের আশা এই গ্রন্থটিতে পাঠক সমকালীন বাংলাসাহিত্যের একজন সেরা লেখকের প্রতিভার ভিন্নমাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান ভূমিকাটি আমরা বর্তমান সংস্করণেও সংযোজন করলাম। আর এজন্য শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'নয়া উদ্যোগ' (কলকাতা)-এর কাছে আমরা ঋণী। গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দেয়ার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা সুরাইয়া ইলিয়াসের প্রতি।

আহমেদ মাহমুদুল হক

কৃতজ্ঞতা

এই লেখাগুলো নানান আলোচনা সভায়, আড্ডায়, এমনকী দু-একটি সেমিনারেও বলা হয়েছিল, পড়া বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। কারণ এদের কোনো নির্ভরযোগ্য খসড়া তখন ছিল না। পরে বদরুদ্দীন উমরের চাপে, আনু মুহাম্মদের তাগাদায় আর মাহবুবুল আলমের উসকানিতে এগুলো বর্তমান চেহারা পায়। এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে ছাপা হয়। লেখার সময় এগুলোকে বই-এর মধ্যে আনার কোনোরকম প্রস্তুতিই ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো জোগাড় করে ফেলেন সুশান্ত মজুমদার, ফিরোজ আহসান, হাসান হাফিজ, মঈনুল আহসান সাবের, আজিজ মেহের, শোয়েব আনোয়ার ইলিয়াস, গৌরাঙ্গ মণ্ডল, অমিতাভ মালাকার এবং শাশ্বত ভট্টাচার্য। এবং তরুণ পাইন কলকাতা থেকে বইটি ছাপার ব্যাপারে প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগও করেন।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা আমার একটি বড় ভরসা। তিনি এই লেখাগুলোর মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে লেখকের উদ্বেগ ও ভাবনার ঐক্য লক্ষ করেন। এতে যদি দু'মলাটের মধ্যে এদের সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ না হলেও, মেনে নেওয়া যায়।

এই লেখাগুলো তৈরি হওয়ার এবং বই হিসেবে ছাপার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়ায় 'নয়া উদ্যোগে'র পার্থশংকর বসুর দুঃসাহস দেখে অবাক হই। তাঁকে ধন্যবাদ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬
৭০ এ আজিমপুর এস্টেট
ঢাকা ১২০৫

ভূমিকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই–খোয়াবনামার* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, স্পষ্ট চাঁচাছোলা ভাষায় আওয়াজ তুলেছেন : বাংলা উপন্যাস এবার রং ফেরাক : বন্ধ হোক "মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখবেদনার পাঁচালি", কথায়-কথায় মধ্যবিত্তকে, মধ্যবিত্তের ছকে-ফেলা কোনো ধাঁচকে, চরম-পরম বলে চালিয়ে-চাপিয়ে দেওয়ার কেচ্ছা। সন্দেহ নেই, ইলিয়াস যত উঁচু তারেই স্বর বাঁধুন, অধিকাংশ লেখক তাঁর আবেদনে সায় বা সাড়া দেবেন না, হাড়েপাঁজরায় মিশে-থাকা হাজার-এক সংস্কার, হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে-আসা নানান পাওনা-বিশ্বাস খেলাচ্ছলেও বাজিয়ে দেখবেন না। মুখে যাই জপান মনে-মনে তাঁরা ঠিক জানেন : খেলার প্রতিভা কম হলেই মঙ্গল : ঝুঁকি নিলে ঝক্কি বাড়ে, পরের পর 'তলবহুল' উপন্যাস গেঁথে তোলায় বেকার বাধা পড়ে। যাঁদের সহজ সিদ্ধি আর মুক্তহস্ত দানে বাংলা উপন্যাস ক্রমশ নিরাপদ হয়ে উঠেছে, আদতে তাঁরা কোনো না কোনো অতিচর্চিত অতএব বহুবিদিত বয়ানের ঘেরে-ঘোরে বন্দী। তাঁদের ভূমিকাও তাই একটাই : চালু সব বাচন-রচনাকে শুদ্ধ ও টেঁকসই রাখতে, দাগকাটা সব বাক-এলাকায় অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রুখতে, সীমান্তরক্ষীবৎ টহল দিয়ে ফেরা। অন্যদিকে ইলিয়াসের অভিমত : "কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—এটুকু জেদ না থাকলে কারও শিল্পচর্চায় হাত দেওয়ার দরকার কী?" সে-জেদ যে অন্তত জনতোষ সাহিত্যের জোগানদারদের নেই, থাকবার কারণও নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রচলিত মর্জিরুচির পোষক, সমাজবিবেকের অভিভাবক, দিকপাল সব লেখকদের পক্ষে তাই ইলিয়াসকে সহ্য করা, তাঁর সঙ্গে বনিবনায় আসা, বড়ই কঠিন। ইলিয়াস নিজেও তা ভালোরকম জানেন। জানেন বলেই তাঁর অভিপ্রেত পাঠক ও আবেদনের মূল লক্ষ্য বিশেষ এক গোষ্ঠীর লোকজন। সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের রোখ আছে, রোষ আছে, কায়েমি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যোঝবার জোর আছে। নিরেট বন্দোবস্তের ছিদ্র-সন্ধানে তৎপর, স্বভাব-জেহাদি এই লেখককুলই ইলিয়াসের বলভরসা : ব্যবস্থার বাম যারা তাদের সঙ্গেই তাঁর যত যা বিনিময়, যত যা বোঝাপড়া।

ইলিয়াস অবশ্য শুধু সন্ধি পাতিয়ে ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নন : মিতালির সুবাদে সংলাপের যে-জমি তৈরি হয় তাকে পুরোপুরি কাজে লাগান : সমগোত্রের লেখকদের

রচনায় আপোসের ফাঁকি পেলে চাপঢাকার বদলে নির্মম ভাবে উদ্ঘাটিত করে দেন, দরকারে খোলাখুলি সংঘাতে নামতেও পিছপা হন না। অযথা সমীহ করা বা ভাবালু প্রশ্রয় জোগানো স্পষ্টবাক ইলিয়াসের ধাতে নেই—যে যত নিকট তার যাচাইপরখে তত নির্মোহ তিনি। এটাই তাঁর সমালোচনার দস্তুর, ফের আত্মসমীক্ষারও।

চিলেকোঠার সেপাই-এর পর যিনি *খোয়াবনামা* লেখেন—এতই আলাদা দুই বই যে মনে হয় মলাটে লেখক-নামের মিলটা নেহাৎ কাকতালীয়—তাঁরই বলা সাজে : স্বউদ্ভাবিত রচনা-প্রণালীও এক মস্ত ফাঁদ ; কারও যদি "নিজের ব্যবহৃত, পরিচিত ও পরীক্ষিত রীতির বাইরে যেতে বাধো বাধো ঠেকে," "নিজের রেওয়াজ ভাঙতে মায়া হয়", তাহলে বুঝতে হবে তার শিল্পীজীবনে ইতি এই ঘনালো বলে। আর যার হোক; নিরাপত্তার স্বস্তি কখনো শিল্পীর অন্বিষ্ট হতে পারে না। বাস্তবতার দোহাই পেড়ে, সামাজিক অদলবদলের সঙ্গে নিছক তাল শুনে ঠেকা দেওয়াও তার কাজ নয়—পরিবর্তনের ঝোঁক কোনদিকে ধরতে চাইলে সাহিত্য-পাঠের পরিসরে জেনেবুঝেই তাকে গড়তে হয় অংশস্বতন্ত্র বিকল্প এক জগৎ। ঐ জানাবোঝার প্রেরণায় কেবল 'বক্তব্য' বা 'সিদ্ধান্ত' নয় পালটে যেতে পারে গোটা শিল্পঅবয়ব—তাতে হয়তো এমন কথাও তৈরি হতে পারে সাম্প্রতিকের নজিরসাক্ষ্যে যার তল পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য আজ না হোক, কাল বা পরশু ঠিক পাঠোদ্ধার হবে, উপস্থাপনার প্রয়োগসিদ্ধ রীতি ত্যাগ করলেই মোক্ষ মিলবে, তেমন স্থিরতাও নেই। ঐ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যারা বাস্তবের সম্ভাব্যতাকে খতিয়ে দেখতে যায়, শেষ পর্যন্ত হয়তো তাদের দু-একজন, সমাজরূপান্তরের যুক্তি চিনে ঘটিয়ে দেয় সাহিত্যযুক্তির রূপান্তর। গল্প-উপাখ্যানে যেমন ঘটিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সুতরাং এতে অবাকের কিছু নেই যে প্রাবন্ধিক ইলিয়াসের প্রধান অভিযোগ ও আক্ষেপের বিষয় হয় : স্পর্ধা থাকলেও, সাহস থাকলেও, বেশির ভাগ 'বিপ্লবী' লেখক সংকল্পের যোগ্য আধার খুঁজে পায় না কেন, চলতি মতের, চলতি মডেলের বিরূপতা সত্ত্বেও কিসের দায়ে কোন-সে বাধায় ঠেকে যায় তারা?

ইলিয়াসের প্রশ্নের একটি সিধেশাদা জবাব হল : 'আত্মচেতনা'র খামতি। সে-খামতি প্রকারভেদে বিচিত্র, তার দুর্লক্ষণও প্রচুর। তবে ঐ অ-ভাবকে নির্দ্বিধায় শনাক্ত করতে স্রেফ একটি লক্ষণ যথেষ্ট। সেই মোক্ষমটি হল : নৈতিকতার তামাম সমস্যাকে নীতিবাদিতার সহজ ঢং-এ, সরল অঙ্কে পেশ করা ; রপ্ত ভাষা-অভ্যাসের চাপে, জান্তে বা অজান্তে, শ্রেয় ও প্রেয়র ভেতর গোল পাকিয়ে একের ঘাড়ে অন্যকে চাপিয়ে দেওয়া। এর ফলে কখনো, যা আমাদের আছে, যাতে আমাদের তৃপ্তি, যার প্রতি আমাদের মমতা, তাই অন্বেষণের নামে, সংগ্রামের নামে, 'নতুন' কলেবরে ফিরিয়ে আনি ; আর কখনো, আদর্শ কোনো নিরিখ বানিয়ে, ভাবের ধ্বজা উড়িয়ে, এই ভেবে বেজার হই কিছুই কেন সাধের আদর্শভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না—ঐ গরমিল নিয়ে এমন চিন্তিত, এমন পীড়িত হই যে, চারধারে যাই দেখি তাই মনে হয় বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ। একদিকে : 'যা আছে'র স্তুতিগান ; অন্যদিকে : 'যা-নেই' তার জন্যে হাহাকার। দুই মনোভাব বা প্রেক্ষিতের ভেতর ফারাকটা কি নেহাৎ আপাত নয়। 'যা-আছে' এবং 'যা-নেই' দুয়ের ধারণাই যদি গোলাকার ও পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম ও সম্পূর্ণ হয়, দুই ভাবনারই আধেয় যদি সমান চিরসাব্যস্ত ইতিবাচক হয়, তাহলে কি হরেদরে ব্যাপারটা একই

দাঁড়ায় না? সত্যের নির্বিকল্প ছাঁচ যত পোঁথে বসে চৈতন্যে তত বাড়ে শুচিবায়ুর প্রকোপ—কাড়া-আকাড়া ছানতে-বাছতে এতই মগ্ন, এড়িয়ে-বাঁচিয়ে চলতে এতই ব্যস্ত, কাটছাঁট করতে এতই নিবিষ্ট হয়ে পড়ে গুরুগম্ভীর নীতিবাগীশরা যে তাদের আর খেয়াল থাকে না, তালেগোলে কবে ব্যবস্থার ছিদ্র-সন্ধানের কাজটাই গেছে ভেস্তে। 'সমাজস্বাস্থ্য' সম্বন্ধে পাকাপোক্ত কোনো বিধানকে সামনে রেখে যে-যাত্রার সূচনা, পরিণতিবাদী সে-যাত্রার অনিবার্য পরিণাম : সূচনা-বিন্দুতে ফিরে আসা। যার বিশ্বাস, বাইরের খোলস ছাড়াতে-ছাড়াতে একদিন ঠিক পাওয়া যাবে চিরসত্যের ঠিকানা, অবশেষে উন্মোচিত করা যাবে অক্ষত অন্তঃসার, সে আসলে অনড় : তার যাওয়া তো নয় যাওয়া। যে-প্রশ্নের উত্তর আগেভাগেই বাঁধা, ইতোমধ্যে জ্ঞাত, সে-প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থ হয় : 'যা-নেই'কে 'যা-আছে'র শাসন-অধীনে রাখা, আত্মনির্মাণের আখ্যানকে আর বাড়তে না দেওয়া। নিয়ন্ত্রণের চোরা অভিলাষ আছে বলেই না নীতিবাগীশরা অমন গোমড়ামুখো আর খিটখিটে, পরের জরিপতদন্তে অমন নির্দয়। নিঃসম্পর্কের সমালোচনা আত্মরক্ষার বর্ম বিশেষ তাতে নিজেকে ছেড়ে স্বচ্ছন্দে আর সবাইকে দু-হাত নেওয়া যায়। আত্ম-পরের নিপুণ বিশ্লেষ স্বচ্ছ করে দেয় বিশ্বকে—'শ্রেণী' বা 'লিঙ্গ'-সম তত্ত্বপ্রকল্পের, সমষ্টিবাচক যোগাত্মক সব ধারণার প্যাঁচপয়জারে জড়িয়ে পড়ার ভয় কাটে, ভুলের ভবে পথ খুইয়ে অহেতুক ঘুরে মরার আশঙ্কা দূর হয়। নৈতিকতার স্থলে নীতিবাদিতার মন্ত্র জপে বিস্তর সুবিধে আদায় করলেও একটি ব্যাপারে নীতিবাগীশেরা পার পায় না : হাস্যরসের বেলায়। তাদের রচনায় খুচরো ঠাট্টামস্করা-ব্যাঙ্গবিদ্রূপ ও বাঁধা গৎ-এর বক্রোক্তি মিললেও, ইলিয়াস-কথিত "কৌতুকে ক্রোধের শক্তি" কিংবা আর এক সম্ভাবনা, আক্রোশে রঙ্গের ছটা, হাজার ঢুঁড়লেও মিলবে না। ঐ শক্তি ও দ্যুতির উৎস হরেক স্বর ও অবস্থানের প্রতি যুগপৎ দরদ ও বিরাগ। একাধারে কৌতূহলী এবং বীতস্পৃহ হবে, যোগ-বিয়োগের দুই খেলায় মাতবে সমান উৎসাহে, নৈতিকতার দায় মেনেও সাজিয়ে দেবে উৎসবের পসরা, ভারিক্কি চালের তিরিক্ষে মেজাজের ভদ্রলোকদের কাছ থেকে তেমন প্রত্যাশা করা অসংগত, অশোভনও বটে। ভাবের ঘরের বাসিন্দাদের অন্য ঘরে অন্য স্বর শোনার সময় কই? বস্তুজ্ঞানের এমন বহর যে তাদের জড়-অজড়ের ডায়ালেকটিকে 'জড়' জিনিসটাই বেপাত্তা—'চৈতন্যে'র খবরদারিতে নিত্যরত ব্যস্তমস্ত ভাবুকরা শরীর নামক পদার্থটিকে দেখে কেবল ঠারেঠোরে, যৌনতার অবাধ প্রবেশ-প্রকাশ নিষেধ তাদের ভাবদুনিয়ায়। দোকানদারি বুদ্ধির বশে যৌনকর্ম আর যৌন আবেশ-স্ফুরণের মাপতোল এক বাটখারাতেই চালায় সভ্যভব্যরা। অতি অল্পে নিবৃত্ত হয় যারা তাদের উদ্দেশ করে এঙ্গেলস কবেই বলেছিলেন : '(এদের) লেখা পড়ো, তোমার সত্যি মনে হবে, জনগণের বুঝি যৌনাঙ্গ বলেই কিছু নেই।' ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে দেদার রঙ্গশ্লেষ আর যৌনতার খোলামেলা বিবরণ যে একে অপরের লাগোয়া আদৌ তা আপতিক নয়। "নীতিবাগীশ ব্যাপারটা মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খায় না", এই যাঁর ঘোষণা তাঁর পক্ষে ও-দুয়ের মিশেল ঘটানো খুব স্বাভাবিক।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে-সাক্ষাৎকারে-আলাপচারিতায় জন কয়েক বাঙালি সাহিত্যিকের নাম-প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে। যেমন : সুকুমার রায়। তাঁর মতে :

"স্যাঁতসেঁতে তরল আবেগতাড়িত" বাঙালিদের ভিড়ে আগাগোড়া বেমানান, "জীবনের সব বিষয় নিয়ে অবিরাম মজা করার ক্ষমতায়" অদ্বিতীয় সুকুমারের বৈশিষ্ট্য ঠিক এখানেই যে তিনি "কখনো মুগ্ধ করেন না, হাসাতে হাসাতে সচেতন করে তোলেন", "তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হওয়ার সুযোগ তিনি নিজেই দেন না"। তুলনীয় কারণে সুকুমার রায় বাদে আরো দুই কৌতুকের কারিগর ইলিয়াসের অতি প্রিয় : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিবরাম চক্রবর্তী এবং অতি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ : "যাঁর দেখার মধ্যে কোনো কিছুর সঙ্গে মাখামাখি ভাব ছিল না" তাঁর কৌতুকবোধও যে অসামান্য হবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এঁদের পাশেই আছেন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। রবীন্দ্রনাথ–ত্রৈলোক্যনাথ–সুকুমার–শিবরাম–মানিক ও ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা চালচেহারায় পৃথক ; কোথাও স্বখণ্ডিত কখনো পরস্পরবিরোধী ; তা–ও এঁদের নাম একসারিতে বসাতে ইতস্তত করেন নি ইলিয়াস। তাঁর যুক্তি : কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ভাবে, 'নির্বিকার, অথচ নিরপেক্ষ নই' এই দুরূহ সমন্বয় সত্য করে তুলেছেন ঐ পাঁচ শিল্পী। পক্ষপাতী নির্বিকারের চোখেই ধরা পড়ে বিকারের লক্ষণ। যার 'স্বাস্থ্য' নিয়ে বাড়তি মাথাব্যথা নেই, 'সাবধানের মার নেই' আপ্তবাক্যে মাত্রাছাড়া আস্থা নেই, সে–ই সুস্থ। সে–'স্বাস্থ্য' সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার সামর্থ্য, এক প্রবল ইন্দ্রিয়মন্যতা। অন্যদের মতো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকেও তা অর্জন করতে হয়েছে : কঠোর শ্রমে, কঠিনকে ভালোবেসে।

যে কখনো করে না বঞ্চনা : তাকে পেতে হলে এক মারাত্মক প্রমাদ থেকে আগে রেহাই পাওয়া দরকার : মুক্ত বিষয়ীর বিভ্রম। কর্তা আমি, কর্ম আমি, ক্রিয়াও আমি, স্বয়সাধনের প্রতিটি পর্বে নিত্যবর্তমান আমি—এ–স্বেচ্ছাবাদ, আর কিছু না, আত্মপ্রবঞ্চকের ভ্রান্তিবিলাস। শুধু 'চৈতন্য' নিয়ে যার কারবার, যার হিশেবনিকেশে 'স্পৃহা' আর 'প্রয়োজন' পাশাপাশি ঠাঁই পায় না, পঞ্চভূতের বিষয়রূপ নজরে আসে না, খোদ 'আমিত্বে'র বোধটাই তার অচিরে লোপ পায়। তন্ময় সমাজবিজ্ঞানী আর মন্ময় শিল্পীর মধ্যে তেমন তফাৎ নেই—অন্তিমে দুজনেরই এক রা, এক রায়। একপ্রান্তে নির্দেশ্যবাদ : ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি ; ব্যক্তিউচ্চারণ : দমিত–শাসিত। অন্যপ্রান্তে স্বেচ্ছাবাদ : ব্যতিক্রমের ছড়াছড়ি ; ব্যক্তিউচ্চারণ : উদ্দাম–উচ্চণ্ড। এ –দুয়ের ফেরে মাঝখান থেকে আসল কথাটাই উবে যায় : 'স্বাধীনতা'র প্রাকশর্ত 'আবশ্যিকে'র মর্মোদ্ধার ; বিষয়বন্ধনের সত্য যার এড়িয়ে যায় তার আবার মুক্ত বিষয়ীর অহংকার! বয়ান–সীমানার লঙ্ঘন যদি কারো লক্ষ্য হয় তাহলে 'সীমা' অনুধাবনের দায়ও তার ওপর বর্তায়। বস্তুর 'বিচার' শব্দের তাৎপর্যই হল সীমাসরহদ্দের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। মিশেল ফুকো যাকে বলেন 'limit attitude', সীমা–নিরীক্ষা', তা একইসঙ্গে ইতি এবং নেতিমূলক : বাধা সম্বন্ধে অবহিত হলে তবেই না বাধা পেরোবার প্রশ্ন ওঠে। মানবসমাজের আর বিশটা জিনিসের মতো গল্প উপন্যাসও অগুনতি ক্রিয়াবিক্রিয়ার, সমবেত চর্চাউদ্যমের পরিণাম, নিখাদ একক সৃষ্টি নয়। লিখন মানেই পুনর্লিখন : ভিন্ন কোনো পাঠের ভেতর থেকে, সমঝোতা বা বিবাদ যে–সুবাদে হোক, নতুন কিছু খাড়া করা দাগ কাটতে দাগা বোলাতেই হয় শিল্পীকে। নিশ্চেতন

দাগা বোলানো রক্ষা করে ধারাবাহিকতা ; সচেতন দাগা বোলানো দেখিয়ে দেয় কত রন্ধ্রময় সে-ধারাবাহিক। বিপরীত বিহারে মতি হলে লেখক আপনা থেকেই পঠন-ক্রিয় হয়ে ওঠে, উৎখননে নামে নিজের গরজে। ঐ গরজের অপর নামই ইতিহাসবোধ। ভাষা-অবস্থার বিচার মানে আত্মবিচারও, যে-আত্মতার অংশভাক আমি তারও বিচার। 'যা-আছে', 'যা-হয়েছে' তার খতিয়ান না নিয়ে নিজেকে স্বসম্পূর্ণ ভেবে যা-ইচ্ছে-তাই করলে, বাংলা সন্ধির নিয়ম মোতাবেক যা-হয় তা 'যাচ্ছেতাই'। পঠন-লিখন কূটগ্রন্থির এমনই মহিমা কেবল যে ঐ খতিয়ান নেওয়ার বাবদে নতুন কোনো আখ্যানের দিকে এগোতে পারে লেখক। খোয়াব বিনা গত্যন্তর নেই ; আবার, ইলিয়াসের জবানিতে : "স্বপ্নের বিশ্লেষণ ছাড়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আয়োজন নেওয়া যায় না, জিজ্ঞাসাবর্জিত স্বপ্ন এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ মাত্র।" স্বপ্নজিজ্ঞাসার তাগিদেই গল্পকার-ঔপন্যাসিক ইলিয়াসকে ঢুকতে হয় বাংলা গল্প-উপন্যাসের কন্দরে, সেখানে সঞ্চিত যত উক্তি-উপলব্ধি সব ঝেড়ে বেছে দাখিল করতে হয় স্বনির্বাচিত এক সংকলন। যে তাড়নাতে *তারাবিবির মরদ পোলা* বা *চিলেকোঠার সেপাই*-*খোয়াবনামা* লেখেন সে-তাড়নাতেই গল্প-উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিনি। ইলিয়াসের সাহিত্যচিন্তার সূত্রে ইলিয়াসের সাহিত্য পড়ায় হয়তো বিপাক আছে, কিন্তু এটুকু অন্তত জোর দিয়ে বলা যায়, তাঁর কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের পেছনে রয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক অভিনিবেশ। প্রবন্ধে তাই রাগ-ক্ষোভ-হাসি সব নিয়েই ইলিয়াস উপস্থিত—গল্প-উপন্যাসে যেমন তেমনি এখানেও তন্ন তন্ন করে দেখেন বাঙালি মধ্যবিত্তকে, জানতে চান ইতিহাসের কোন বাঁকে কোন উপায়ে সমাজ-সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সে, মধ্যবিত্তের সৃষ্টিতে সচরাচর কোন আদলে কোন প্রবঞ্চনায় হাজির হয় প্রান্তদেশের লোকজন—কোন রহস্য সে-আখ্যানে?

অতএব আশ্চর্যের কী, শিল্পসাহিত্য, শুধু শিল্পসাহিত্য কেন, রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি, বিষয় যাই হোক, ইলিয়াসের বিচারভাবনায় প্রায় আদি-প্রত্যয়ের গুরুত্ব পায় এক বিশেষ তত্ত্বধারণা : 'ব্যক্তি'। তাঁর চোখে ; 'আধুনিকতা'র ইতিবৃত্তে অন্যতম প্রধান ঘটনা : 'ব্যক্তির উত্থান ও পতন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিনাশ। পুঁজিবাদের সঙ্গে, নব্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে পুঁজিবাদের অচ্ছেদ্য যোগ : "ব্যক্তির আয়নায়" তাই ধরা দেয় পুঁজিবাদের শক্তি ও শোষণের চেহারা, বিজ্ঞানের কল্যাণ ও ধ্বংসের মূর্তি। ইলিয়াসের অভিধানে যা "ব্যক্তির আয়না" তারই পারিভাষিক আখ্যা : 'উপন্যাস'। পুঁজিবাদের প্রথম লগ্নে, 'ব্যক্তি' যখন সবে জাগছে, একটা বেতো ঘোড়ায় চেপে উদ্ভট সব অভিযানে বেরিয়ে পড়ে লম্বা টিঙটিঙে দন কিহোতে। ইলিয়াসের বিশ্বাস : সে-অভিযান আজ অব্দি বহাল আছে—বাস্তব ও বিভ্রমের আলেখ্য নানান রূপে প্রকাশ করে চলেছে ব্যক্তিচরিত্র। তাঁর উপন্যাস-সংক্রান্ত আখ্যানে দন কিহোতের আজব কাণ্ডকারখানা, সারভান্তেসের রোমান্স-বিরোধী পাঠ, আরম্ভবিন্দুর মতো—"চাকমা উপন্যাস চাই" ধ্বনি তোলার সময়েও দন কিহোতেকে স্মরণ করতে তাঁর ভুল হয় না। এর কারণ কি এই, পুঁজি যেমন ভৌগোলিক সীমার বেড়া মানে না, মানলে তার পোষায় না, তেমনি 'ব্যক্তি'র আবির্ভাবও অরোধ্য, সময়ের হিসেবে সামান্য হেরফের হলেও, দেশে-বিদেশে তার উদয় ঠেকানো অসম্ভব? ঐ বিমূর্ত 'ব্যক্তি' কি সংজ্ঞায় অবিকল্প, ধাম বহু

তবু নাম একশত ভঙ্গে ভরা আধুনিক পৃথিবীতে তাও কি হয়? এই দুই প্রশ্নের টানাপোড়েনে দ্বিধান্বিত ইলিয়াস মাঝেমধ্যেই পালটে ফেলেন অবস্থান—সুনিশ্চিত কোনো সমাধান দিলে তৎক্ষণাৎ জাগে সংশয়।

পুঁজির আন্তর্জাতিকতা বড় বিষম ব্যাপার। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে সর্বঘটে তার বিচরণ, কিন্তু তার ওপর দখল সবার সমান পাকা নয়। ঔপনিবেশিক তো বটেই, উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগেও ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় ভারত-বাংলার কপালে পুঁজির প্রসাদ তেমন জোটে নি। হৃষ্টপুষ্ট প্রথম বিশ্বের পাশে তৃতীয় বিশ্বকে বেজায় রুগ্ণ, বেজায় রোগাটে লাগে। 'ব্যক্তি'-বিকাশের মাত্রা যদি কেবল পুঁজির ভাগের অনুসারে নির্ধারিত হয়, তাহলে কে না মানবে : উপনিবেশের 'ব্যক্তি; জন্মমুহূর্ত থেকেই ক্ষীণ বিকলাঙ্গ, ইউরোপীয় বা মার্কিন বুর্জোয়ার মতন তেজ বা দাপট দুটোর কোনোটাই নেই। একই যুক্তিতে, দুর্বল 'ব্যক্তি'র আয়নাও তথৈবচ : ঝাপসা, ধোঁয়াটে। প্রাগাধুনিক পশ্চাৎটান, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, কুসংস্কার, উপনিবেশের উপন্যাসকে জোরদার সাজোয়ান কিছুতেই হতে দেয় না। উপনিবেশের ভৃত্যদের তাই দুর্ভোগের অন্ত নেই : প্রভুর নকল করতে চায়, করতে যায় অথচ বারেবারেই পণ্ড হয় সব আয়োজন। দুষ্টচক্রের এই নক্সা, এই নিদানের আড়ালে আছে একটি সরল প্রত্যয় : পশ্চিমের আখ্যান আর পাঁচিশটা আখ্যানের মতো ঠুনকো নয়, তা এক অধিআখ্যান : যাবতীয় বস্তুর শেষ ও সার, বিচারের এক ও অনন্য মাপকাঠি। যেন, পশ্চিমখণ্ডে যা প্রত্যক্ষ, যা জীবন্ত, তার অস্ফুট আভাস, তার প্রেতচ্ছায়া বাদে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে আর কিছু নেই : নেহাৎ যদি টুকরো-টাকরা বেখাপ কিছু থাকেও আদৌ সে-সব ধর্তব্য বা বিবেচ্য নয়। মার্কস কবেই সাবধান করে দিয়েছিলেন : পশ্চিমের ক্রমগতির গল্পকে সার্বভৌম ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্ব, সবখোল চাবি বানানো, ইউরোপীয় দম্ভের এক নমুনা : অন্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ক্রমমুক্তির পথে অন্তরায় তৈরি করার কল মাত্র। আমরা, উপনিবেশের মানুষরা, বিশেষত উচ্চবর্গের মানুষরা যে, অনেকসময় বিনা তর্কে পশ্চিমি মধ্যস্থতাকে মেনে নিই, মেনে নিই সহজ অভ্যাসে, তার অঢেল প্রমাণ আমাদের ইতিহাসে আছে। ফলে, প্রায়শ ভুলে মেরে দিই, ক্ষমতার দিগ্‌বিজয় সত্ত্বেও, পুঁজির ভুবনজোড়া প্রসার ও প্রতাপ সত্ত্বেও, পশ্চিমের নজিরে কোনো আখ্যান—রাষ্ট্রতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক অথবা সাহিত্যিক —পুরো গড়া বা পড়া যায় না। অমন বাঁকিয়ে চাওয়ায় আমাদের 'যা-আছে', 'যা-হয়েছে' তার চিহ্নসংকেত নিজেরাই চিনতে পারি না। বাঙালি মধ্যবিত্তকে ইউরোপীয় বুর্জোয়ার এক তরলিত সংস্করণ হিসেবে দেখবার ঝোঁক, সংজ্ঞার নানাত্ব নামঞ্জুর করে 'ব্যক্তি'কে 'homo-economicus' বা 'আর্থ-মানবের' বকলমে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, জায়গায়-জায়গায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো দলছুট লেখকের প্রবন্ধেও রয়েছে। যাঁদের ঘোর অপছন্দ করেন, যেমন বঙ্কিম, তাঁদের আলোচনাতেই সবচেয়ে অসতর্ক তিনি। নিঃসন্দেহে, তুলনা-প্রতিতুলনা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্য, আধুনিকতার অঙ্গই একরকম। তা ভুলে, 'যা-আছে' তা-ই খালি মহিমামণ্ডিত করে চললে জাতীয়তাবাদী/মৌলবাদী গাড্ডায় পড়তে হতে পারে, কিন্তু আবার তুলনার মানদণ্ড চূড়ান্ত-অনড় হলে তার দরুনও কম দণ্ড দিতে হয় না। এই উভয়সংকট থেকে নিস্তার

পেতে দরকার এক নতুন সমস্যাপট ; আমাদের 'সজ্ঞান' অতএব টানটান ইতিহাসবোধের মধ্যে 'অজ্ঞান' অতএব এলোমেলো যুক্তি-তক্কো-গপ্পের সংক্রাম, সার্বভৌম ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্বের ভূত ঝাড়তে আঞ্চলিক খোয়াবনামা। ঐ নতুন সমস্যাপটের, 'খোয়াবনামা'র, ছাপ বা নিশান কি ইলিয়াসের সাহিত্য-আলোচনায় আছে?

ইলিয়াসের আদর্শ 'ব্যক্তি' আসলে দ্বিধাবিভক্ত, দ্বৈতসত্তার : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ-ও। গোলটা ঠিক এখানেই। ইউরোপীয় সমাজ-আখ্যানের মডেল-নির্ভর ধারাভাষ্য অনুযায়ী : প্রথমজনকে এড়িয়ে গেলে দ্বিতীয়জনের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার ; প্রগতির পর্যায়ক্রম, সামাজিক বিবর্তনের রূপরেখা উপেক্ষা করে ধনতন্ত্র টপকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা, হঠকারিতার সামিল। ঐ বিধির বাঁধন পশ্চিমের উপহার : কাটে কার সাধ্য! আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতন শক্তিমান লেখকও সবসময় তা পারেন নি ; ধারাবিবৃতির ধোঁয়াশা কোথাও কোথাও তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছে। 'ভদ্রলোক' কেন 'বুর্জোয়া'-সমান হল না এই অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে মাঝেসাঝে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে উনিশ শতকের রথী-মহারথীদের ভালোমন্দ বিচার নিছক বুর্জোয়া ভাব বা অ-ভাবের ভিত্তিতে সারা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আংশিক সাফল্য ও বঙ্কিমের সমূহ ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইলিয়াস : "ব্যক্তির বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ... তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশ বারবার বাধা পায়" কিন্তু "মানুষকে বিপ্লবের দিকে উদ্বুদ্ধ না করলেও শক্তসামর্থ ব্যক্তি গঠনে রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষমতা অসাধারণ" ; "ইউরোপীয় উপন্যাসে ব্যক্তির পরিচয় পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে ... (আর) সমাজ বাস্তববোধের অভাবে ব্যক্তির ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে পারেননি বঙ্কিম"। দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব সাধিত না-হওয়া ইলিয়াসের খেদের কারণ ; সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ করেন : "ব্যক্তি থেকে আসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেখান থেকে আসে ব্যক্তিসর্বস্বতা। সমগ্র পশ্চিম এখন ব্যক্তিসর্বস্বতার চরম অসুখে ভুগছে, ভুগছে আমাদের দেশের মানুষও"। এই সর্বব্যাপী বিকারের ওষুধ কী, কোথায় মিলবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল 'ব্যক্তি'র খোঁজ? নিশ্চয়ই বিশ্বায়নের বর্তমানে নয় ; ধূসর অতীতেও নয় ; আগামীতে? কিন্তু প্রগতি ও উন্নয়নের সুভদ্র আখ্যানটির আঁট জোড়গুলো না খুললে কি সে-আগামীর পরিকল্পনা, নিদেন খসড়াটুকুও খাড়া করা যাবে? ইতিহাসবাদী প্রতিশ্রুতির ভরসা ছেড়ে নিমগ্ন বর্তমানের ভেতর থেকে ভবিষ্যৎকে যে দেখতে চায়, তারই মনে স্বপ্ন দানা বাঁধে, অবচেতনের অন্ধকারে এতকাল যারা তলিয়ে ছিল তাদের বের করে আনে সে। একচুল নড়তে নারাজ যে সে অবশ্য খোয়ার-পাগলের স্বপ্নে ধৃত মানুষের নাগাল পায় না ; প্রবীণ পাকার চোখে ওরা শুধুই কল্পজীব, অলীক মানুষ মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে 'বাস্তব' আর 'অলীকে'র মধ্যে চলাচলের এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছেন ইলিয়াস। বুর্জোয়া 'ব্যক্তি'র ধ্যানার্চনায়, বাস্তববাদের কুহেলিকুহকে শেষ পর্যন্ত মন টেকেনি বলেই সমাজ তথা 'ভদ্র'-বয়ানের প্রত্যন্ত কোণের বাসিন্দাদের আনতে পেরেছেন উপন্যাসের কেন্দ্রমূলে : ওসমান-আনোয়ারদের জায়গা কেড়ে নিয়েছে হাড্ডি খিজির আর তমিজের বাপের দঙ্গল। স্থানবদলের ওলটপালট কাণ্ড,

"মানুষের শাসিত স্পৃহা ও দমিত সংকল্পে"র মুক্তি কাম্য হলে নিঃসাড় 'ব্যক্তি'কে বরদাস্ত করার জো নেই। ইলিয়াসকে তাই 'ব্যক্তি'র বরাত ছেড়ে ফের নামতে হয় সমালোচনায় ; যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘরবার, আন্তরিক আদান প্রদান, প্রয়োজনে তাঁদেরও আক্রমণ করতে হয়, "ফাঁকিবাজির ভাঁওতা" টের পেলে জানাতে হয় ধিক্কার।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে ওসমানের চিলেকোঠায় নির্বিঘ্নে ঘুমোয় 'বিপ্লবী' আনোয়ার—তার মাথার ওপর চারকোণা মশারি, চারধারে দেয়াল। খিজিরের ডাকে ওসমান যে ওসমান সে-ও দরজা ভাঙে, আস্ত খেপে ওঠে, কিন্তু 'বিজ্ঞানমনস্ক' সুস্থমস্তিষ্কের আনোয়ার মোটে সাড়া দেয় না। স্বচ্ছন্দে ঐ ঘুমন্ত 'বিপ্লবী'কে প্রথা-বিরোধী মধ্যবিত্তের, তার প্রথা-বিরোধী কথাকর্মেরও, অন্যতম রূপক হিসেবে গণ্য করা যায় বাইরে এসেও যার ঘরটান ঘোচে না, ঘরটানের মায়া নিয়ে যে ভাবিত পর্যন্ত নয়, সে-ই আনোয়ার-প্রতিম। গল্প-উপন্যাসে যেমন তেমনি প্রবন্ধেও আনোয়ারদের কানে খিজিরের ডাক পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন ইলিয়াস : মধ্যবিত্ত স্বপ্নসাধের একবচনে মজে না থেকে নিজের এবং পরের স্বর যাতে বহুবচনের বিপুলতা পায়, "শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তি" যাতে যুক্ত হয় তাতে, সে-জন্যেই কলম ধরেছেন তিনি। তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য : ব্যক্তিগত ত্রুটিচ্যুতি নয়, শ্রেণীগত মুদ্রাদোষ ; তাঁর মূল জিজ্ঞাসা : কোন-সে দৃষ্টিসীমায়, কোন-সে দিশাপাশে বারেবারেই নষ্ট হয় 'সীমা-নিরীক্ষা'র ক্ষমতা।

"ন্যকা ন্যাকা ছবি" ও "ছিচকাঁদুনে গল্প-উপন্যাসের" চোটে ব্যতিক্রমী শিল্পীরাও যখন গুটিয়ে যায় তখনই বিপদ : তাল কাটতে গিয়েও সমে এসে মেলে তারা। সাম্প্রতিক সাহিত্য থেকে যুগপৎ ছন্দভঙ্গ ও ছন্দরক্ষার কটি মার্কামারা দুর্লক্ষণ প্রায় তালিকা-বদ্ধ করে দিয়েছেন ইলিয়াস : "হাস্যরসকে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে" ক্রোধজ্ঞাপনের অস্ত্র করেও "তরল কৌতুকে ক্রোধের চেহারা" ঢেকে ফেলা ; "সবকিছুতেই তৃপ্তির উদ্ধার শুনিয়ে মধ্যবিত্ত পাঠকদের তেল মারতে" "তোয়াজ করতে" না চেয়েও "[illegible] সাফল্যের নিরাপদ ও সুনিশ্চিতে পথ" ধরা ; শ্রেণীসম্পর্কের গহনে [illegible]ার সং উদ্যোগ সত্ত্বেও "এসো ভাই একটুখানি বিপ্লব করি" বুলি কপচে "মধ্যবিত্তসুলভ জাতীয়তাবাদের" স্রোতে গা ঢালা ; "অন্তরঙ্গ স্মৃতি"র উন্মোচনের সঙ্গে "নস্টালজিয়া"র প্রতারণা : "আঁটোসাঁটো কাঠামোর ভেতর "শিথিল বুনোট"। একতিল সর্ষের মধ্যে এতগুলো ভূত আবিষ্কার করেই না ইলিয়াস আওয়াজ তুলেছেন, বাংলা উপন্যাস এবার রং ফেরাক, দাখিল করেছেন তাঁর ঈপ্সিত উপন্যাসের ইস্তেহার : "কেবল সামাজিক বিকাশের ইতিহাস নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের কালপঞ্জি নয় কিংবা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণাও নয়, বরং জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের গোটা সত্তাটিকে বেদনায়, উদ্বেগে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশের দায়িত্ব" নেবে সে-উপন্যাস।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে এত কথা জমে আছে যে কথার টানে আরো কথা—কোনোটা সোজা কোনোটা বাঁকা—আপনা থেকেই উঠে আসে। তাঁর বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে যদি খটকা লাগে, বহু মতামতে আপত্তি জাগে, তা-ও তাঁকে আগপাশতলা অস্বীকার করা যাবে না ; যাবে না মূলত একটি কারণে : বাংলা ভাগ হলেও, মাঝখানে

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু

সংস্কৃতি নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'আজকালি বড়ো গোল' দেখা যায়। প্রতিপক্ষ ছাড়া কোনো তর্ক তেমন জমে না, সংস্কৃতি-বিষয়ে কথাবার্তায় একটি শত্রুপক্ষ জুটে গেছে, এই শত্রুবরের নাম 'অপসংস্কৃতি'। শহর এলাকায় তো বটেই, নিম-শহরে জায়গাগুলোতেও সচ্ছল, এমনকী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা রংবেরঙের নানারকম রম্য পত্রিকা, টিভি, ফিল্ম ও ভিসিআরের কল্যাণে অপসংস্কৃতির চর্চা প্রাণভরে দেখে এবং নিজেদের জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা চালায়। এই সাধনা আবার বিনা খরচায় হয় না, এর জন্য পয়সার দরকার। সদাপরিবর্তনশীল কাটছাঁটের কাপড়চোপড়, স্টিকার, চেন ইত্যাদি তো বটেই, কোকাকোলা থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, চরস, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, টিভি, ভিসিআর, হোন্ডা, গাড়ি-যে যেমন পারে-প্রভৃতি উপাদান ছাড়া এই সাধনা অব্যাহত রাখা বড় কঠিন। এখানে ক'টা বাপ-মা আছে যারা নিয়মিত এসবের জোগান দিতে পারে? তা সে-ব্যাপারেও সাহায্য করার জন্য আমাদের টিভি ও সিনেমাওয়ালারা সদাপ্রস্তুত। হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, লম্ফঝম্প প্রভৃতির ছবি দেখিয়ে যুবসম্প্রদায়কে এরা অর্থসংগ্রহের শর্টকাট পথ রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে পয়সা কামানো চলে, অন্যদিকে পয়সা কামাবার পদ্ধতিটাও ঐ ধরনের সংস্কৃতিচর্চার অবিচ্ছিন্ন অংশ। এইভাবে earn while you learn-কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবসম্প্রদায়ের একটি অংশ একই সঙ্গে অর্থোপার্জন ও সংস্কৃতিচর্চা দুটোতেই সমান পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। অর্থাগম হচ্ছে দেখে এদের 'রক্ষণশীল' বা 'রুচিশীল' বাপ-মাও চুপচাপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। কারণ কোনো কোনো কর্তব্যপরায়ণ পুত্র তাদের উপার্জিত অর্থের খানিকটা বাড়িতেও ঢালে। এ ছাড়া, এইসব যুবকের অনেকের মধ্যে আজকাল ধর্মচর্চার প্রবণতাও দেখা যায়। সব ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময় না-পেলেও শুক্রবার এরা মসজিদে যায়, মহা ধুমধাম করে ঈদ-শবেবরাত করে, পিরের পেছনে অকাতরে টাকা ঢালে, তাবিজ নেয়, সুলক্ষণা পাথর কেনে এবং মাজার দেখলেই সেজদা দেয়। এইসব দেখে পরহেজগার বাপ-মা বেশ তৃপ্ত—না, যে যা-ই বলুক, চুরি-ছ্যাঁচরামি, হাইজ্যাক, ডাকাতি যা-ই করুক, মদ-গাঁজা যতই টানুক, কিন্তু ছেলের আমার ধর্মে মতি আছে ; পিরের তেজে এইসব

উপসর্গ একদিন ঝরে পড়বে, ততদিনে ঘরে দুটো পয়সা আসছে আসুক, ছেলের কল্যাণে বাপ-মাও জাতে উঠতে পাচ্ছে, এটাই-বা কম কী?

সমাজের অগ্রসর অংশ বলে এই নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের অনুশোচনার অন্ত নেই। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা এতই সোচ্চার যে এটাকে তাঁরা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির পবিত্র গোদুগ্ধের ভাঁড়ে বিপুল পরিমাণ গোচোনা বলে ঠাহর করে ফেলছেন। তাঁদের কাছে আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রহ্লাদকুলে একমাত্র দৈত্য হল অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি প্রচারের দুর্জয় ঘাঁটি টেলিভিশন পর্যন্ত এই নিয়ে আফসোস করার জন্য তাঁদের হায়ার করতে শুরু করেছে। আমাদের কোনো কোনো বীরপুরুষ বুদ্ধিজীবী টেলিভিশনের পর্দায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চাপাবাজি করে দুটো পয়সা ও নাম কামাতে এতটুকু পেছপা হচ্ছেন না। এখন ক্যান্টনমেন্ট যেমন গণতন্ত্র বিতরণের দাতব্য কেন্দ্র, দরিদ্র ও শূদ্র দেশবাসীকে খাঁটি নির্জলা গণতন্ত্র সরবরাহের হুংকার শোনা যায় সেখানে থেকেই, নানারকম লম্ফঝম্প, ছ্যাবলামো, ভাঁড়ামো ও ইয়ার্কির ফাঁকে ফাঁকে, টেলিভিশনে তেমনি ঘোষিত হয় সুস্থ সংস্কৃতিপ্রচারের সংকল্প। তো সিনেমাই-বা বাদ থাকে কেন? ঢাকায় এখন ধর্মভাবদীপ্ত ফাইটিং ছবি তৈরির মড়ক চলছে। ভরসা করি, এমন ছবির মহড়া নিশ্চয়ই চলছে যেখানে কুঙ্ফু বা কারাতে-পটু বাঙালি-সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ কোনো বাহাদুর পিরের পড়া-পানি সেবন করে তার আঁটোসাঁটো প্যান্ট-গেঞ্জি-পরা প্রেমিকাকে বুকে জড়িয়ে 'দম-মওলা' বলে একটা হাঁক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে 'অপসংস্কৃতি'-নামক দানবের ওপর।

এই ধরনের সংস্কৃতিচর্চা, এর অনুকরণ, এর নানারকম ওঠানামা—সবই চলে মধ্যবিত্তসমাজে। মধ্যবিত্তসমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। একজনের অবস্থান সমাজের কোন স্তরে, তিনি কি মধ্যবিত্ত না উচ্চবিত্তের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবিত্তের বিভিন্ন উপ-বিভাগগুলোর মধ্যে কোনটিতে তিনি বিরাজ করেন—এ-সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এখন এখানে টাকাপয়সা রোজগারের চোরাগোপ্তা অলিগলি এত বেশি যে, যে-কোনো লোক একদিন বিত্তবান হবার স্বপ্ন দেখতে পারে। পয়সার জোরে সমাজের যে-কোনো স্তরে ওঠার বাসনা যে সকলের জীবনেই সফল হবে—তা নয়। বরং সিঁড়ির আকাঙ্ক্ষিত ধাপটি বেশির ভাগ লোকেরই নাগালের বাইরে থেকে যায়, কেউ-কেউ হোঁচট খেয়ে নিচেও গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাসনা পুষতে বাধা কোথায়? পোষা বাসনাটি দিনদিন ফাঁপে এবং কেউ-কেউ ভাবতে শুরু করে যে গন্তব্যে পৌঁছতে আর দেরি নাই। সুতরাং জীবনযাপনের মান ও পদ্ধতি এবার পালটানো দরকার। পাশ্চাত্য কায়দায় ওপরতলার জীবনযাপন অনুসরণ করার রেওয়াজ আমাদের এখানে তেমন পরিচিত নয়। বুর্জোয়া দেশগুলোর উচ্চবিত্তের জীবনযাপনকে আদর্শ ধরে নিয়ে মধ্যবিত্ত সেটাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও মানসিকতা তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওদিকে ওপরের ধাপে ওঠার জন্য মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এতই উদগ্রীব ও অস্থির যে এজন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা-ই সে আঁকড়ে ধরে। ঐ ধাপে পৌঁছবার জন্য মাজারে বা পিরের কাছে ধরনা দিতেও তার বাধে না। অথচ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া মানসিকতা এই ধরনের ধর্মান্ধতাকে অস্বীকার করে। আমাদের মধ্যবিত্তের জীবনযাপন কিংবা ঈপ্সিত জীবনযাপন এবং মূলবোধ পরস্পরবিরোধী। এদের জীবন তাই নিরালম্ব, এই জীবনের ভিত্তি, বিন্যাস ও তাৎপর্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন। এদের সংস্কৃতিও

যে নিরালম্ব ও উটকো ধরনের হবে এতে আর সন্দেহ কী? সামন্ত ও গ্রাম্য মূল্যবোধের সঙ্গে বুর্জোয়া জীবনযাপনের এই উৎকট মাখামাখির ফলে যে-সংস্কৃতি গজিয়ে ওঠে তাও অনেকের চোখে উটকো ঠেকে এবং তখন তাকে অপসংস্কৃতি বলে গাল দেওয়া হয়।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা বিশুদ্ধ কিংবা সংস্কৃতিচর্চার জন্য প্রাণপাত করে চলেছেন, নিম্নবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী তো দূরের কথা, সাধারণ ও আরোগ্যপিপাসু মধ্যবিত্তের মধ্যে তাঁরাও কি কোনোরকম সাড়া জাড়াতে পারছেন? সৃজনশীল শিল্পীর হাতে সংস্কৃতির সৌন্দর্যময় ও উদ্দীপ্ত প্রকাশ ঘটবার কথা। কিন্তু সংস্কৃতিচর্চার যে-সংগঠিত প্রকাশ শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমগুলোতে দেখি তা দিনদিন নির্জীব ও একঘেয়ে অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে ; কী সাহিত্যে কী চলচ্চিত্রে কী সংগীতে কেবল পানসে ও নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি চলছে।

একথা ঠিক যে আমাদের কথাসাহিত্যে আঙ্গিক আগের চেয়ে মার্জিত ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। সুখপাঠ্য গল্প-উপন্যাস অনেক লেখা হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে নানা কায়দায় একটিমাত্র কাহিনী বয়ান করছেন। সেই কাহিনীও আবার নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা নয়, তিরিশের দশকের কোনো প্রতিভাবান বা চল্লিশের কোনো বুদ্ধিমান লেখকের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের তরল ও বিকৃত সংস্করণ। ঢাকার রম্য সাপ্তাহিকগুলোতে বিভিন্ন পালাপার্বণে বছরে কম করে ডজন দেড়েক উপন্যাস বেরোয়। ঈদের জুতো-কাপড়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত ঐসব পত্রিকার দুএকটি কেনে এবং কয়েকদিনের মধ্যে সব লেখা পড়েও ফেলে। একটু তদন্ত করলে দেখা যায় যে এগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের—ছিচকাঁদুনে প্রেম ও ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মার্কা সেক্সের সঙ্গে উদ্ভট ও অভিনব বিপ্লবী প্রসঙ্গ চটকাবার ফলে এগুলো বেশ আঠালো হয় এবং পাঠক একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা এর সঙ্গে সেঁটে থাকেন। পাঠকদের সেঁটে রাখার কায়দা লেখকদের বেশ ভালোই রপ্ত হয়েছে। এজন্য এদের জাদুগিরি বলে হাততালি দেওয়া যায়, কিন্তু শিল্প বলে মেনে নেওয়া মুশকিল। মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে কোনো গভীর সত্য বা প্রশ্নের উন্মোচন সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত। পাঠককে প্রচলিত মূল্যবোধ বা সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করাতে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য ব্যর্থ।

আঙ্গিকের দিক থেকে আমাদের এখানে সবচেয়ে পরিণতি ঘটেছে কবিতায়। এখন পাঠযোগ্য কবিতার সংখ্যা অনেক। কিন্তু কবিতা লেখাও এখন খুব সহজ অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। ছন্দ, উপমা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প সব তৈরি হয়ে আছে ; এমনকী প্রতিবাদ ও সংকল্পের ভাষা পর্যন্ত সুলভ। এগুলো একসঙ্গে অ্যাসেম্বল করতে পারলেই একটি কবিতা খাড়া করা যায়। ফলে কবিতা জীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত।

সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা আজ অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া খুব দুরূহ। সঙ্গীতের যা-কিছু আজও মানুষকে, অবশ্যই মধ্যবিত্তসমাজের মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তার প্রায় সবটাই আগেকার রচনা। এমনকী আধুনিক কালে শহরের সম্প্রসারণের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত যে-নিঃসঙ্গতার অনুভূতি—তারও সফল অনুরণন সাম্প্রতিক সংগীতে পাওয়া যায় না, এজন্যও ধরনা দিতে হয় পুরনো কর্তাদের দুয়ারে। নৃত্যকলায় আজ শিল্পীর প্রচণ্ড, তীব্র ও গভীর অনুভূতি একেবারেই তরঙ্গায়িত হয় না বললে কি বাড়িয়ে বলা হয়? মুদ্রার কসরত দেখাবার মধ্যে নৃত্যের নৈপুণ্য আজ সীমাবদ্ধ।

সফল শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দ ও বেদনাকে অমূল্য করে তোলে, বাঁচাকে করে তোলে অর্থবহ এবং জীবনকে তাৎপর্যময় করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে প্রেরণা জোগায়; সাম্প্রতিক শিল্পচর্চা এইসব শক্তির সবগুলো হারিয়ে ফেলেছে। বিদেশি কিংবা অপরিচিত উচ্চবিত্তের জীবনযাপনে হাস্যকর অনুকরণেকে বলি অপসংস্কৃতি। এর উটকো চেহারা এত উদ্ভট, এত কিম্ভূতকিমাকার যে একে সহজেই কষে গাল দেওয়া যায়। কিন্তু যাকে 'রুচিশীল বাঙালি শিল্পচর্চা' বলা হয় যা মধ্যবিত্তের কর্তৃত্বে, মধ্যবিত্তের দ্বারা এবং মধ্যবিত্তের জন্য রচিত—তাও তো মধ্যবিত্তকে উদ্দীপ্ত করতে অক্ষম। শিল্পচর্চার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মেধা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, কিংবা শিল্পচর্চায় তাঁরা যথেষ্ট নিবেদিতপ্রাণ নন—এসব কথা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা হলে?

প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যে-বিচ্ছিন্নতার ফলে অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত বাঙালির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তেমনি আজ মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চাকে পরিণত করেছে একঘেঁয়ে ও প্রাণহীন নিস্পন্দ অভ্যাসে। কারও কারও মনে হতে পারে যে, এতে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের কী এসে যায়? অপসংস্কৃতির চর্চা যতই বাড়ুক তাতে তাদের কী? টিভি বা ভিসিআর-এর সম্প্রসারণশীল থাবাবিস্তার সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী ওসবের স্পর্শ থেকে মুক্ত। ওপরে উঠবার স্বপ্নসাধ লালন করা তো দূরের কথা, একমাত্র সম্পত্তি সবেধন নীলমণি প্রাণটি টিকিয়ে রাখতেই এদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অন্যদিকে মধ্যবিত্তের রুচি ও মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েও মধ্যবিত্তের বুদ্ধি ও আবেগের কাছে সাড়া-তুলতে-না-পারা সাম্প্রতিককালের 'রুচিশীল বাঙালি সংস্কৃতি'র ব্যর্থতায় নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর কিছু এসে যায় না। সুতরাং মধ্যবিত্তের যে-ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামে নিবেদিতচিত্ত, তারাই-বা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

মাথা থাকলে একটু ঘামাতে হয় বইকী! বিষয়টি যদি রাজনৈতিক কর্মীর মাথায় কামড় না দেয় তো বুঝতে হবে যে সেই মাথায় কামড়াবার মতো বস্তুর অভাব ঘটেছে। আমাদের এখানে সচেতন ও সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা প্রচলিত কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যেই। আজ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর ফল কারও জন্য ভালো হয়নি। নিম্নবিত্তের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একেবারেই নেই। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে দেশের শিক্ষিত অংশের সঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মানসিক ব্যবধান ক্রমে বেড়ে চলেছে। শিক্ষিত মানুষের প্রত্যেকেই হল এক-একটি বদমাইশ ও শয়তান—একথা ঠিক নয়। শিক্ষিত মানুষের একটি ছোট অংশ নিম্নবিত্তের মুক্তির জন্য স্থিরসংকল্প। এই অংশটির সঙ্গেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। তাদের কথাবার্তা, তাদের চিন্তাভাবনা, তাদের আচরণ ও ব্যবহার বুঝে ওঠা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর আয়ত্তের বাইরে।

মধ্যবিত্তের জন্য এই বিচ্ছিন্নতা মারাত্মক বিপর্যয় টেনে আনছে। যাকে 'বাঙালি সংস্কৃতি' বলে ঢাক পেটানো হয় তা যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মপ্রবাহ ও জীবনযাপন থেকে প্রেরণা নিতে না-পারে তো তাও অপসংস্কৃতির মতো উটকো ও ভিত্তিহীন হতে বাধ্য। তার বাইরের চেহারা যতই 'রুচিশীল রুচিশীল' হোক, তাতে ঘষামাজাভাব যতই থাকুক, তা রক্তহীন হতে বাধ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের রক্তধারাকে ধারণ না-করে কোনো দেশের সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা কখনো প্রাণবন্ত হতে পারে না। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে আজ

আমাদের সংস্কৃতি রুগ্ণদেহ, তার দৃষ্টি ফ্যাকাশে, তার স্বর ন্যাকা এবং নিশ্বাসে প্যানপ্যানানি। যার সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না, তার রাজনীতির ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা কম। আজ অনেক রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের সংগ্রামী তৎপরতাকে নিষ্ফল ভাবতে শুরু করেছেন। বামপন্থি কর্মীদের অনেকেই আজ হতাশ ও বিচলিত। বিভিন্ন বামপন্থি সংগঠনের অধঃপতন যে কোথায় নেমেছে তা বোঝা যায় যখন দেখি যে এরা আজ যে-কোনো ডানপন্থি, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণশত্রু দলগুলোর সঙ্গে জোট পাকাতে এতটুকু ইতস্তত করে না। জাতীয় সংহতি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা রক্ষা এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে এরা প্রমাণিত—জনদ্রোহী শিবিরে ভিড়ে যায়। কিছুদিন আগে নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তিসামর্থ্যের ওপর আস্থা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন শ্রেণীসংগ্রামে, 'স্বাধীনতা ও সংহতি'-রক্ষার দায়িত্বে কিংবা গণতন্ত্রের দামি পাথরটি খোঁজার জন্য এঁরা আজ ক্যান্টনমেন্টের নরঘাতকদের কাছে ধরনা দেন। এই অবস্থায় সৎ ও নিষ্ঠাবান বামপন্থি কর্মীর হতাশ না হয়ে উপায় কী? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারলে এই হতাশা এঁদের আচ্ছন্ন করতে পারত না। মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকট থেকে এঁরা মুক্ত নন। যে-জনসমষ্টির মুক্তির জন্য এঁরা সংগ্রামে নামেন তাদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতি এঁদের নাগালের বাইরে। যে-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সাহিত্য-শিল্পের দেহকে রক্তহীন ও চেতনাকে নিস্পন্দ করে তোলে, রাজনীতিকেও তা নিস্তেজ ও তাৎপর্যহীন করতে বাধ্য।

বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশই আসেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে এঁরা কিছু-না-কিছু লেখাপড়ার সুযোগ পান। গল্প উপন্যাস তো পড়েনই, কেউ-কেউ কবিতাও পড়েন। একটু বয়স হলে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে চারপাশের জগতের সঙ্গে পড়াশোনা ও নিজেদের চিন্তাভাবনা মিলিয়ে দেখেন। এঁরা স্পর্শকাতর ও অনুভূতিপ্রবণ নিজেদের শ্রেণীতে, এমনকী নিজেদের বাপ-চাচা কী ভাইবোনদের মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তসমাজে ওঠার দৌড়ে শামিল হওয়ার আহ্বান এঁরা প্রত্যাখ্যান করেন, সেই দৌড়ে প্রতিযোগী হওয়ার জন্য যেরকম চুরি-ছ্যাঁচরামি, বদমাইশি ও জালিয়াতি করা দরকার, তা এঁদের স্বভাবে নেই। চারপাশে দেখাশোনা এবং স্পর্শকাতর চেতনার সাহায্যে সমাজে শোষণের রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। রাজনৈতিক বইপত্র পড়ে সেই ধারণার সঙ্গে যোগ হয় সংকল্প—শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজগঠনের সংকল্প। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের থেকে অতিরিক্ত সুযোগ ভোগ করার সুযোগ পান বলে কারও কারও মধ্যে অপরাধবোধ কখনো মনে কাঁটার মতো বেঁধে। সুবিধাভোগ তখন তাঁর কাছে ভার বলে মনে হয় এবং এই ভার ঝেড়ে ফেলার প্রবণতাও সাম্যবাদী সমাজগঠনের আন্দোলনে যোগ দিতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান দৃঢ়চেতা ও সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হন। শ্রমজীবীদের শতকরা ৯০ ভাগ বাস করেন গ্রামে, তাঁরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু শৈশবকাল থেকে তাঁরা বড় হন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘোরতর প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ায় বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁদের কম নয়, বামপন্থি কর্মী-ছেলেদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে তাঁদের ভুল হয়

না। শ্রমজীবী মানুষ বোঝেন যে লেখাপড়া শিখেও এই ছেলেগুলো টাউট হয়নি এবং ধর্ম বা জাতীয়তাবাদ বা গণতন্ত্রের বুলি কপচানো ও ভোট বাগানো তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। বামপন্থি কর্মীদের নিষ্ঠা ও সততা সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ।

তবু শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে সংগঠিত করা বামপন্থি কর্মীদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে যায়। অন্তত এখন পর্যন্ত অবস্থাটা তা-ই। ১৯৬৯ সালের ব্যাপক গণআন্দোলনকেও বামপন্থি কর্মীগণ সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারেননি। অথচ এই আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে তাঁদের হাতেই। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়েও বামপন্থি কর্মীগণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না কেন? পার্লামেন্টারি রাজনীতির টাউট নেতাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ শ্রমজীবীগণ বামপন্থি কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না কেন? এর প্রধান কারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে বামপন্থি কর্মীদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা ও আত্মীয়তা লাভ করা অসম্ভব।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশই শহরবাসী। বামপন্থি কর্মীদের কাজ করতে হয় গ্রামে, কিন্তু তাঁরা মানুষ হয়েছেন শহরে। এই শহর প্রকৃত শহরও হতে পারে আবার নিমশহরও হতে পারে। রাজধানী বা জেলাশহর বা মহকুমা-শহর তো হতে পারেই, আবার থানা বা শিল্পএলাকা বা ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র বা রেলওয়ে জংশনকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা-নিমশহরও কিন্তু শহর। একটি শহর যত ছোট হোক, সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন আশেপাশের গ্রামের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এমনকী নিজেদের গ্রামের জমির ওপর নির্ভরশীল বা আধা-নির্ভরশীল পরিবারের স্কুল-কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েরা ছোটখাটো জীবনযাপন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই ছেলেমেয়েদের ছোটখাটো চাকরি-করা বা ছোটখাটো ব্যবসা-করা বাপচাচার জীবনের পরম সাধ এই যে, ছেলেরা ভালো চাকরি নিয়ে বড় শহরে যাক, ব্যবসা যদি করে তো বড় শহরে গিয়েই করুক। মেয়েদের বিয়ের জন্য তারা শহরবাসী বর খোঁজেন। শহরের প্রতি এই টান গ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীন করে তোলে এবং পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই উদাসীনতা ক্রমে পরিণত হয় অবজ্ঞায়।

উদাসীনতা ও অবজ্ঞার এই মনোভাবকে ঝেড়ে ফেলেই একজন তরুণ বামপন্থি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু যে-শ্রমজীবীর শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রামে নামা, তাঁদের জীবনযাপন সম্পর্কে অজ্ঞতা কাটানো সহজ কাজ নয়। বই পড়ে, নিজেদের দেখাশোনা ও বুদ্ধিবিবেচনার সাহায্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট। তিনি জানেন যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা খেয়ে প্রাণধারণ করেন, আমাদের এই দেশের অতি অল্প কিছু লোকের কুকুরও এর চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খায়। তিনি জানেন যে, আমাদের দেশের কৃষিশ্রমিকদের অধিকাংশই বছরের দীর্ঘ একটি সময় প্রায় অনাহারে দিন কাটান এবং না-খেয়ে না-খেয়ে তাঁর পাকস্থলীর কাঠামো এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে হঠাৎ একটু বেশি খেলে পেটে অসুখ হয়ে তিনি মারা পড়েন। তিনি জানেন যে চিকিৎসা হল তাঁদের কাছে পরম বিলাসের বস্তু। আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে গ্রামের শ্রমজীবীরা গ্রীষ্মকালে যে-পানি খান, এই সোনার দেশেরই ভদ্রলোকেরা তা-ই দিয়ে শৌচকার্য করার কথাও কল্পনা করতে পারেন না। বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী এসব কথা

জানেন। কেবল জানেন না, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন বলে উঁচু জাতে ওঠার দৌড়ে না-নেমে রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য বহু শতাব্দীর নিদারুণ শোষণের ফল। ইতিহাসের যতদূর দেখা যায়, বাংলার নিম্নবিত্তের সচ্ছল ছবি পাই না। এক হাজার বছর আগেকার বাংলা কবিতায় মানুষের নিত্যউপবাসের খবর আছে।

কিন্তু এই দারিদ্র্য দিয়েই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না। তাঁর জীবনযাপনে মানবিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ আছে এবং হাজার হাজার বছরের শোষণ তাঁর সুকুমার বৃত্তিকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। তাই তাঁর যথার্থ পরিচয়লাভের জন্য তাঁর সংস্কৃতিকে জানা একেবারে প্রথম ও প্রধান শর্ত।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা রাজনৈতিক কর্মীর কাছে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রধান ও একমাত্র পরিচয় এই যে, লোকটি অসম্ভব রকমের গরিব। একথা ঠিক যে, দারিদ্র্য যে-জীবনযাপন করতে তাঁকে বাধ্য করে তা মানবেতর। কিন্তু পশুর মতো জীবনযাপন করলেও তিনি যে মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করা দরকার। নইলে শ্রমজীবীর মানবোচিত জীবনের মান অর্জন করার সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে সম্ভব নয়।

দারিদ্র্য যতই ভয়াবহ ও প্রকট হোক, কেবল তা-ই দিয়ে কাউকে শনাক্ত করা হলে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হল না। যাঁকে সম্মান করতে পারি না, তাঁর সমস্যাকে অনুভব করতে পারব না। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী যত গরিব হোন না, তিনি একজন মানুষ। তিনি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবারের প্রধান, কারও স্বামী, কারও ভাই, কারও ছেলে এবং নিজের ছেলেমেয়ের বাপ। পরিবারের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাঁকেই। তাঁর মতো না-খাওয়া ও আধপেটা-খাওয়া মানুষের সমাজ আছে, সেখানেও তাঁর কিছু-কিছু দায়িত্ব থাকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে একটি ধর্মবিশ্বাসও তিনি বাপ-দাদার কাছ থেকে বহন করে এনেছেন, যদিও ধর্মচর্চার ব্যাপারে ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল নেই। ঈদে-পার্বণে নতুন জামাকাপড়ের খোঁজে তাঁকে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে হয় ; বেশির ভাগ সময় কিছুই মেলে না, তবু তৎপর তো হতেই হয়। পাড়ার বা সমাজের লোকের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহেও তাঁর ভূমিকা থাকে। সর্বোপরি তাঁর পেশা বা জীবিকা তাঁকে ব্যস্ত রাখে। কাজ যখন থাকে না কাজ দেওয়ার মালিকদের কাছে পাত্তা না-পেলেও পরিবারের দায়িত্ব থেকে তিনি রেহাই পান না। তখন নিজের এবং বৌ-ছেলেমেয়ের পেট ঠাণ্ডা রাখার চিন্তায় মাথাটা তাঁর গরম হয়ে থাকে।

এইসব ব্যস্ততা, তৎপরতা ও কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, চিন্তা ও দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিয়ে নিরক্ষর ও কপর্দকশূন্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী একজন আস্ত মানুষ। আস্ত একজন মানুষ কখনো সংস্কৃতিশূন্য জীবনযাপন করতে পারে না। যাঁর চিন্তাভাবনা আছে, দুঃখ-শোক, আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ-বিরক্তি ও ক্ষোভপ্রকাশের জন্য যিনি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন সংস্কৃতিচর্চা না-করে তার উপায় নাই। তাঁর সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে পরিচিত হতে না-পারলে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চেনা খুব কঠিন, অসম্ভব বললেও চলে। কিন্তু শিক্ষিত বামপন্থি বেশির ভাগ সময় ব্যাপারটি খেয়াল করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কৃতিচর্চা সীমাবদ্ধ কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলবার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হল

এই যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ কেবল খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত নন, সংস্কৃতিশূন্য একটি জীবনযাপন করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন।

একথা ঠিক যে, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চায় বিকাশ ঘটছে না, একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে তার বিবর্তন প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দারিদ্র্য যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁদের একই মানের জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, সংস্কৃতিচর্চাও তাঁদের একটি পর্যায়ে থেকে নতুন ধাপে উঠতে হোঁচট খাচ্ছে। কিন্তু নিম্নমানের জীবনযাপন সত্ত্বেও জীবনধারণ তো আটকে থাকে না, যে-করে হোক তাঁরা বাঁচেন। তেমনি যে-মানেরই হোক বা একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকুক, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চা তাঁর জীবনে অনুপস্থিত নয়। বরং এই সংস্কৃতিচর্চা তাঁর জীবনের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত, বাঁচার জন্য এটা তাঁর জীবনে অপরিহার্য।

পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্তের সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা অনেকটাই শৌখিন। এখানে কবি বা শিল্পীর কথা বলা হচ্ছে না। একজন যথার্থ কবি কী গায়ক কী চিত্রশিল্পী কী অভিনেতা কী চলচ্চিত্রকার তাঁর সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে উত্তীর্ণ করেন শিল্পে। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিল্পী তাঁর শিল্পচর্চার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সংকীর্ণতা ও আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে ফেলার সাধনা করে যান। সেটা মধ্যবিত্ত গ্লানি ও ক্লেদ প্রকাশের মধ্যেও হতে পারে, নতুন সুস্থ জীবনের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েও হতে পারে। কিন্তু গড়পড়তা মধ্যবিত্ত যে-সংস্কৃতিচর্চা করেন তা তাঁর জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। একই ব্যক্তির মধ্যে যখন ধ্রুপদ সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, ডিস্‌কো গান ও পপগানের প্রতি সমান ভক্তি দেখা যায় তখন বোঝা যায় যে সংগীত জিনিসটা তাঁর ভেতরে ঢোকে না, গানের ব্যাপারে তাঁর ভালোলাগা বলে কিছু নেই, এটার সাহায্যে সমাজে তিনি রুচিশীল ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হতে চান। সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান বা বায়োনিক উওম্যান সিরিজের ছবি দেখার জন্য উদগ্রীব ব্যক্তি একুশে ফেব্রুয়ারি কী পয়লা বৈশাখে কারুকাজ-করা-পাঞ্জাবি পরে বাংলা-প্রেম দেখাতে বের হন। অর্থাৎ, কোনোটাই তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত হতে পারেনি। কুলা, শিকা বা শীতলপাটি দিয়ে একজন আমলা কী ইঞ্জিনিয়ার কী অধ্যাপকের ড্রয়িংরুম সাজানো হলে বোঝা যায় যে তাঁর জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন এইসব বস্তু তাঁর কাছে গৃহসজ্জার অতিরিক্ত কোনো মূল্য বহন করে না।

নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চার উৎস হল তাঁর জীবিকা। তাঁর শ্রমের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বলে তাঁর সংস্কৃতিকে উপরিকাঠামোর পর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে। সংস্কৃতিচর্চা তাঁর কাছে কেবল মনোরঞ্জনের ব্যাপার নয়। কৃষক যখন গান করেন তখন মন হালকা করার উদ্দেশ্যে করেন না। গান না-করলে তাঁর শ্রম অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাঁকে গাইতে হয়। শরীরের সঙ্গে গানও তাঁকে জমিতে খাটতে সাহায্য করে। মাঝির গান তাঁর নৌকা বাইবার প্রেরণা। শুধু প্রেরণা বললে কম বলা হয়। উত্তাল নদী অতিক্রম করার জন্য তাঁর হাত দুটোর সঙ্গে গানের ভূমিকাও কম নয়। তাঁর কাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে গানের বাণী ও সুর সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তাঁকে কীর্তন কী রবীন্দ্রসংগীত কী নজরুলগীতি কী কাওয়ালি এমনকী ভাওয়াইয়া গাইতে হলেও নৌকা চালাবার কাজে তাঁর বিঘ্ন ঘটবে। উত্তর বাংলার যে-মানুষ গোরুর গাড়ি চালিয়ে পাড়ি দেন বিশাল প্রান্তর, তাঁর শরীরের শক্তি ভাওয়াইয়া। আধুনিক গান কী পপ তো দূরের কথা, ভাটিয়ালি গানও তাঁর

জন্য অপ্রয়োজনীয় ও শৌখিন। ছাদপেটার সময় শ্রমিক যে-গান করেন, ভারী কোনো জিনিস ঠেলে তুলবার সময়কার গান থেকে তা আলাদা। উঠানে ধানঝাড়ার সময় চাষি মেয়েরা যে-গান করেন, ঢেঁকিতে ধান ভানবার সময় ঐ গান গাইতে গেলে তা ঐ সময় শিবের গীত গাওয়ার মতো অপ্রাসঙ্গিক হবে। 'ধান ভানতে শিবের গীত' কথাটা মিছেমিছি প্রচলিত হয়নি।

শুধু গান নয়, নৌকার গলুই, লাঙলের জোয়াল, দায়ের ফলা, কাস্তের গা প্রভৃতি জায়গায় যেসব কারুকাজ করা হয় তার প্রত্যেকটির উৎস কিন্তু শ্রম, জীবিকার শ্রমকে সহজ করে তোলা। এইসব কারুকাজ মধ্যবিত্তসমাজের নামকরা শিল্পীর দ্বারা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তসমাজে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। এমনকী অতিউৎসাহী বামপন্থি কোনো শিল্পী হয়তো কারুকাজের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ছবি আঁকলেন। কিন্তু এর ফলে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। নৌকার গলুইতে এই ছবি খোদাইয়ের ফলে গলুই অতিরিক্ত ভারী বা পাতলা হয়ে যেতে পারে, যার ফলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন নৌকা চালাতে মাঝি অসুবিধা বোধ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কারুকাজের মান ও নৈপুণ্য উন্নত হলেও মাঝির জীবিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক না-থাকায় শ্রমসম্পাদনে তা তাঁর কোনো কাজেই লাগবে না। তা হলে দুদিন পর এই কারুকাজের ব্যবহার উঠে যেতে বাধ্য।

ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর বৈশিষ্ট্য মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা দরকার। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রধানত আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করা হয়, এমনকী বড় শহরগুলোতেও এর ব্যতিক্রম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর ভাষা তো অবশ্যই আঞ্চলিক। কিন্তু মধ্যবিত্তের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। যতই দিন যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে এই পার্থক্য ততই প্রকট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্তের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে গ্রামের এমনকী শহরের নিম্নবিত্তের প্রকাশভঙ্গি অনেকটা আলাদা।

নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের কথায় প্রবাদ ও উপমা ব্যবহার করার প্রবণতা অনেক বেশি। প্রবাদ, শ্লোক, ছড়া, আর্যা ও উপমার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের বাক্য অলংকৃত ও আকর্ষণীয় করে তোলেন। সরাসরি সরলবাক্য দিয়েও বক্তব্য প্রকাশ করা চলে, কিন্তু প্রবাদ-শ্লোক-ছড়া-উপমা প্রভৃতি বক্তব্যকে একই সঙ্গে তীব্র ও আকর্ষণীয় করে। মধ্যবিত্তের রুচির সঙ্গে এসব প্রায়ই খাপ খায় না, তাদের কাছে এইসব প্রবাদ বা শ্লোক বা ছড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাচনভঙ্গি পর্যন্ত অশ্লীল বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এই প্রকাশ তাঁদের জীবনযাপন ও চেতনার এত গভীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে যে শ্রমজীবীদের কাছে এসবের শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্নটি একেবারে গৌণ। আর মধ্যবিত্তের রুচিরও বলিহারি! টিভি ও সিনেমায় অভিনয়ের নামে স্বদেশি-বিদেশি মেয়ে-পুরুষদের চোখমুখ ও কণ্ঠের ন্যাকামি ও ছ্যাবলামি দেখে এরা অভিভূত, আর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মুখের ভাষা শুনে এঁদের কান একেবারে লাল হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীরা সেখানে ব্রাহ্মসমাজসুলভ সুরুচি ও সুনীতির বচনে মুখর। এইসব ব্যাপারে বামপন্থি বুদ্ধিজীবীরাও শুচিবায়ুগ্রস্ত। শ্রমজীবীর জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর ভাষা সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে আবেগ-অনুভূতির রাখোঢাকো-মার্কা প্রকাশ তাঁদের স্বভাবের বাইরে। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা বা

স্নেহ–বাৎসল্যের প্রকাশের ভাষাও মধ্যবিত্তসুলভ তুলতুলু মার্কা মিষ্টি হতে পারে না। ভাষাকে তাঁরা অলংকৃত করেন, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে করেন না। নিরক্ষর শ্রমজীবীর হাতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। ভাষায় অলংকার ব্যবহার করে এঁরা সাহিত্যচর্চার ক্ষুধা মেটান। এতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, কিন্তু এটা তাঁদের সংস্কৃতিচর্চার অংশ।

লেখক ও শিল্পীর হাতে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতি উঁচুদরের শিল্পে পরিণত হয়। উত্তর ভারতের লোকগীতির সুর বড় বড় শিল্পীর হাতে বিবর্তিত হয়ে রাগ–রাগিণীর পর্যায়ে উঠেছে। লোকের মুখেমুখে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলো। আধুনিক কালে শিল্প ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠে না, শিল্পীর সচেতন ভাবনা ও তৎপরতার ফল আধুনিক শিল্প–সাহিত্য। বিটোফেন, ভাগনার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সংগীতরচয়িতার শিল্পকর্মের উৎস হল ইউরোপের গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি। এঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ সচেতন প্রয়াসের ফল।

শ্রমজীবীর কাজের মধ্যে যে–ছন্দ ও গতি, নৃত্যে তারই মার্জিত ও সংগঠিত রূপ হল তাল ও মুদ্রা। শুধু তা–ই নয়, এই ছন্দ ও গতিকে একজন যথার্থ শিল্পী মানুষের মনোরঞ্জনে সীমাবদ্ধ রাখেন না। এর সাহায্যে তিনি তাঁর উপলব্ধি ও বক্তব্যকে জ্ঞাপন করেন। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতি শিল্পীর হাতে নতুন ব্যঞ্জনা পায়, এই সংস্কৃতি শিল্পে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে। শ্রমজীবীর ব্যবহৃত গান ও ছড়া, প্রবাদ বা প্রবচনকে লেখক উঁচুস্তরের চিন্তাপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করে তাকে নতুন মাত্রা দেন। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় এরকম পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। মধ্যবিত্তের সৃষ্টিতে শ্রমজীবীর জীবন আজকাল প্রায়ই পাওয়া যায়। বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে নিম্নবিত্তের জীবন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক জীবন সংগঠিত শিল্প–সাহিত্যে অনুপস্থিত বললেই চলে। যেটুকু আছে বাংলা ভাষার বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য ও ব্যাপক সংস্কৃতিচর্চার তুলনায় তা একেবারেই কম ও তাৎপর্যহীন।

কয়েকটি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এঁদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথাও কারও কারও লেখায় সার্থকভাবে এসেছে। কবিতায় নিম্নবিত্তের শোষণ ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এইসব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করেছে, মধ্যবিত্ত সংস্কার ও খাটো বাসনা ঝেড়ে ফেলে বামপন্থি রাজনীতির বন্ধুর পথে তাঁদের পদচারণা ঘটেছে। কিন্তু ঐসব সাহিত্য ও শিল্পকর্মে নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় না। তা হলে এসব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নিম্নবিত্তের জীবনকে স্থিরচিত্রের বেশি মর্যাদা দিই কী করে? শ্রমজীবীর জীবনযাপন, তাঁর ভুলভাল বা ঠিকঠাক বিশ্বাস, তাঁর সংস্কার ও কুসংস্কার, তাঁর পছন্দ–অপছন্দ, তাঁর রুচি, তাঁর ভাষা ও প্রকাশ, তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা, তাঁর ভালোবাসা ও হিংসা—এসব নিয়েই তো তাঁর সংস্কৃতিচর্চা, তাঁর সংস্কৃতির এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে কোথায়?

সাম্প্রতিককালে আফ্রিকান উপন্যাসে আমরা অন্যরকম দৃষ্টান্ত পাই। নাইজিরীয় লেখক চিনুয়া আচিবির উপন্যাসে নাইজিরিয়ার গ্রাম্যজীবনের গভীর ভেতরে ঢোকার সফল প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের পরিচয় তো আছেই, উপরন্তু সেই জীবনযাপন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার প্রবাদ–প্রবচন, শ্লোক এবং তাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ, সংস্কার ও কুসংস্কারের অপূর্ব ব্যবহারের ফলে। এই উপন্যাসগুলো

ইংরেজিতে লেখা। অথচ সম্পূর্ণ আলাদা—সবদিক থেকেই আলাদা—ভিন্ন মহাদেশীয়, ভিন্ন সভ্যতার, ভিন্ন রুচির, ভিন্ন সংস্কৃতির একটি ভাষায় নাইজিরিয় সংস্কৃতি উঠে এসেছে তার অস্থিমজ্জা নিয়ে। এখানে ব্যবহৃত অনেক কথা ও প্রবাদ, কী ছড়া ও শ্লোক, ইংরেজি কী পাশ্চাত্য এমনকী আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি রুচি অনুসারে অশ্লীল ও স্থূল। কিন্তু নাইজিরিয়ার পাশ্চাত্য শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও জীবন্ত রূপায়ণের জন্য লেখক সেগুলোকে তুলে এনেছেন অপরিবর্তিত অবস্থায় এবং একই সঙ্গে তাকে নতুন মাত্রা দিয়ে তাকে তাঁর উন্নত দার্শনিক চিন্তার বাহনে পরিণত করেছেন।

চিনুয়া আচিবির মানের লেখক বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যাবে, দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাঁদের কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু গল্পের জায়গাজমি ও মানুষের জন্য যে-মর্যাদাবোধ ও দায়িত্ববোধ নাইজিরীয় লেখককে উপন্যাসরচনায় উদ্বুদ্ধ করে তার শোচনীয় অভাবে মাতৃভাষায় লিখেও আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ বাংলা ভাষার প্রবাদ, প্রবচন, শ্লোক, ছড়া এবং সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেন না।

এর মানে কিন্তু এ নয় যে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে প্রদর্শনী ও আলোচনায় কিছুমাত্র ভাটা পড়েছে। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন ও বাউলের জনপ্রিয়তা শহরের মধ্যবিত্তের মধ্যেও খুব লক্ষ করা যাচ্ছে। মেলা বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিত অধ্যাপকগণ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অত্যন্ত তৎপর। এতে আপত্তির কী আছে? এর সাহায্যে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যদি গ্রামবাসী নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতির সামান্যতম অংশের পরিচয় পান তো তাতে পরস্পরের ব্যবধান কমে আসে। কিন্তু সেরকম পরিচয় তো মার্কিন কোটিপতিদের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যেক দিনই ঘটছে, টেলিভিশনের পর্দার দিকে একটু কষ্ট করে তাকালেই চোখ ভরে সেই সংস্কৃতিচর্চা দেখা যায়। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি আমাদের কাছে আজ কেবল প্রদর্শনীর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংস্কৃতি যদি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্পীর হাতে নতুন ব্যঞ্জনা না-পায়, তাঁর শিল্পকর্মে শিল্পী যদি এর নতুন মাত্রা দিতে না-পারেন, আধুনিক শিল্পী ও লেখক যদি সেমিনারে-সেমিনারে তাকে প্রশংসাই করে চলেন, কিন্তু নিজের শিল্পচর্চাকে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেন তো নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা দেশের সংস্কৃতিচর্চার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয় উদ্ভট ও নিষ্প্রাণ ব্যায়ামে।

নিষ্ঠাবান শিল্পী এবং বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনবেন কী উপায়ে? নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সঙ্গে কেবল মেলামেশা করলেই এই পরিচয় সম্পন্ন হয় না, মানুষের প্রতি গভীর মর্যাদাবোধ—কেবল ভালোবাসা নয়—গভীর মর্যাদাবোধই তাকে উদ্বুদ্ধ করবে শ্রমজীবীর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে।

বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থি রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই, বোধহয় অধিকাংশই, মানুষের প্রতি এই মর্যাদাবোধের পরিচয় দেননি। দফায়-দফায় বন্দুকের মাথায় যারা ক্ষমতায় আসে তারা হল পেশাদার খুনি। মানুষ তাদের কাছে চমৎকার গেম, শিকার-মাত্র। পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদদের কাছে শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র পরিচয় ভোটার হিসাবে। ছলে-বলে-কৌশলে মহামূল্যবান ভোটটি নিংড়ে নিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তকে ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলেন। বামপন্থি রাজনীতিবিদের কাছে শ্রমজীবী মানুষ হল

আন্দোলনের হাতিয়ার। তাঁকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারলেই বামপন্থি রাজনীতিবিদদের অনেকেই নিজেদের সফল বিপ্লবী ভাবেন। কিন্তু বামপন্থি রাজনৈতিক আন্দোলন তো পরিচালিত হয় শ্রমজীবীর শাসনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তা হলে তাঁদের কেবল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার রাজনীতিবিদরা পান কোত্থেকে? শ্রমজীবীকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে বামপন্থি রাজনীতিবিদদের মাঠে নামবার আর দরকার নেই। শ্রমজীবীর প্রতি মর্যাদাবোধ না-থাকলে বামপন্থি আন্দোলন চালাবার উৎসাহ কি শেষ পর্যন্ত টেকে? বরং তাঁদের প্রতি এই মর্যাদাবোধ নিয়ে এগিয়ে এলে বামপন্থি রাজনীতিবিদ বা কর্মী ইতিহাসের সকল ধারায় নিজেকে প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করবেন।

মানুষ শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়। কিংবা কোনো তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কেবল প্রয়োজনীয় উপকরণমাত্র নয়। শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের নির্মাতা। তাঁদের জীবনযাপনকে তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং শ্রমজীবীর জীবনযাপন ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জীবনের গভীর সত্যকে অনুসন্ধানের ভেতর শিল্পচর্চার অর্থময়তা নির্ভর করে। তত্ত্বের ভেতর যে-সত্য আছে, তাও উন্মোচিত হবে এই অনুসন্ধানের ফলেই। শিল্পসাহিত্যে প্রমাণ করার কোনো বিষয় থাকে না, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত সেখানে পাশাপাশি চলে, পরস্পরের সঙ্গে তারা সংলগ্ন, একটি থেকে আরেকটিকে ছিঁড়ে দেখানো চলে না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে শিল্পী যদি বিচ্ছিন্ন হন তো এই অনুসন্ধানে তাৎপর্যময় মাত্রা থাকে না, এটা ক্রমেই নিস্তেজ ও পানসে অভ্যাসে পরিণত হয়। শিল্পচর্চার প্রাণ ও গতিরক্ষার জন্য এই বিচ্ছিন্নতা দূর করা একেবারে অপরিহার্য, নইলে মধ্যবিত্তের শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা তো বটেই তার গোটা জীবনযাপন ভিত্তিহীন ও শূন্যতার ওপর এমনভাবে ঝুলবে যে তাকে সংস্কৃতিচর্চা এবং জীবনযাপনের ক্যারিকেচার বলে শনাক্ত করতে হবে।

উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা

কথাসাহিত্যচর্চার সূত্রপাত মানুষ যখন ব্যক্তি হয়ে উঠছে এবং আর দশজনের মধ্যে বসবাস করেও ব্যক্তি যখন নিজেকে 'একজন' বলে চিনতে পারছে তখন থেকে। স্ফীতকায় ধর্মকে কাটছাঁট করে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মানুষের ঘরে, সঙ্গে সঙ্গে পরকালও সরে যাচ্ছিল সমাজের আড়ালে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে কাউকে বাগ মানানো যাচ্ছিল না। রাজা থাকলেও রাজ্যের প্রধান শক্তি বলে তিনি আর বিবেচিত হচ্ছিলেন না, তাঁকে ছাড়িয়ে মাথাচাড়া দিচ্ছিল নতুন নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রই তখন সংগঠিত শক্তি, সমাজের গহিন ভেতরটাও চলে আসছিল তার হাতের নাগালে। এই হাত যে দরাজ তা বলা চলে না, তবে সামন্ত দরজার জগদ্দল পাথরের ছিটকিনি খোলার জন্য তার আঙুলগুলো বেশ শক্ত। সামন্ত দরজা ভেঙে পড়ায় সমাজের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সঙ্গে তার অধিকারের সীমানা ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। ধর্ম বা রাজাকে ডিঙিয়ে ব্যক্তি তখন নিজের বিকাশ ঘটাবার মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কবিতায় তখন থেকে ব্যক্তি চাইল নিজেকে শনাক্ত করতে। কিন্তু পুরনো আয়নায় যে-চেহারা আসে সেখানে নিজের মুখ আলাদা করে ঠাহর করা মুশকিল। ফ্রানচেস্কো পেত্রার্কা তাই নতুন একটা কাব্য-প্রকরণের অনুসন্ধান করেন যা প্রকৃতপক্ষে সামন্ত আমলের সুনির্ধারিত ও কঠিনভাবে শাসিত ফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। নিজেকে জানান দেওয়ার জন্য এই ফর্ম ভাঙার ফর্মের আশ্রয়। এই নতুন প্রকরণটিও আঁটোসাঁটো ; নির্দিষ্টসংখ্যক পঙ্‌ক্তি, অষ্টক ষষ্ঠক, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের জন্য এলাকা ভাগ প্রভৃতি নিয়মকানুনের শাসন সেখানেও রয়েছে। এর কারণ হল এই যে, শিল্পের জগতে রাতারাতি পরিবর্তন আসে না। এই আপাতবন্ধন সত্ত্বেও সামন্তবোধ-শাসিত মানুষের চেয়ে ব্যক্তির ডানা ঝাপটাবার সুযোগ এখানে অনেক বেশি। নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের ভেতর বাঁধা থাকলেও ব্যক্তি এখানে নিজের মতো করে নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেল।

কথাসাহিত্য ব্যক্তির মুক্তিপ্রয়াসের আর-একটি উদ্যোগ—আরও ব্যাপক, আরও সংগঠিত এবং আরও দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীল বলতে এখানে কর্তব্যপরায়ণতার কথা বলা হচ্ছে না, দায়িত্বশীল মানে এর ঘাড়ে কাজ আরও বেশি, কবিতার চেয়ে এ-পরিধি আরও বিস্তৃত। এক প্রকরণ ছাড়া কবিতার প্রায় যাবতীয় লক্ষণ আত্মসাৎ করেও প্রাথমিক কথাসাহিত্যকে আরও অতিরিক্ত ভার বহন করতে হয়।

প্রতিভার উর্দির ভেতর বসে কবি নিরাপদে কখনো জ্বলে ওঠেন বজ্রের মতো, কখনো ঘৃণায় বিস্ফোরিত হন, কখনো-বা প্রেমে নুয়ে পড়েন, কখনো-বা বাৎসল্যে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুভূতি বা উপলব্ধিকে কবি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর নিজের স্বভাব ও রুচির পথ ধরে তাঁর অনুসন্ধান চলে। ব্যক্তির প্রবলরকম উত্থানের পর কবির স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক বেড়েছে। যে-কোনো শিল্পীর মতো তিনিও স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না, কিন্তু নতুন প্রকরণ তাঁকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েছে যে তিনি নিজের জগৎকে গড়ে তুলতে পারেন নিজের রুচিমতো।

কথাসাহিত্যিক যে কারও অধীনে কাজ করেন তা নয়। শুরু থেকে তিনিও তৎপর ব্যক্তির স্বরূপসন্ধানে। কিন্তু তাঁকে এই কাজটি করতে হয় চারপাশের প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়ে। পেত্রার্কার মতো তাঁরই সমসাময়িক আরেক শিল্পী বোকাচ্চোকেও আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে সামন্ত বরফ গলিয়ে। পেত্রার্কার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব কাকতালীয় নয়, দুজনকে একই ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করতে হয়েছে, দুজনের প্রতিবন্ধকতা ছিল একই সামন্ত-দেওয়াল। কিন্তু পেত্রার্কা যেখানে নতুন প্রকরণে নিজের চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তির উন্মোচন করার কবোষ্ণ কাজে মগ্ন থাকেন, বোকাচ্চো সেখানে ব্যক্তিকে দেখেন আরও সব মানুষের অবস্থান এবং সমস্ত পরিবেশের ভেতর। তখন লেখক আর কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন না, সত্যকে জ্ঞাপন করার জন্য তাঁকে নানা ধরনের মানুষকে তুলে ধরতে হয় যা হয়তো তাঁর রুচি কিংবা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। কবির মতো কথাসাহিত্যিকও সত্য-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, কিন্তু কবির দায়িত্ব তার সারাৎসারটি প্রকাশ করা, কিন্তু এই সত্যটি জ্ঞাপন করার জন্য কথাসাহিত্যিককে পরিভ্রমণ করতে হয় বড় দীর্ঘ ও কখনো কখনো অস্বস্তিকর পথ। যে-প্রেক্ষিতে তিনি ব্যক্তির ভেতরটাকে উন্মোচন করেন, বেশির ভাগ সময়েই তা আর যাই হোক রুচিকর নয় ; শিল্পীর মার্জিত রুচি বলে যা পরিচিত তাতে তাঁর সায় নেই। কিন্তু কবির মতো এককথায় তিনি কিছু নাকচ বা ঘোষণা করতে পারেন না। ডব্লু. এইচ. অডেনের কবিতায় ঔপন্যাসিককে তাই শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়েছে এইভাবে :

> For to achieve his lightiest wish he must
> Become the whole of boredom ; subject to
> Vulgar complaints like love ; among the just
> Be just ; among the filthy filthy too ;
> And in his own weak person, if he can,
> Must suffer dully all the wrongs of man.

একজন কবি অভিনন্দিত হন ভিন্নভাবে, তাঁকে মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটু দূর থেকে। পাঠকের কাছে কবি প্রায় ঋষিতুল্য ব্যক্তি, তিনি সর্বজ্ঞ, সত্য উপলব্ধির নির্যাস দিয়ে তিনি জীবন সম্বন্ধে গভীর সত্যটিকে পাইয়ে দেন সবাইকে। কথাসাহিত্যিকের কাজও তাঁর সত্যটিকে প্রকাশ করা। কিন্তু মানুষের জীবনযাপন সেখানে খুব জরুরি, বলতে গেলে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। এই জীবনযাপন বেশির ভাগ সময়েই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। এর ভেতরকার স্পন্দনটিকে তাঁকে বার করতে হয়। কান টানলে যেমন মাথা আসে, ব্যক্তির জীবন বলতে গেলে চলে আসে সমাজ। সমাজের বাস্তব চেহারা তাঁকে তুলে ধরতে হয় এবং শুধু স্থিরচিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দনটিই বুঝতে পারা কথাসাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য।

পেত্রার্কার সনেটে ব্যক্তির যে-ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তার কারণ রয়ে গেছে সামাজিক কাঠামোর ভেতর, তা কিন্তু আড়ালেই থাকে, সে-সম্বন্ধে সরাসরি না-জানলেও পাঠকের চলে। কিন্তু এই ক্ষোভটি গদ্যে জানাবার জন্য জিওবান্নি বোকাচ্চোকে বয়ান করতে হয় সামন্ত-প্রভু ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ এবং ধর্মগুরু ও তাদের শিষ্যযজমানদের লাম্পট্য ও অনাচারের বিবরণ। 'আরব্য রজনী'তে যা ছিল ব্যাপক কামুকতা, বোকাচ্চিওর হাতে তা-ই হয়ে ওঠে সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাবান মানুষের ব্যভিচার। কিছু-কিছু সংস্কারকে ধর্মীয় মূল্যবোধের মর্যাদা দিয়ে-দিয়ে অমানবিক প্রথাকে ঐশ্বরিক বিধান বলে ঘোষণা করে কয়েকশো বছর ধরে যারা ব্যক্তির ও সমাজের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে বাধা দিয়ে আসছিল সেই সামন্ত-প্রভু ও পুরোহিত মশাইদের অন্তঃপুরে ব্যাপক তদন্ত চালান তিনি। এই তদন্তের ফল হল *ডেকামেরন*। একটু রুগ্‌ণতার লক্ষণ থাকলেও কথাসাহিত্যচর্চার এই প্রথম উদ্যোগে সমাজবাস্তবতা অনুভব করা যায়।

চার শতাব্দীর পর এই তরঙ্গ ওঠে বাংলা ভাষায়। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কারা? কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্ত—নতুন কলকাতা শহরের উঠতি ভদ্রলোক ও সামন্ত-প্রভুদের কীর্তিকলাপ মেলে ধরার ব্যাপারে এঁদের কারও প্রচেষ্টাকেই খাটো করে দেখা যায় না। নির্মীয়মান নতুন সমাজ সম্বন্ধে এঁদের মূল্যায়ন যা-ই হোক, এই ব্যাপারে এঁদের সচেতনতা ও মনোযোগ ছিল নিরঙ্কুশ। সমাজের বিকাশ সব সময় এঁদের সকলের সমর্থন পায়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এঁদের কারও কারও রক্ষণশীলতা আমাদের ধিক্কারের বিষয়। প্যারীচাঁদ মিত্র বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, এমনকী সতীদাহ নিবারণী আইনে তাঁর সায় ছিল না। *নীলদর্পণ*-এর উৎসর্গ-পত্রে ইংরেজ শাসকদের প্রতি দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি দেখে গা শিরশির করে। কিন্তু সমাজের বাস্তবতাকে এঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং সামাজিক পরিবর্তন বা সংস্কারে এঁদের সক্রিয় সমর্থন বা বিরোধিতার কথা তো অস্বীকার করা যায় না। *ডেকামেরন* লেখার সঙ্গে বোকাচ্চো লেখেন দান্তের জীবনী ; একদিকে ফাঁস করেন সামন্ত-প্রভুদের কাণ্ডকারখানা, আবার ইতালির নতুন প্রাণসঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজের হাতে। কালীপ্রসন্ন সিংহ নির্মীয়মান বাঙলা গদ্যে খিস্তিখেউড়ের মণিমাণিক্য গেঁথে কলকাতার সমকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরার সঙ্গে মহাভারতের অনুবাদ করার কাজটিকেও কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। দেবদেবীর মূর্তিভাঙার যজ্ঞ সম্পন্ন করেন যে-মধুসূদন, সেই মধুসূদনই আবার বুড়ো হাবড়া সমাস্ত-পাণ্ডাদের নষ্টামি ও ইতরামোর কথা ফাঁস করেন। এঁদের সবার প্রতিভা একস্তরের নয়, শিল্পকীর্তির মাপও আলাদা। তবু এক নিশ্বাসে নামগুলো বলা হল এইজন্য যে, বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি এঁরাই পালন করেছিলেন এবং প্রায় একসঙ্গে।

এই তৎপরতা শুরু হতে-না-হতে মুখ থুবড়ে পড়ল। বোকাচ্চোর পর নতুন সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন কিন্তু ইউরোপে অব্যাহত ছিল। পরবর্তী লেখকদের হাতে এর রূপ আরও পরিণত, আরও সংহত ও আরও সম্পূর্ণ হতে থাকে। *ডেকামেরন*-এর আড়াইশো বছর পর লেখা হয় *দন কিহোতের* মতো খুব উঁচু মাপের উপন্যাস। সামন্ত আমলের পরম শ্রদ্ধেয় গুণ নাইটদের বীরত্বকে এমনভাবে ঠাট্টা করা হয় যে তা হয়ে ওঠে বীরত্বপনা, তার অন্তঃসারশূন্যতা একেবারে অনাবৃত হয়। হাড়জিরজিরে ঘোড়ার আরোহী দন কিহোতে, সাঙ্কো পাঞ্জা হল সেই বীরত্বপনায় অভিভূত সাধারণ মানুষ।

ট্র্যাজেডির নায়ক রাজা বা রাজপুত্র মানেই যে অবিচল অটল ও স্থিরসংকল্প কোনো ব্যক্তিত্ব নয় সেই কথা জানিয়ে দেন দন কিহোতের সমসাময়িক এক রাজপুত্র। ডেনমার্কের যুবরাজের দ্বিধা, সিদ্ধান্তহীনতা ও দোদুল্যমান চিত্ত কিন্তু কোনো উদ্ভট বা উটকো বিষয় নয়। একিলিস কী হেক্টর কী অডিসিয়ুসের স্বভাবে টলায়মানতা কল্পনা করা যায় না। এই দ্বিধা কিন্তু যতটা হ্যামলেটের তার চেয়েও বেশি ডেনমার্কের যুবরাজের। তাঁর সংলাপে সামন্তসমাজের প্রধান প্রভুদের পাথরের প্রাসাদের চিড় ধরার আওয়াজ। প্রাসাদের ভিত কাঁপিয়ে ঐ সংলাপ ব্যক্তির দিকে আমাদের মনোযোগী করে তোলে। কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা এইভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সমাজ ফুঁড়ে ব্যক্তি আসে, সমাজব্যবস্থা তাই রক্তমাংস নিয়ে উপস্থিত হয়। *মার্চেন্ট অভ ভেনিস*–এ নরনারীর প্রেম আসে সমকালীন বণিকদের দাপট এবং একই সঙ্গে ইউরোপের ইহুদি–বিদ্বেষকে প্রকাশিত করার ভেতর দিয়ে। শেকসপিয়রের নাটকগুলো ছন্দে লেখা, কাব্যগুণ তাদের অসাধারণ, কিন্তু উপস্থাপনা ও বিকাশে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলে উপন্যাসের আলোচনায় তাদের ঢুকে পড়তে বাধা নেই।

দন কিহোতে, গালিভার'স ট্রাভেলস্, এ টেল অভ টু সিটিজ, ওয়ার অ্যান্ড পিস, ব্রাদার্স কারামোজভ এবং পরবর্তীকালে *ফ্যাটিসাইড, নসিয়া* বা রাবেলে ব্যক্তির যে–বিকাশ ও পরিণতি তার প্রেক্ষিত সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি। সমাজবাস্তবতা বলতে লেখকের বক্তব্য কী মতবাদের প্রয়োগ বোঝায় না। একজন রাজভক্ত লেখকের উপন্যাসেও সমাজবাস্তবতা থাকে। শুনেছি, শেকসপিয়র নাকি *ম্যাকবেথ* লিখেছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা জেমসকে খুশি করার জন্য। প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতি–বিরোধী লেখকের উপন্যাসেও সমাজ থাকে, সামাজিক বিবর্তন তাঁরা পছন্দ করুন আর না–ই করুন সমাজবাস্তবতাকে এড়িয়ে উপন্যাস লেখা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয়। একটি সমাজব্যবস্থা ভেঙে যখন আরেকটি ব্যবস্থার নির্মাণ চলছে, উপন্যাস লিখিত হতে শুরু করে তখন থেকে। ঐ ভাঙন ও গঠনের প্রক্রিয়ার ভেতরেই উপন্যাসের জন্মের কারণ রয়েছে বলে ঐ চরিত্র বাদ দিয়ে উপন্যাস কখনো সম্পূর্ণ চরিত্র পায় না।

কিন্তু আমাদের দেখি *আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নকশা, সধবার একাদশী* কী *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,* হাঁটি হাঁটি পা পা করার পর উপন্যাস জোর কদমে চলতে শুরু করতে–না–করতেই ঐ পা দিয়ে সমাজকে সে প্রায় ঠেলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম সফল উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং যে–লেখাতে তিনি আসর মাত করে দিয়েছিলেন, সেটার ঘটনা তাঁর সময় থেকে তিনশো বছর আগেকার। নিজের সমকালের বাইরে যেতে পারবে না এরকম শর্ত ঔপন্যাসিককে মানতে বাধ্য করা যায় না ; একশো বছর আগেকার নেপোলিয়ানের আক্রমণ তা হলে তলস্তয়কে আকর্ষণ করে কেন? সেই প্রেক্ষিত তাঁর সমকালীন সমাজের অবস্থান ও বিকাশকে বুঝতে আরও সাহায্য করে বলে সমকাল ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তা যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম। এই ভূমিকাটি পালন করতে না–পারলে পুরনো সময়ের পটভূমি পাঠককে জমকালো কাহিনী ছাড়া আর কী দিতে পারে? *দুর্গেশনন্দিনী* লেখার উৎস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই পূর্ণচন্দ্র যে–তথ্য দেন তা থেকে জানতে পারি যে, ছেলেবেলায় তাঁরা তাঁদের খুল্লপিতামহের কাছে মুসলমান রাজত্ব আমলের গল্প শুনতেন। উপন্যাসটি পড়ে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কেচ্ছার প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কাহিনীকে চলমান সমাজজীবনের দলিলে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর হয়নি।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমকালে তো বটেই, চিরকালের বাঙালিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সমাজসচেতন মানুষ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং নিজের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি একজন স্পর্শকাতর বুদ্ধিজীবী। কৃষককে শোষণ করার জন্য ইংরেজদের প্রবর্তিত বন্দোবস্ত সমর্থন করা সত্ত্বেও বাঙলার কৃষক সম্বন্ধে তাঁর লেখা প্রবন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের ওপর নির্যাতন ও শোষণের অসামান্য পর্যবেক্ষণের পরিচয় মেলে। 'সাম্য' অথবা *বঙ্গদর্শন-এর* কোনো কোনো সম্পাদকীয়তে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে-গভীর মনোযোগ ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয় তাতে তাঁকে আধুনিক বুর্জোয়া মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর এই পরিচয় অনুপস্থিত। উপন্যাসে তিনি প্রধানত কাহিনীকার। রাষ্ট্রীয় সংঘাত দেখাতে হলে চলে যান কমপক্ষে একশো বছর পেছনে এবং সেই সময়কার সমাজবাস্তবতাও সেখানে নেই বললেই চলে। আশ্চর্য আশ্চর্য সব বীরত্বপনা এবং অবিশ্বাস্য প্রেমের ভিয়েন চড়িয়ে তিনি যা প্রস্তুত করেন বাংলা ভাষায় মহা মহা পণ্ডিত সমালোচকরা ভক্তিগদগদ গলায় তাতেই তাঁকে বন্দনা করেন 'ঋষি' বলে। পরে সমকালীন বা প্রায় সমকালীন প্রেক্ষিতে যেসব উপন্যাস লেখেন সমালোচকরা আদর করে সেসবকে বলেন সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু সমাজের যে-কোনো ধরনের বিবর্তন তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিধবার প্রেম তাঁর দুই চোখের বিষ, দরিদ্র ও অসহায় পুত্রবধূকে বিনা অপরাধে ঘর থেকে দূর করে দেওয়া সত্ত্বেও হৃদয়হীন বিবেককে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না-থাকাকে তিনি রায় দেন পিতৃভক্তি ও আদবকায়দার পরাকাষ্ঠা বলে। একটি সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া দেখে তিনি নির্লজ্জের মতো হাসেন। মহিলাদের সম্মান করতে জানেন না তিনি। মহিলাদের ভাগ করেন তিনি মোটা দুই দাগে : ১ নম্বর ভালো এবং মহা ভালো, ২ নম্বর খারাপ এবং ভীষণ খারাপ। ১ নম্বরে পড়ে তারা যাদের জীবন নিবেদিত পতিদেবতার সেবায়। প্রফুল্লের মতো মেয়ে, ভবানন্দ যাকে মনে করেন ইস্পাত, যার ঋজু ও নিঃশঙ্ক স্বভাব যাকে পরিণত করে দেবী চৌধুরাণীতে, যার ব্যক্তিত্বে উদ্দীপ্ত হয় বিপুলসংখ্যক মানুষ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা পায়, তার জীবন চরম সাফল্য লাভ করে কিসে? —না, কাপুরুষ ও অপদার্থ স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণে এবং বদমাইশ, নিষ্ঠুর, অবিবেচক এবং শয়তান শ্বশুরের সেবায়। যারা নিজেদের মনোজগৎ ও আবেগের আহ্বানে সাড়া দেয় তারা হয় খারাপ মেয়েছেলে, তাদের স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিণতিকে জোর করে *ঠেলে* রেখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করেন তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে গলা টিপে ধরার কাজে। সামাজিক বিকাশও তাই তাঁর অনুমোদন পায় না। কিংবা সামাজিক চলমানতাকে এড়িয়ে চলেন বলেই ব্যক্তির বিকাশ তাঁর হাতে বাধা পায়। পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাই আগাগোড়া কাহিনীকেই প্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলো এক-একটি নিটোল সমাপ্তি পায়। সমাপ্তি, মানে একেবারে সম্পূর্ণ শেষ-হয়ে-যাওয়া সস্তা রূপকথায় ও রহস্য-উপন্যাসে। মানুষের জীবন-প্রবাহকে তুলে ধরা উপন্যাসের কাজ, সেখানে একটি নতুন ইঙ্গিত দিয়ে পরবর্তী সম্ভাবনার—ইতিবাচক নেতিবাচক যা-ই হোক-না কেন—কথা বলা হয়। এই কারণেই সমাজ, সমাজের চলিষ্ণু চেহারাটি উঠে আসে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে শেষ হয়ে যায় না, সামাজিক সংগ্রাম ও কর্ম, দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের ভেতর তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রয়ে

যায়। সমাজবাস্তববোধের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে পারেননি। ঔপন্যাসিকের ইচ্ছাপূরণে সহায়ক এমন নিটোল পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের বেশির ভাগ উপন্যাসকে বাক্সবন্দি কাহিনীতে পরিণত করেছে। অথচ শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি সব সময়ই পাঠককে একটি বড় রকমের প্রশ্ন বা কমপক্ষে অস্বস্তির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় : পাঠক নিজের ভেতর নতুন করে তাকান। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যতিক্রমী উপন্যাস হল *কপালকুণ্ডলা*। এখানে তিনি চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেননি। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের পরিণতি পাঠককে একটি ভোঁতা তৃপ্তি দেয় না কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চাৎপদ ও মানববিকাশবিরোধী কোনো মতামত আরোপ করার চেষ্টাও এখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বিকাশে এরকম বাধা দেন কেন? সমাজের স্পন্দন ও গতিকে মেনে নিতে না–পারলেও তার উপস্থিতি তো অস্বীকার করার কথা তাঁর নয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের লেখক কোন সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়ে বাংলা উপন্যাসের শ্বাসরুদ্ধ করার আয়োজন গ্রহণ করেন? মনে হয়, কোনো সামন্ত প্রাসাদের মতো শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের দুই মহল। একটি তাঁর 'অন্দরমহল', সেখানে তাঁর উপন্যাসের বাস। স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটলে সেখানে ঘোরতর অনাচার সৃষ্টি হবে ভেবে তিনি তটস্থ। অন্যটি তাঁর 'বহির্বাটি'। সেখানে সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্রের আড্ডাখানা। সেখানে একটু এদিক–ওদিক হলে কিছু এসে যায় না।

ইউরোপীয় উপন্যাসে ব্যক্তির যে–পরিচয় পরতের পর পরত উন্মোচিত হয়েছে এর কারণ হল, স্পন্দনশীল সমাজ সেখানে প্রেক্ষিত। এবং যে–সামন্ত ব্যবহারে ক্ষয় ঐ সমাজবিকাশের প্রধান শক্তি সেই ব্যবস্থাটির উৎপত্তি সেখানে হয়েছিল নিজের গতিতে। কেউ অনুগ্রহ করে সামন্ত–প্রভুদের প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। তারা প্রজাকে শোষণ ও নির্যাতন করেছে, তেমনি নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য কখনো রাজার সঙ্গেও দ্বন্দ্বে নামতে ইতস্তত করেনি। ধর্মীয় বিধিনিষেধের কালো পর্দাও তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। আবার তাদের অবক্ষয় ও বিকাশও ঘটেছে সামাজিক নিয়মেই। এই অবক্ষয় মানেই নতুন শক্তি বুর্জোয়াদের উত্থান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল বুর্জোয়াদের হাতে, ফলে বুর্জোয়ারাও কারও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করেনি। বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানে যে–দারুণরকম তোলপাড় ওঠে তাতে সমাজের এই বাস্তবতাই প্রতিফলিত।

ইউরোপের সেই তরঙ্গ এখানে ধাক্কা খায়, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে তা হয়ে রইল ঢাল ও তলোয়ারবিহীন শ্রীযুক্ত নিধিরাম সর্দার ন্যায়রত্ন তর্কবাগীশ মহাশয়। নিধিরামবাবু একটু পা–ঝাড়া দিতে শুরু করেছিলেন, সংস্কারশাসিত সমাজের বিবর্তনটি একটু দেখতে চাইছিলেন ; কিছুকাল পর হয়তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঢাল তলোয়ার তিনি অর্জন করতে পারতেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর ওপর চাপানো হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বোঝা। নতুন সামন্ত–প্রভু তৈরি করা হল, সামন্তব্যবস্থা এখানে ইতিহাসের নিয়মে বিকশিত হল না। এই কৃত্রিম ও যান্ত্রিক সামন্তব্যবস্থার প্রবর্তনে যাঁরা লাভবান হলেন, নতুন বিত্ত ও সম্ভ্রমের মালিক হলেন, উপন্যাসের মতো বুর্জোয়া প্রকরণটি জুটল তাঁদেরই হাতে। প্রকরণটি নতুন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফসল, কিন্তু নতুন সুবিধাপ্রাপ্ত এলিটরা নিজেদের ভাবতে লাগলেন একেকজন সামন্ত–প্রভু বলে। নিজেদের তাঁরা মনে করতে লাগলেন অভিজাতদের বংশধর বলে। এখন সমস্যা হল, সেরকম অভিজাতদের উপযুক্ত কীর্তিমান

প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবান পূর্বপুরুষ তাঁদের কোথায়? অতএব শরণ চাইতে হল অগতির গতি দেবদেবীর পায়ে। ভারতীয় প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলোকে পুনরুত্থিত করার প্রচেষ্টায় তাঁরা সক্রিয় হলেন। কিন্তু সমাজ তো পেছন দিকে চলে না, এমনকী থেমেও থাকে না। তাই সমাজের গতিকে প্রথমদিকের বাংলা উপন্যাস অনুভব করতে পারল না।

বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যক্তিকে বিকাশের প্রথম সুযোগ দেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের মানসিক বিবর্তন প্রায় নেই বললেই চলে। তারা উপন্যাসের শুরুতে যা, শেষেও তাই, এমনকী মাঝখানেও তাদের চেহারা পালটায় না। মাঝে মাঝে একেকটি দ্বন্দ্বের বিপাকে পড়লেও তাদের সম্বন্ধে প্রথমে যা জানি শেষ পর্যন্ত তারই স্ফীতকায় চেহারা পাই। রবীন্দ্রনাথই জীবন ও মানুষ তৈরি করেন যাদের গড়ে-ওঠা আছে, যাদের জীবনে বিকাশ আছে এবং যারা সমস্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিমেড সমাধান খুঁজে পায় না। গোরার আবরণ ও ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে তার স্বরূপ অনুসন্ধান। যে যতই বলিষ্ঠচিত্ত হয়, তার সংকট ততই তীক্ষ্ণ হতে থাকে। স্বদেশের পরিচয় লাভের জন্য তার ব্যাকুলতা একদিকে তাকে যেমন গৌরব দেয়, অন্যদিকে তার অসহায়ত্ব প্রকট করে তোলে। সামন্তব্যবস্থার আসন্ন ক্ষয় ও নতুন বণিকসমাজের উত্থান হল *যোগাযোগ*-এর পটভূমি। নতুন সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ নন, কিন্তু মধুসূদনকে বেড়ে উঠতে দিতে তিনি বাধা দেননি। বঙ্কিমচন্দ্র হলে দিতেন। *চোখের বালির* মনস্তাত্ত্বিক সংকট জীবন্ত ব্যক্তিকে নির্মাণ করে। বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তৎপরতা নিয়ে লেখা *ঘরে বাইরে* বাংলা সাহিত্যে প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস।

কিন্তু, তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশ বারবার বাধা পায়, তাদের সীমাবদ্ধতা প্রায়ই স্পষ্ট। ব্যক্তির বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এরকম হয়। এর কারণ এই যে, ব্যক্তি তার উপযুক্ত প্রেক্ষিত পায় না। যে-সমাজবাস্তবতার পরিচয় তাদের সমস্যা ও দ্বন্দ্বকে এবং সংকট ও পরিণতিকে তাৎপর্য দেবে তা প্রায়ই ঝাপসা এবং তার পরিসরও খুব সীমিত। সমাজ তার রক্তমাংস নিয়ে হাজির হয় না বলে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ থাকে।

এখানে আর-একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও উত্তেজনা তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত। সীমা ও অসীমের যে-বায়বীয় সমস্যা তাঁর কবিতাকে জর্জরিত করে, উপন্যাসে তার আভাস মেলে না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আধ্যাত্মিক সংকট প্রায় নেই ; কোনো কোনো জায়গায় যেটুকু নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে তাও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বলেই চিহ্নিত করা যায়। সেই সীমা ও অসীমের যন্ত্রণায় তারা কেউ কাতর নয়। এর কারণও ঐ একটিই। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে স্থাপন না-করলে অন্যান্য বিষয়ের মতো আধ্যাত্মিক ভাবনাও কোনো শিল্পমাধ্যমে শেকড় গাড়তে পারে না। তখন কবিতায় যে-সমস্যা এক শিল্পীর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় উপন্যাসে তার ঘোরতর অনুপস্থিতি দেখে সেই সমস্যার স্বতঃস্ফূর্ততা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ করতে বাধ্য হই। দস্তয়েভস্কি, কাফ্‌কা ও হারমান হেসের চরিত্রের আধ্যাত্মিক সংকট তীক্ষ্ণ ও গভীর হয়েছে উপন্যাসের সুপরিসর সামাজিক প্রেক্ষিতের জন্য।

সমাজের ছবি বেশ ছড়ানো রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। বাংলার গ্রামে বর্ণহিন্দুসমাজের অনেক খুঁটিনাটি তাঁর লেখায় বেশ উজ্জ্বল রেখায় উঠে এসেছে। তাদের ছোটোলোকামি, তাদের কোন্দল, তাদের রেষারেষি শরৎচন্দ্রের আগে বাংলা উপন্যাসে

অনুপস্থিত। কিন্তু এ-সমাজ অনড় ও অচল, এর মধ্যে কলহ আছে কিন্তু গতি নেই, এই সমাজ কোলাহলময় কিন্তু স্পন্দনহীন। শরৎচন্দ্রের প্রেক্ষিত তাই গ্রামবাংলার স্থিরচিত্র। শরৎচন্দ্র আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে একটির পর একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন, সমাজের স্থিরচিত্রে সেইসব চরিত্র সমাজের ভেতরকার স্রোতধারাকে নিয়ে আসতে পারে না। একথা খুবই সত্যি যে, তাঁর গল্পে নির্যাতিত চাষির সশ্রম পদার্পণ ঘটেছে, কিন্তু তাঁর বিপুল শিল্পসৃষ্টিতে কী শিল্পমানে কী পরিমাণে তাদের উপস্থিতি গুরুত্বহীন। যেসব সংস্কার এই সমাজে বিশ্বাসের অনুচিত মর্যাদা বলে গৃহীত সেগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা ধরতে পারেন না তিনি। বরং তাদের প্রতি তাঁর অনুমোদন রয়েছে। মনু যেসব বিধান দিয়ে গেছেন, বল্লাল সেন যেসব বালাই বাধিয়ে দিয়ে গেছেন তারই মর্যাদা আরও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন শরৎচন্দ্র। কিন্তু মনু তো চিরস্থায়ী নন, বল্লাল সেনের রাজত্বের অবসান ঘটেছে অনেক আগে। সমাজ কি ঐ আমলেই থাকবে? না আছে? সেইসব বিধান ও সেইসব বালাইকে গৌরব দিতে দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্রকে খাটো করে ফেলেন। বস্তুনিষ্ঠ থাকা আর সম্ভব হয় না। তাই সমাজবাস্তবতা যাকে বলি তা তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল।

সমাজবাস্তবতার এই অপরিহার্য প্রেক্ষিতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-প্রভু থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী চাষা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত। সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তনের আওয়াজ সেখানে পাওয়া যায়। সমাজের যে-চলমান চেহারা তাকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলে ছোট-বড় যে-কোনো উপন্যাসের জন্য বড় পটভূমি নির্বাচন করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। গ্রামের যে-ছবি তিনি আঁকেন তা কিন্তু কখনোই স্থিরচিত্র নয়, রক্তমাংসের মানুষকে নিজের নিজের স্বভাব অনুসারে বেড়ে উঠতে দেন তিনি এবং গ্রামের প্রেক্ষিত তাদের বিশেষ তাৎপর্য দেয়। তাঁর উপন্যাস এইভাবে একই সঙ্গে দুই ধরনের মানুষকে চিনতে আমাদের সাহায্য করে। মাঝারি বা ছোটখাটো ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের লোকজন এবং নিম্নবিত্ত কৃষক তাদের ক্ষোভ ও বঞ্চনা নিয়েই উঠে এসেছে। সমাজের গতিময়তায় তারাশঙ্করের সায় ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে রাতারাতি যারা ভূস্বামী হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকদিন ধরে পরম বশংবদ হিসাবে ইংরেজ শাসকদের সেবা করে এসেছে, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে তাদের অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। সামন্তব্যবস্থায় অর্জিত বিত্ত এই অবক্ষয়রোধে যথেষ্ট না-হওয়ায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে উপার্জনের অন্যান্য পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা থাকায় এই শ্রেণীর অনেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের সংকটে পড়েন। এঁদের একটি অংশ ঝুঁকে পড়েন কংগ্রেসের আপোসমূলক রাজনীতির দিকে। তারাশঙ্করের পক্ষপাতিত্ব এঁদের প্রতি এবং তিনিও কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক। এদিকে এঁদেরই প্রত্যক্ষ সহায়তায় ধারাবাহিক শোষণ ও নির্যাতনে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর অসন্তোষ আরও অনেক আগে থেকেই ফেটে পড়ার জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। নিজেদের অবক্ষয় ও অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্ত ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুঁজিবাদীরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন এবং নিম্নবিত্তের অসন্তোষকে ব্যবহার করেন নিজেদের স্বার্থে। তারাশঙ্করের রচনায় এই আন্দোলনও গৌরবান্বিত হয়েছে। শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে জীবন্ত উপস্থাপিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলার, বিশেষভাবে রাঢ় এলাকার, কৃষকের পরিচয় জানার জন্য তাঁর

উপন্যাস পাঠ করা জরুরি। কৃষক সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বেশ অন্তরঙ্গ এবং তার প্রকাশও সার্থক। গতিশীল সমাজবাস্তবতা তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিত, কিন্তু নিজের শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রায়ই পক্ষপাতিত্বে পরিণত হয়েছে বলে সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃত কারণ সেখানে অনুপস্থিত।

ইংরেজশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইংরেজিশিক্ষার কল্যাণে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে যে-পঙ্গু ব্যক্তির সৃষ্টি, তার ক্ষয় শুরু হয় এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে-আগে এই অবক্ষয় প্রায় চরমে ওঠে। এই অবক্ষয়কে কথাসাহিত্যে সফলভাবে তুলে ধরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের রচনায় এর পরিচয় পাই, কিন্তু তাঁদের কাছে বিষয়টি ছিল শৌখিন ও বিলাসিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের থেকে স্বতন্ত্র এইজন্য যে, সাহিত্যচর্চার শুরুতেই তিনি ব্যক্তির ক্ষয়কে একটি দুরারোগ্য রোগ বলে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। সমাজের অবক্ষয় ও ব্যক্তির অবক্ষয় কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তবে এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির অবক্ষয় তাকে ছিঁড়ে ফেলে সমাজ থেকে এবং অসহনীয় নিঃসঙ্গতা তাকে ঠেলে দেয় বিনাশের দিকে। *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র শশী নিজের গ্রামে নিজেকে উপযুক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তার মানবিক বোধসমূহ সংকটে পড়লে নিজের অস্তিত্বের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। *পদ্মানদীর মাঝি* কুবের বেঁচে থাকার সংগ্রামে রক্তাক্ত হয়েও এই বিচ্ছিন্নতার শিকার। যে-শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ সে, যাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের সে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাকেও কিনা পালিয়ে যেতে হয় অপরিচিত ও অনিশ্চিত ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে। এদের সংকট ও সমস্যা সবই কিন্তু উপস্থিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে। একথা ঠিক যে গ্রামের সমাজের খুঁটিনাটি ছবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকেননি। তারাশঙ্করের উপন্যাসের চরিত্রের মতো তাঁর চরিত্র জীবনযাপনের সমগ্রতা নিয়ে আসে না। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদ মন্তব্য করেছেন যে *পুতুল নাচের ইতিকথায়* গাওদিয়া গ্রামের সমাজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এখানে বলা চলে, সমাজপ্রেক্ষিত তুলে ধরার রীতি সব লেখকের যে একই রকম হতে হবে এর কোনো মানে নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের যে-প্রকরণ তাতে যে-কোনো মানুষ বা সমাজকে চিত্রিত করার জন্য সাজেশন ব্যবহৃত হয় অনেক বেশি। সমাজপ্রেক্ষিত কেউ নিয়ে আসতে পারেন সামাজিক জীবন বা ব্যক্তির জীবনযাপনের ডিটেলসসুদ্ধ, আবার এই জীবন বা জীবনযাপনের কথা ইঙ্গিতেও বলা সম্ভব। শশীর পরাজয় বা কুবেরের পলায়নের যে-পটভূমি পাওয়া যায় তাতেই গাওদিয়া বা পদ্মানদীর তীরের সমাজের পরিচয় উপস্থিত। তাঁর রচনায়, বিশেষ করে যেসব লেখায় ব্যক্তির ক্ষয় ও গ্লানি প্রকাশিত হয়েছে তার কোথাও এসবকে সমাজনিরপেক্ষ বলে উপস্থিত করার জো নেই। এই সমাজবাস্তবতা না-থাকলে কোনো লেখকের পক্ষে এই নির্বিকার ও নির্লিপ্ত মানসিকতা অর্জন করা অসম্ভব।

সমাজবাস্তবতাবোধ প্রথম থেকে ছিল বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে মার্কসবাদকে সামাজিক ও ব্যক্তিরোগের সমাধান বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সমকালীন অনেক লেখকের মতো রোগবিলাস-রোগে আক্রান্ত হননি বলে অবক্ষয়ের প্রতিষেধক খোঁজার জন্য তিনি প্রথম থেকেই তৎপর ছিলেন। মার্কসবাদকে তিনি উপযুক্ত সমাজপদ্ধতি বলে বিবেচনা করে তার পর্যবেক্ষণে এই দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করেন। মার্কসবাদী হওয়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। ব্যক্তির ক্ষয় ও রুগ্ণতা যখন তাঁর প্রধান মনোযোগের বিষয় ছিল তখনও সমাজ কাঠামোর ওপর তাঁর নিদারুণ বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে। প্রেম, বাৎসল্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি ইতিবাচকতা, জীবনযাপনের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক সব অনুভূতি যে স্বার্থপরতা ও মানসিক বৈকল্যের চাপে কোনো সচেতন বা অবচেতন ভানে পরিণত হয়েছে—এই সত্যটি তিনি প্রকাশ করেন কোন্ পটভূমিতে? যার ভেতর থেকে মানুষ এইসব ভান নিয়ে মাতামাতি করে বা মাতামাতি করারও ভান করে সেই সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রত্যাখ্যান না-করলে ওঁর শিল্পসৃষ্টিতে এরকম নির্লিপ্ত ও নির্বিকার থাকা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হতো না। গভীরভাবে বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বলে প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজের নিয়মের এই বিকৃতিতে বিরক্ত হলেও ভেঙে পড়েননি। তাই উপন্যাস বা গল্পের বুনোট কখনো শিথিল হয়নি কিংবা নিজেকে অনুচিতভাবে কাহিনীর মাঝখানে হাজির করেননি। চরিত্রকে মানুষ হবার সুযোগ দিয়েছেন এবং স্রষ্টা হিসাবে নিজেকে তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত করেননি। এমনকী যে-চরিত্র এসেছে একেবারেই কল্পনা থেকে সেই হোসেন মিয়া তার কাজে কামে, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, সাধে আহ্লাদে, সাহসে দুঃসাহসে ও ফন্দিতে ফিকিরে এমনভাবে পরিণতির দিকে এগোয় যে ঘৃণাক্ষরেও তাকে অপরিচিত মনে হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জন্ম বলেই হোসেন মিয়া কাল্পনিক মানুষ হলেও অবাস্তব হয়ে যায় না। আমরা বুঝতে পারি, একটি ঔপনিবেশিক সমাজে বহু মানুষের মধ্যে হোসেন মিয়া থাকে, আস্ত গতরটা নিয়ে না-থাকলেও টুকরো টুকরো হয়ে বিরাজ করে।

এইরকম বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পীর পক্ষে মার্কসবাদী হওয়া কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়, বরং তাঁর ঐ অবস্থার পরিণতিতে সমাজবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়াটাই বেশি স্বাভাবিক। তবে এই পরিণতিলাভের জন্য তাঁকে যে-পথ বেছে নিতে হয় তা কিন্তু মোটেই মসৃণ নয়। প্রাক-মার্কসবাদী চরিত্র ও মানবিকতা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লেখা অব্যাহত রাখতেন তা হলেও বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে চিরস্থায়ী আসন বজায় রাখতে তাঁকে বেগ পেতে হতো না। নিজস্ব প্রকরণ তিনি অর্জন করেছিলেন, ভাষার বুনোট, চরিত্রসৃষ্টি, মনোবিশ্লেষণ, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক যাচাই করা, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর উৎকর্ষ যে-স্তরে পৌঁছেছিল তার সাহায্যে একজন শিল্পী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। ঐ অবস্থায় থাকলে লেখক হিসাবে রক্তপাত পরিশ্রম তিনি এড়াতে পারতেন এবং খ্যাতির নিরাপত্তার জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে হতো না।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল মনোবিকলনের সফল রূপকার নন। মানুষের ভান ও সমাজব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েই তিনি দায়িত্বপালনের তৃপ্তি অনুভব করেন না। যে-কোনো মাপে বড় শিল্পী বলে তিনি মানুষের ও সমাজের প্রকৃত বিশ্লেষণের কর্তব্য স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেন এবং আর-একটু এগিয়ে এই অসহনীয় অবস্থাটি পালটে দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তাঁর এই পর্বের রচনায় শিল্পসফলতা নিয়ে নানারকম সন্দেহ ওঠে, মনে করা হয় যে নতুন মোড় নেওয়া তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি। তাঁর রচনায় সংহতি নষ্ট হয়েছিল, কারও কারও মতে তাঁর আগেকার প্রকরণ ও ভঙ্গি অক্ষুণ্ন রাখলে বরং তাঁর নতুন মত প্রকাশে আরও সফল হতেন।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন যে উপন্যাসের চিরাচরিত প্রকরণ নতুন সমাজভাবনা-প্রকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই তিনি নতুন প্রকরণ অনুসন্ধানে মনোযোগী হন। প্রথম পর্যায়ের উপন্যসগুলোর প্রকরণেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। বলতে গেলে প্রতিটি উপন্যাসেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মোটা দাগে ভাগ করলে দেখা যায়, মার্কসবাদী হওয়ার আগে ও পরে লেখা রচনার মধ্যে বেশ বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। অনেক কথা সরাসরি বলার ফলে বাক্যে সেই সংহতি ছিল না, কাহিনীর বুনোটে সেই জমজমাট চেহারা অনেকটা রোগা হয়ে এসেছিল। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে এইসব লেখা তাঁর অনেক তীক্ষ্ণ হয়েছে এবং ভাষায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। উপন্যাসের প্রচলিত ঠাসবুনুনি--কাঠামো তাঁর নতুন দর্শনপ্রকাশে কতটা উপযোগী এ নিয়ে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ ছিল এবং এ-সন্দেহ অমূলক নয়। সম্পূর্ণ নতুন প্রকরণ গঠনের চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এর পরিণত চেহারা আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। এর একটি কারণ এই যে, মানুষ ও সমাজের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের চেষ্টা উপন্যাসে তিনিই প্রথম করেন এবং বুর্জোয়া শিল্পরীতির দীর্ঘ ও সফল প্রয়োগের ফলে উপন্যাস যে-কাঠামো পেয়েছে সেখানে ঐ বিশ্লেষণ একেবারেই বেখাপ্পা। তবু অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজবাদী বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সবচেয়ে সফল হয়েছে।

তিনি কি পুরনো ও অভ্যস্ত ও নিরাপদ এবং পাঠকদেরও খুব পরিচিত প্রকরণে নতুন জীবনবোধ দিয়ে মানুষের বিশ্লেষণ করার কাজ অব্যাহত রাখতে পারতেন না? না, পারতেন না। নতুন সমাজবাদী ভাবনা যদি লেখকের গভীর ভেতরে সাড়া জাগাতে পারে তা হলে পুরনো রীতি তার প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে না। এখানে একটু পুনরুক্তি করতে হলেও সামন্তযুগের অবসান ও পুঁজিবাদী বুর্জোয়াসমাজের বিকাশকালে শিল্পসাহিত্যের কথাটি উল্লেখ করতে হয়। সেই সময় কিন্তু নতুন প্রকরণ অনুসন্ধানে সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মহাকাব্যের পাথুরে বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তি খুঁজছিলেন নতুন রীতির কবিতা। সনেট হল এই মুক্তি অন্বেষণের প্রথম স্বর। কিন্তু সনেটে ব্যক্তির স্বাধীনতার স্পৃহা তৃপ্ত হয়নি, নানান প্রকরণে কবিরা ব্যক্তির মুক্তিপথের অনুসন্ধান চালান। কথাসাহিত্যের সূত্রপাতই হল ব্যক্তির মুক্তিস্পৃহাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। সামন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরোয়া না-করে সমাজের ও মানুষের, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির বিকাশসাধনই ছিল উপন্যাসের কাজ।

কয়েকশো বছর পরে হলেও মধ্যযুগীয় সামন্তব্যবস্থা অবসানের লক্ষণ আমাদের দেশে দেখা যায়। এমনকী পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনাও একটু একটু অনুভব করা গেছে। উপনিবেশিক শাসনের ষড়যন্ত্রে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। তবে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বিদেশি বুর্জোয়া শাসকদের তৈরি মধ্যবিত্তসমাজে পঙ্গু শরীর নিয়েও ব্যক্তি গড়ে উঠেছে এবং স্বাভাবিক পথে না-হলেও এই ব্যক্তির বিকাশও ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে এই ব্যক্তি প্রবেশ করে মধুসূদন দত্তের হাত ধরে। ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলা কবিতার সনাতন রূপ মধুসূদন উপযুক্ত মনে করেননি। আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি ও ভোগ সবই প্রধানত শহরবাসী বা শহরে মধ্যবিত্তের ব্যাপার। সাহিত্যের উৎকর্ষ তাই নির্ভর করে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিটিকে সফল রূপায়ণের ওপর।

বেশ কয়েক দশক আগে, এই শতাব্দীর গোড়ায় এই ব্যক্তিপ্রবর রুগ্ণ হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে জন্মভূমি পাশ্চাত্যেই তার দারুণরকম অবক্ষয় শুরু হয়। আমাদের এখানেও ব্যক্তির অবস্থা খুব কাহিল। যে-পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াব্যবস্থা তার জন্মদাতা এবং তার পালনকর্তা তার শরীরেই আজ মোটারকম ফাটল ধরেছে এবং এই ফাটল জোড়া দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রাচীনকালে সামন্তযুগে সভ্যতার একটি বড় ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। আজ সবচেয়ে বদমাইশ মানুষটিও দাসপ্রথা সমর্থন করতে সাহস পায় না ; কিন্তু দাসদের শ্রমের বিনিময়ে যাঁদের জীবন প্রচুর অবকাশে ভরা ছিল তাঁদের হাতে সাহিত্য-শিল্প-দর্শনের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দাসপ্রথা এখন অমানবিক, ঘৃণ্য ও অরুচিকর ব্যবস্থা, কিন্তু প্রভুদের সাহিত্য-শিল্প-দর্শন আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। পারবও না, করলে তা হবে আত্মবিনাশী অঘটন। তার সামন্ত মূল্যবোধগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে বুর্জোয়াব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ধর্মের মহিমা, রাজার গৌরব, সামন্ত-প্রভুদের বীরত্ব—একটি বুর্জোয়া সমাজে এসব বড়জোর হাসিঠাট্টার বিষয়।

একথা মানতেই হবে যে সামন্তব্যবস্থার কবরের ওপর গড়ে-ওঠা বুর্জোয়াব্যবস্থা সভ্যতার ইতিহাসে বড়রকমের অবদান রেখেছে। নতুন প্রকররণ ও নতুন ভাবনার সৃষ্টি বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্যকে অস্বীকার করা মানে মানুষকে বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কিন্তু বুর্জোয়া মূল্যবোধ যে দারুণরকম ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়েছে এই সত্যটি অস্বীকার করার ক্ষমতা কোনো বুর্জোয়ারও হবে না। শ্রমিকের প্রাণপাত পরিশ্রমের বিনিময়ে যে-প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বুর্জোয়াব্যবস্থা দিব্যি কয়েকশো বছর কাটিয়ে দিয়েছে তাদের অবস্থা এখন কী? বুর্জোয়াদের একটি প্রধান অবলম্বন সংসদীয় গণতন্ত্র আজ ধুকধুক করে মৃত্যুর দিন গুণছে। রাষ্ট্রনায়ক সংসদকে কিছুমাত্র আমল না-দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সম্ভব, ভারতেও সম্ভব, আর এখানে সংসদ মানে রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের গৃহভৃত্যের প্রমোদভবন। সংসদের সার্বভৌমত্ব কোথাও নেই, সংসদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত। স্বাধীন আদালত, স্বাধীন সংবাদপত্র, স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বুর্জোয়াদের এইসব আইডিয়া আজ ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি তাঁর কাপুরুষসুলভ আচরণ, সেবাদাসসুলভ মনোভাব ও উৎকোচ গ্রহণের প্রবণতার জন্য মানুষের ঘৃণার পাত্র। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ কারও বিবেচ্য বিষয় নয়, বেতনবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সাংবাদিকদের কোনো দাবি নেই। শিক্ষাদানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলো মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা এবং অস্ত্রপ্রয়োগের প্রশস্ত ক্ষেত্র। শিক্ষকদের সম্মান এই সমাজে প্রায় নেই বললেই চলে, শিক্ষকগণও সম্মানলাভ কোনো জরুরি বিষয় বরে মনে করেন না। বুর্জোয়া রাজনীতি আজ সশস্ত্রবাহিনীর লেজুড়বৃত্তিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ একেবারে ভেঙে পড়েছে বলে পৃথিবীর প্রধান শক্তি সেইসব দেশের সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পুঁজিপতিদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্তিম চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী কখনোই দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না।

এ থেকে বোঝা যায় যে কেউ চাক আর না-ই চাক বুর্জোয়াব্যবস্থার ধ্বংস একেবারে অনিবার্য। বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রধান বিষয় ব্যক্তিও আজ এতটা রুগ্ণ যে তার মৃত্যু আসন্ন।

এখন নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য মানুষের সংকল্পে শরিক হওয়া শিল্পীর প্রধান কর্তব্য। সমাজবাস্তবতা উপন্যাসের প্রেক্ষিত বলে ঔপন্যাসিক এখানে বড় দায়িত্বপালন করতে সক্ষম। মানুষকে ব্যক্তি-খোলসের ভেতর থেকে বার করে এনে তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলা দরকার। ব্যক্তি এখন মানুষ হয়ে উঠবে। যে-শ্রমজীবীর রক্ত ও যাদের বিনিময়ে বুর্জোয়াব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আজ অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ। তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ থেকে ঔপন্যাসিক নতুন করে লেখার ইন্ধন পাবেন। যদি না-পান তো তাঁর লেখা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সময়ের যে-প্রবলরকম পরিবর্তন ঘটছে তাতে লেখক যদি সচেতন না-হন তো তিনি তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। বুর্জোয়াসভ্যতার উত্থানের সময় যাঁরা সামন্ত মূল্যবোধকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি শিল্পসাহিত্যে তাঁরা কোনো অবদান রাখতে পারেননি। সেই সময়ের ভাবনাকে ধারণ করাবার জন্য তারা নতুন আঙ্গিক অনুসন্ধান করে সফল হয়েছিলেন।

আজ আবার বুর্জোয়াব্যবস্থার বিনাশকালে যে-ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সেই একই বিষয় ও প্রকরণকে আঁকড়ে ধরে রাখবেন পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার থাকবে না। পূর্ববর্তী পুরুষদের পুনরাবৃত্তি করে কোনো সময়ের কোনো শিল্পীই মানুষের মধ্যে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তাঁর সমমানের না-হলেও খুব অল্প কয়েকজন সফল বাঙালি ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এঁদের প্রায় সবাই বুর্জোয়াব্যবস্থার সৃষ্টি ব্যক্তির রুগ্ণতা, নিঃসঙ্গতা, অবক্ষয়কেই বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাও স্যাঁতসেঁতে সহানুভূতি দিয়ে। যাঁরা নতুন সমাজবাদী চেতনাকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণের কাজ করেছেন তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেননি। এর কারণ হল, উপন্যাসের পুরনো প্রকরণটি তাঁদের সমাজবাদী চেতনাপ্রকাশের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। শুধু প্রকরণগত পরিবর্তন উপন্যাসের প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। নতুন ভাবনা থাকলেই নতুন প্রকরণ-গঠনের অধিকার পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের সমাজবাদী বলে বিবেচনা করেন ও পুরনো ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলার উদ্যোগে সক্রিয় সংকল্পে শরিক হন তাঁরা এই অধিকারটি প্রয়োগ করবেন। উপন্যাস গঠিত হবে সেইভাবে যাতে করে নতুন ভাবনাকে ঠিকমতো ধারণ করা যায়। নইলে এই সময়ের মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন দেওয়া উপন্যাসের সাধ্যের বাইরেই থেকে যাবে।

সংশয়ের পক্ষে

বিষাদসিন্ধু থেকে *জমিদার দর্পণ* কী *গো-জীবন* কী আত্মজীবনীমূলক চারটে বই—মীর মশাররফ হোসেনের সব লেখাতেই ঔপন্যাসিকের ধাবমান চেহারা প্রায়ই লক্ষ করি। এমনকী তাঁর পদ্য পদ্যগুলোতে পর্যন্ত সামাজিক মানুষকে ঘটনার মধ্যে রেখে দেখার প্রবণতা চাপা থাকে না। কিন্তু এই চেহারা সবসময় অস্পষ্ট, আবার একটুখানি দেখা দিয়েই অনির্দিষ্ট ও সংজ্ঞাবহির্ভূত রচনার কোথায় যে উধাও হয় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। সামন্তবিরোধী মনোভাবও তিনি ধারণ করেন। সামন্তবোধমুক্ত চেতনা উপন্যাস লেখার একটি প্রধান শর্ত। সামন্তব্যবস্থার প্রতি একজন ঔপন্যাসিক সমর্থন জানাতে পারেন, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-প্রভুদের জন্য সহানভূতি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঔপন্যাসিকের লেখায় খুব স্পষ্ট। কিন্তু এই সমর্থন বা সহানুভূতি আসে ঐ ব্যবস্থার কাঠামোতে তৈরি সমাজ বা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যে। এই পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ সামন্তচেতনাসম্পন্ন কোনো লেখকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব। সকলের বাধ্যতামূলক অরণ্যবাস দাবি করে কেউ আন্দোলন করতে চাইলে তাঁকে লোকালয়েই থাকতে হয়, টারজান বনজঙ্গলের গুণকীর্তন করে বই লিখতে পারে না ; যে-বিষয় নিয়েই উপন্যাস লেখা হোক-না, লেখককে সামন্তচেতনামুক্ত হতেই হবে। সামন্তব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর উপন্যাসের উদ্ভব এবং মধ্যযুগীয় এই ব্যবস্থাজাত মানসিকতা এই নতুন মাধ্যমটির সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না।

একটি উপন্যাস না-লিখলেও মধুসূদন দত্তের লেখায় এই সামন্ত আভিজাত্যমুক্ত চেতনা বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় জাগরণ সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তির সমস্যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সমস্যা কাটাবার ইচ্ছা থাকলে ব্যক্তি নিজেই মাথা তুলে দাঁড়াবে, ধর্মের কাছে নতজানু হবে না—এই বোধের অধিকারী তাঁর সমকালে তিনি একাই। নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে, মিল-ভলতেয়ার মুখস্থ করার পর সনাতন ভারতবর্ষের আত্মার গভীর গোপন শাঁসের চারদিকে ভগবানের আলোকচ্ছটা দেখার গদগদ ভক্তিভাব মধুসূদনের ছিল না। এই গদগদ ভক্তিকে ঝেড়ে ফেলা উপন্যাসরচনার একটি প্রধান শর্ত। সামন্তসমাজ এই ভক্তিকে পোষে, সামন্তচেতনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সঙ্গে ভক্তি থেকেও মুক্ত হওয়া

যায়। যথেচ্ছভাবে টাকাপয়সা ওড়াবার ব্যাপারে তাঁর সম্বন্ধে মুখরোচক গালগল্পগুলো যদি বিশ্বাসও করি, তবু মধুসূদনের শিল্পকর্মে সেই সামন্তরুচি কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। বড়লোকের বাচ্চা হাজার হারামিপনা করুক, শত-শত বৎসর ধরে শিরা-উপশিরায় বয়ে-আসা নীলরক্ত তার আত্মার গভীর ভেতরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যার জন্য সে শেষ পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি কী ভালোবাসা আকর্ষণ করবে—এই ধরনের মনোভাব মধুসূদনের কাছে একেবারে পাত্তা পায়নি। প্রতিভা, মেধা ও শিল্পবোধের দিক থেকে মধুসূদনের সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এঁরা সমগোত্রীয়, সামন্ত আভিজাত্য দুজনের কারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। *জমিদার দর্পণ* নাটকে জমিদার হায়ওয়ান আলী তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যেসব কীর্তিকলাপ করে তাকে কোনোভাবেই বড়লোকের প্রডিগ্যাল সনের খেয়ালেপনা বলে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তার আপাতনিরীহ ভাই এবং মৃত বাপটাও কোনো মহৎহৃদয় উদারচিত্ত সিংহপুরুষ ছিল না। জমিদাররা বংশপরম্পরায় এইসব কর্মকাণ্ড করে আসছে, এসব দোষ তাদের রক্তের মধ্যে। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক বই-কয়টির দুটিতে জমিদারদের আভিজাত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বাইরে খুব পরহেজগার, পর্দানশীন মুসলমান খানদানি সামন্ত পরিবারগুলোর ভেতরকার খ্যামটা নাচ ও নানা ধরনের ইতরামোর এরকম চিত্র মীর মশাররফের পর কোনো লেখকের মধ্যে পাইনি।

এসব কি ঔপন্যাসিকের লক্ষণ নয়? অন্য মাধ্যমের শিল্পেও উপন্যাসের লক্ষণ দেখা যেতে পারে, শেকসপিয়রের নাটকে কি বারবার উপন্যাসের চরিত্রবিকাশ ঘটে না? কিন্তু মীর মশাররফ হোসেন শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক নন, তাঁর কোনো রচনাই উপন্যাসের মর্যাদা পায় না এবং মনে হয় উপন্যাস লেখার চেষ্টা না-করাটা তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। তাঁর প্রতিটি রচনার উৎস ব্যক্তিগত আবেগ। *বিষাদসিন্ধুতে* এই আবেগ হল 'ভক্তি'। তবে ভক্তিকে কল্পনার সাহায্যে সর্বজনীন রূপ দেওয়া গেছে। এই বইয়ের চরিত্রসমূহের কার্যকলাপ ঘটে গেছে চোদ্দশো বছর আগে, কোনো চরিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বা যোগাযোগ হয়নি। তাই বহুদূর থেকে এঁদের প্রতি ভক্তি অনুভব করা এবং এই অনুভূতিকে শিল্পোত্তীর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। *বিষাদসিন্ধুকে* উপন্যাসে রূপান্তরিত করা অসম্ভব, কারণ যে-ভক্তি এই রচনার উৎস, চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য তা রীতিমতো বিঘ্ন।

আর মশাররফ হোসেনের অন্যান্য বইতে যাদের নিয়ে তিনি লেখেন তাদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত রাগ বা অনুরাগই প্রধান হয়ে ওঠে। এইসব লোক তাঁর নেতিয়ে-পড়া-ভালোবাসার পাত্র, কখনো-বা তাঁর ঈর্ষা ও রাগের শিকার। শেষ পর্যন্ত তাদের কাজকর্ম সব আসে তাদের প্রেম বা বদমাইশির উদাহরণ হিসেবে।

জমিদার দর্পণ-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। লর্ড কর্নওয়ালিসের কল্যাণে খুদে রাজা হয়ে-বসা সামন্ত-প্রভুদের কীর্তিকলাপ এভাবে তুলে ধরার জন্য মশাররফ হোসেনকে সামন্তবিরোধী আন্দোলনের একজন পুরোধা বলে অভিনন্দিত করা উচিত। কিন্তু এখানে হায়ওয়ান আলী এবং তার চেলাচামুণ্ডারা সব চূড়ান্ত বদমাইশির নমুনা দেখিয়েই ডুব দেয়, সম্পূর্ণ জলজ্যান্ত মানুষ আর হয় না, এমনকী একটি সমগ্র বদমাইশও হতে পারে না।

ওদিকে আত্মজীবনীমূলক লেখা যে-কখনো পাওয়া গেছে সেখানেও যে-বিশ্লেষণধর্মিতার সাহায্যে ব্যক্তিগত বিরাগ বা অনুরাগ সর্বজনীন শিল্পের রূপ পায় তার

শোচনীয় অভাব দেখতে পাই। অথচ ভালো আত্মজীবনী মানে কেবল নিজের শত্রুদের নিয়ে পরচর্চা করা নয়। কিন্তু লেখকের গুণকীর্তির দীর্ঘ সার্টিফিকেট কী দুঃখবেদনার প্যানপ্যানানি কান্নাকে ভালো আত্মজীবনী বলে না। সম্রাট বাবর কী নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী ক্রপটকীন কী গ্রিক লেখক কাজানজাকিস—এঁদের আত্মজীবনীমূলক রচনা বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদা পায় এইজন্য যে এঁরা নিজেদের বিশ্লেষণ করতে করতে এমন একটি উঁচু নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করেন যে মনে হয় অন্য কারও সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে চলেছেন। উপন্যাসের জন্য এটা আরও অপরিহার্য। লেখকের যে-কোনো অভিজ্ঞতায় বিশ্লেষণ এমন হয়ে ওঠে যে লেখক শেষ পর্যন্ত কখনো বুক চিতিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান না। একটা অনুভূতি বোধ হল আর শব্দমালার অস্ত্র দিয়ে একটা ধাক্কা দিলাম—না, কবির এই অধিকার থেকে ঔপন্যাসিক বঞ্চিত।

নিজের পাপবিস্মৃত, প্রবীণ ও বিরলকেশ পণ্ডিতের কোনো তরুণের ছটফট-করা যন্ত্রণা থেকে ফুটে ওঠা কবিতার সম্পাদনা করার ধৃষ্টতাকে একজন কবি ডব্লু. বি. ইয়েটস' all coughin ink' বলে বাতিল করে দিতে পারেন। কিংবা গলিতদন্ত, অজর, অক্ষর, চোখে অক্ষম পিচুটি বন্ধ্যা অধ্যাপক ক্ষুধাপ্রেম-আগুনের সেঁক কামনা-করা, হাঙরের-ঢেউয়ে লুটোপুটি-খাওয়া কচিদের ওপর শাসন করতে এলে একজন জীবনানন্দ দাশ তাকে 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা' বলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারেন। কিন্তু এই সমালোকটিকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে হলে এত তাড়াতাড়ি তাঁকে বাতিল করে দেওয়া চলে না। সৃজনক্ষমতাহীন ছিদ্রান্বেষী এই অধ্যাপকের সব কথাও ঔপন্যাসিককে শুনতে হবে মনোযোগ দিয়ে। তাঁর সঙ্গে মিশতে হবে ঠিক তাঁর মতো করে। তাঁর আত্মরক্ষার দায়িত্ব ঔপন্যাসিকের ওপরেও বর্তাবে বইকী! হ্যাঁ, সেই সমালোচক মনে করেন যে তরুণ-কবিদের স্বেচ্ছাচারের ফলে কবিতার পবিত্র অঙ্গন ক্লেদাক্ত হবে ; হ্যাঁ, সে মনে করে যে ভাষার সুদীর্ঘকালের কাঠামো বজায় রাখার জন্য তাঁকে একটু কঠিন না-হয়ে উপায় নেই। একই সঙ্গে চলে তরুণ-কবিদের উচ্চকণ্ঠ দাবি : ভাষার কাঠামো রক্ষার চেয়ে অনেক বেশি দরকার ভাষাকে সবল ও সজীব রাখা, কবিতা মানুষকে পবিত্র করে না, কবিতার কাজ মানুষকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করা। ঔপন্যাসিকের সমর্থন যার প্রতিই থাক, তাঁর ব্যবহার সকলের সঙ্গে সমান। সকলের ভেতরে ঢুকে তাদের অন্তর্গত বাণীকে ধরে আনবেন তিনি। ঔপন্যাসিকের ওপর লেখা ডব্লু. এইচ. অডেনের কবিতা নকল করে বলি, তিনি 'among just be just, among filthy filthy too'। ঔপন্যাসিকের নিজের ব্যক্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে শিথিল, কারণ সবাইকে তিনি তাদের মতো করে দেখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁকে শক্ত থাকতে হয়। তাঁর এই আপাতশিথিল ব্যক্তিত্বে তিনি ধারণ করেন সবাইকে, সকলের দুঃখ-বেদনা বহন করতে হয় তাঁকে। এর মধ্যেও তাঁর নিজের বক্তব্য আছে, এবং সেই বক্তব্য রচনার সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে, চরিত্রের পরতের পর পরত উদ্ঘাটনে, কাহিনীর ক্রমবিকাশের মধ্যে তাঁর নিজের কথা এমনভাবে বলা হয় যে তিনি যেন কিছুই জানেন না, চরিত্র ও কাহিনীর এই বিকাশই তাঁকে এরকম সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছে।

এজন্য মানুষকে তিনি দেখেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। ভক্তিগদগদ হলে এই কর্মটি করা অসম্ভব। ভক্তিগদগদভাব মানুষের বিশ্লেষণের পথে প্রচণ্ড বাধা। তাই নিরঙ্কুশ ভক্তির দাপটে

কী ঈশ্বরের সামনে কী তার প্রতিনিধি কী সামন্ত-প্রভুর সামনে মানুষকে যখন সদাসর্বদা নতজানু হয়ে লেজ নাড়তে হতো সেই সময় উপন্যাস লিখিত হতে পারেনি।

তাই ঔপন্যাসিকের প্রধান অবলম্বন হল তাঁর সংশয়। সংশয়ের তাড়াতেই লেখক প্রত্যেকের ভেতরে ঢোকেন তাকে তদন্ত করার জন্য, এই সংশয়ের তাড়ায় তাঁকে আখ্যানের চেয়ে বেশি তাড়া করে ভেতরের মনোজগৎ, এবং তাঁর সমাজ—কারণ তা-ই তাঁকে সাহায্য করে মানুষের বিশ্লেষণে। সামন্তবিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম গদ্যকার মীর মশাররফ হোসেন এই বিশ্লেষণক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি। এই সামন্তবিরোধিতা তাঁর এসেছে প্রধানত ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে, ফলে এই মনোভাব তাঁকে সমাস্তচেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি। *জমিদার দর্পণ*-এর আবু মোল্লা প্রতিরোধের সংকল্প নেওয়া তো দূরের কথা, প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। যার ওপর চটা তার মূর্তি উদ্ঘাটন করেই তিনি ছুটি নেন, চরিত্র তাই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে না, কাঁচামাটির পুতুল হয়ে ভেঙে পড়ে।

একটি মানুষ সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই যে সিদ্ধান্ত নেন সেটাই ফাইনাল এবং ফাইনালে পৌঁছবার জন্য তাঁর দারুণ তাড়াহুড়া, পরতের পর পরত উন্মোচন করার ধৈর্য তাঁর নেই। আসলে ধৈর্যচ্যুতির কথাটা ভুল বললাম। তাঁর নিজের কোনো সংশয় নেই, যে-সংশয়ের তাড়ায় তিনি চরিত্রের ভেতর অনুসন্ধানের কাজ চালাতে পারেন।

নজিবর রহমান বা কাজী ইমদাদুল হকের প্রধান সম্পদ ভক্তিসর্বস্বতা। আদর্শ নারী ও আদর্শ পুরুষ তৈরির জন্য তাঁরা উদ্গ্রীব, মানুষের সামগ্রিক চেহারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাঁরা। তাঁদের উপন্যাসে কোনো জ্যান্ত মানুষ নেই, ভালো কাজের কিছু নমুনা আছে মাত্র। সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহের বাইরে থাকেন তাঁরা, মানুষের ভেতরের পরিচয় উদ্ঘাটন করার চেষ্টার তাই কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু বড় ও মহৎ কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছতে হলেও সংশয়ের পথ ধরেই উঠতে হয়। এই সংশয়ের তাড়নায় মানুষের ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি করা এবং নিস্পৃহভাবে তাকে তুলে ধরার প্রবণতাসম্পন্ন বাংলার মুসলমান লেখকের জন্য আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। উপন্যাস-রচনার জন্য সামন্তবোধমুক্ত নগরচেতনা অপরিহার্য, এই চেতনা না-থাকলে গ্রামের কী অরণ্যের জীবনযাপন নিয়েও উপন্যাস লেখা যায় না। এই চেতনা বিচ্ছিন্নভাবে কারও মধ্যে আসে না, সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি এর দ্বারা রঞ্জিত হয়। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল কয়েকটি পরিবার বা ব্যক্তির মধ্যে, একটি মধ্যবিত্তসমাজ গড়ে উঠতে তখনও ঢের দেরি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যে-নগরচেতনা থেকে সংশয়ের জন্ম হয় তার কোনো লক্ষণই তখন দেখা যায়নি। তাই ঔপন্যাসিক আর আসেন না। নজরুল ইসলামের মতো কবির আবির্ভাব ঘটে এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর পার না-হতেই। ইয়াকুব আলী চৌধুরীর হাতে অপূর্ব কাব্যময় গদ্য রচিত হয়। আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতে ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। গান গেয়ে বাংলা জয় করেন আব্বাসউদ্দিন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ মানবলাঞ্ছনার দলিলে পরিণত হয় জয়নুল আবেদীনের ছবিতে। নৃত্যকলায় বুলবুল চৌধুরী যে-মৌলিক সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেন, তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছে আজ সাতাশ বছর, এর মধ্যে এই ক্ষেত্রে এখানে কেউ তাঁর ত্রিসীমানায় যেতে

পারলেন না। সবাই আসে। কমিউনিস্ট পার্টির গঠনকালে বিশিষ্ট নেতৃত্বের আসন লাভ করেন মুজাফফর আহমদ। আবুল হাশেমের নেতৃত্বে তরুণকর্মীদের তৎপরতার ফলে বুর্জোয়া রাজনীতিতে নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা হয়। তিরিশের দশকের শেষভাগে ও চল্লিশের শুরুতে এইসব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আসেন না কেবল একজন। তিনি ঔপন্যাসিক। তবে সমস্ত পরিবর্তন তাঁর আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করে। তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, চল্লিশের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ উঠতি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ঘটায়। সবকিছু সহজ ও সরল—এই বোধ আর টেকে না। যে-টানাপোড়েনের শুরু হয় তাতেই জেগে ওঠে সংশয়। এইভাবে আবির্ভাব হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র।

সংশয়সমৃদ্ধ চিত্তে তিনি সামন্তদেহের একটি প্রধান রোগজীবাণু পিরবাদ নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করলেন। বাংলাদেশের প্রথম ঔপন্যাসিক তিনি, আধুনিক নগরচেতনা নিয়ে তিনি যা দেখেন তারই মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ভক্তিগদগদ চিত্তে তিনি চিড় ধরালেন, এই চিড় আজ ফাটলে পরিণত হচ্ছে। সমাজের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিকে রেখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। সংশয় বাড়ে, ভক্তি ভেঙে যায় এবং এইভাবে উপন্যাস মানুষের সমাবেশে সবল ও সজীব হয়ে ওঠে।

উপন্যাস কি তা হলে শেষ পর্যন্ত মানুষের দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের কুরুক্ষেত্র হয়েই টিকে থাকবে? হ্যাঁ, তা-ই। সংশয়ই মানুষকে ধাপে-ধাপে নিয়ে যেতে পারে বড় ও গভীর কোনো উপলব্ধির দিকে। সংশয়সমৃদ্ধ একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের গহন ভেতরের অন্ধকার ঘরের দ্বন্দ্ব দেখার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারেন যে অন্যায় কোনো সামাজিক নিয়ম মানুষের রোগ ও স্খলনের মূল কারণ। তখন তার প্রতিকারের জন্য যে-পথ তিনি খোঁজেন তাও দ্বন্দ্বমুখর, সেটাও একটানা সরলরেখা নয়, সংশয় ও সংঘাতের জৈবিক প্রক্রিয়া সেখানেও সচল।

দস্তয়েভস্কি মানবপ্রকৃতির গভীরে একটি অখণ্ড ঐকতান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দস্তয়েভস্কির এই উপলব্ধি আমাদের শতাব্দীর মহত্তম মানব আইনস্টাইনকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। শুনেছি, আইনস্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দ্বন্দ্ব ও এলোমেলো গতিপ্রকৃতির মূলে একটি চূড়ান্ত শৃঙ্খলা দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। আইনস্টাইন তাঁর গবেষণা পরিচালনা করেন প্রকৃতির সেই চূড়ান্ত শৃঙ্খলাটিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু দস্তয়েভস্কির সাধনা সম্পূর্ণ আলাদা। দস্তয়েভস্কির মানবপ্রকৃতির অনন্ত ঐকতান কিন্তু মানুষের টান-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বৈপরীত্যের স্বাভাবিক মোহানা। দস্তয়েভস্কি এই ঐকতান দেখতে পান, কিন্তু সেজন্য মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কিছুমাত্র গৌণ হয়ে যায় না। বরং, সংশয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখতে না-পারলে মানবাত্মার এই মহৎ ঐকতান উপলব্ধি করা শিশুর ইচ্ছাবিলাস হয়ে থাকে। এই ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই মানুষের সামগ্রিক রূপ দেখা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। ঔপন্যাসিকের কি তাই পোষায়?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তার আগে বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ একটা উপনিবেশে যতটা সম্ভব তার অনেকটা হয়ে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে কিছু লোক বিত্ত ও দাপটের মালিক হয়েছিল, সেই সুবাদে তাদের বংশধররা তো বটেই, বংশধরদের আশেপাশে আরও অনেকে জোতজমি করে, ব্যবসাবাণিজ্যে একটুআধটু হাত লাগিয়ে এবং চাকরিবাকরিতে ঢুকে কিংবা উকিলমোকতার হয়ে নিজেদের ছেলেপুলেকে লেখাপড়া করাবার সুযোগ করে নিয়েছে। আশু মুখুজ্যের কল্যাণে আরকিছু না-হোক, ছেলে কিংবা জামাই যেন গ্র্যাজুয়েট হয় এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করার সাহস তখন অর্জন করেছে এমনকী নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিও। বাংলার ভদ্দরলোক রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার সাধকে সংকল্পে রূপ দেওয়ার তাগিদ বোধ করছে। রাষ্ট্রক্ষমতা না-পেলেও রাজ্য তো বলতে গেলে কংগ্রেসের দখলে, তারা রাজত্ব চালাচ্ছে মহাত্মা গান্ধির জ্যোতির্ময় যষ্টি-হাতে। ভদ্দরলোকদের ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মালা-পরানো শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ক্ষুদিরামের পাশে ঝুলছেন মহাত্মা গান্ধি। ওদিকে স্টেটসম্যান পড়ে ইংরেজি ভাষার গৌরব রপ্ত করার সাধনা চলছে, পাশাপাশি চলছে ঠেসে বাংলা উপন্যাস পড়া। শ্রেষ্ঠ বাঙালিপুরুষ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন শীর্ষে, রবিঠাকুর তখন দেশবাসীর পরম শ্রদ্ধেয় 'গুরুদেব'। কিন্তু তাঁর বই বিক্রি যত হয় তত পঠিত হয় না, ব্রাহ্মসমাজের বাইরে রবীন্দ্রনাথ প্রচলনের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। দেশের মানুষ তাঁকে নিয়ে যত গর্ব করে তাঁর কথায় কান দিতে কিন্তু তত উৎসাহ পায় না। তাদের চোখের সামনে এবং নয়নের মাঝখানে তখন গান্ধি মহারাজ। তাঁর চরণপ্রান্তে দেশবন্ধু। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি ও দেশবন্ধুর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বাংলার ঘরে ঘরে।

বাংলার মুসলমানের যে-ছোট অংশটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কামরায় ঢোকার জন্য উঁকিঝুঁকি মারছে, কংগ্রেসের প্রভাব তাদের ওপরেও কম নয়। ইংরেজি পড়তে পড়তে তারা একই সঙ্গে দীন ইসলাম ও মহাত্মার ভক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের দীন ও দীনের ওপর ভর করে উম্মাহ পরিচালনায় গান্ধির উৎসাহ প্রবল, খেলাফত কায়েমের জেহাদে তাদের সঙ্গে তিনিও শামিল হয়েছেন। আবার কামাল পাশা এসে যখন খেলাফতের পাছায় দুটো লাথি

মারলেন তখন ঐ মুসলমানদেরই কামাল পাশার শক্তিতে মুগ্ধ হতে বাধল না ; এমনকী খেলাফতরক্ষার জন্য দুদিন আগের উন্মাদনার কথা ভেবে তাদের আফশোস দেখা গেল না। পিরসাহেবের সঙ্গে গান্ধি ও দেশবন্ধুও বাংলার নতুন মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ঘরে সমান ঠাঁই পেয়েছেন। পরে এঁদের সঙ্গে শরিক হলেন ফজলুল হক। আর নজরুল ইসলাম ছিলেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের সঙ্গেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, ধর্মবিশ্বাসে উত্তেজিত করা, সাম্যবাদের ধারণায় অনুপ্রাণিত করা, ভক্তিতে আচ্ছন্ন করা এবং নারী ও পুরুষের সঙ্গে যথাক্রমে পুরুষ ও নারীকে প্রেমে বিহ্বল ও বিরহে কাতর করা—এতোগুলো এলোমেলো দায়িত্ব তিনি বেশ কার্যকরভাবে পালন করে গেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে ভালো মৌসুমও ঐটাই। রবীন্দ্রনাথের এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলো লেখা হয়েছে, তাঁর উপন্যাস লেখাও চলেছে। শরৎচন্দ্রের বই একটা পর একটা বেরিয়ে সবাইকে অভিভূত করে দিচ্ছে, তাঁর সমাজসংস্কারের ভাবনাতেও মধ্যবিত্ত অস্থির। তা ক্ষুদিরাম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধি, দেশবন্ধু যাদের সমানভাবে বুঁদ করে রাখতে পারে, শরৎচন্দ্রের পায়ের এলোমেলো রেসে খুঁড়িয়ে চলতে তাদের বেগ পাবার কথা নয়। ধর্মশক্তি ও ধর্মসংস্কার, সমাজের প্রতি আনুগত্য ও আধুনিক শিক্ষালাভে উৎসাহ ও শিল্পসাহিত্যচর্চায় আগ্রহ—সর্বক্ষেত্রে উত্তেজনা বাংলার মধ্যবিত্তকে একটি হৃষ্টপুষ্ট শরীরে দাঁড় করিয়ে দেয়। তো এই শরীর কি পেটানো? আমাদের বাঙাল ভাষায় যাকে বলি 'পিলানো গতর', তা-ই? নাকি ফাঁপা? মধ্যবিত্তের বিকাশের সবচেয়ে প্রধান লক্ষণ যে-ব্যক্তির উত্থান—তাকে কি কোথাও ঠাহর করা যাচ্ছে? বিচিত্র সব পরস্পরবিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ সব বিশ্বাস, ভক্তি, সংস্কার, মূল্যবোধ, উত্তেজনা, প্রেরণা ও সংকল্পের নিরাপদ সহ-অবস্থানে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা একশোটা শার্লক হোমসেরও সাধ্যের বাইরে। গ্রাম থেকে শহরে আসার ফলে বড় পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ভাঙা টুকরোগুলোতে পুরনো বাড়িরই ভাঙাচোরা ছায়া, বর্ণ কী বংশ কী খানদান ছাড়িয়ে কেউ আর ব্যক্তি হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেননি। বাংলার মধ্যবিত্তের উত্থান যে-'ব্যক্তি'টিকে পয়দা করল সে-বেচারা প্রথম থেকেই রিকেটগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ। এই মধ্যবিত্ত হল দেশবাসীর প্রতি উপনিবেশিক শক্তির দেওয়া উপহার। উপনিবেশের মানুষ একটু ছোটই হয়, তাকে খাটো করে রাখতে না-পারলে শাসক টিকে থাকে কী করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শক্তসমর্থ 'ব্যক্তি'র অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু সমাজে যা নেই তার খোঁজ তিনি পাবেন কোথায়? নিজেদের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা এবং সংকল্প ও শ্রম দিয়ে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন মানুষ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে খুব উঁচুমাপের ব্যক্তিত্বে উন্নীত হন, কিন্তু এঁরা বড় হয়েছেন ব্যক্তির মাপকে ছাড়িয়ে, এঁদের দিয়ে মধ্যবিত্তের মানুষকে চিনতে যাওয়া কেবল অসমীচীন নয়, অসম্ভবও বটে।

তিরিশের দশক শুরু হতে-না-হতেই বাংলার মধ্যবিত্তের ওপর বড় ধরনের আঘাত আসতে শুরু হল। বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা ধাক্কা দিল এখানেও, একটি মহাযুদ্ধের পর আরেকটি মহাযুদ্ধের যে-পাঁয়তারা চলছিল তার ঝাপটা লাগছিল এখানেও। ইউরোপের স্বাধীন ও সবল ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে যুদ্ধের সঙ্গেই, ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে পর্যবসিত হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং তাকে ব্যক্তিসর্বস্বতায় অধঃপতিত করে ব্যক্তিকে একটি নিঃসঙ্গ কুতকুতে চোখওয়ালা ঘিনঘিনে শরীরে গুটিয়ে এনে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা তার ঐতিহাসিক

দায়িত্ব যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন করে। শুরু হয়েছিল বিপুল গর্জনে, শেষ হল কাতরাতে কাতরাতে। আর আমাদের এই উপনিবেশে মধ্যবিত্তের নাবালক ও বামন সন্তান শ্রীমান ব্যক্তিবাবু চলছিলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, তার খোঁড়ানোকে দেখা হচ্ছিল নাচের মহড়া বলে। তা তিরিশের দশকে শ্রীমান আছাড় খেয়ে পড়েই গেলেন, তাঁর কাপড়চোপড় আর কিছুই রইল না, রোগাপটকা গতরটা উদোম হয়ে গেল।

ভক্তি ও বিশ্বাসে সংস্কার ও মূল্যবোধ, সাধ ও সংকল্প এবং উত্তেজনা ও প্রেরণার জবরজং উর্দি তুলে নাবালক ও বামন এবং পঙ্গু ও রুগ্‌ণ ঐ ব্যক্তিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটি হাতে নিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ছিল খুঁটিয়ে দেখার ধাত, রক্তের ভেতর তাঁর বিশ্লেষণ করার প্রবণতা। ভক্তিভাব থেকে তিনি মুক্ত একেবারে প্রথম থেকে। ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁর কাছে সমার্থক নয়, সংস্কারকে তিনি মূল্যবোধের মর্যাদা দেন না এবং প্রশ্রয় ও ভালোবাসাকে তিনি আলাদা করতে জানেন। তাই বাংলার গ্রাম মানে প্রকৃতির রূপে আত্মহারা ভূখণ্ড নয়, গ্রামের মানুষ মানে সহজসরল উদারহৃদয় এবং প্রেম ও করুণায় টইটম্বুর অবোধ জনগোষ্ঠী নয়। একজন তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন, ডাক্তারিবিদ্যা আয়ত্ত করে লোকটি নিজের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। তার মূর্খ দেশবাসী, শূদ্র দেশবাসী ভাইদের সেবা করার নিয়ত তার ছিল কি না তিনি আমাদের বলেননি, তবে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে ঐ তরুণ বেশ মেলামেশা করে, তাদের চিকিৎসা করে এবং নিজের সচ্ছল ও অসচ্ছল, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজনকে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলার তাগাদা দেয়। কিন্তু উপনিবেশের প্রধান শহরটিতে তার কয়েক বছরের শিক্ষালাভ, নিজের পেশা রপ্ত করার জন্য বিজ্ঞানপাঠ, পেশার বাইরেও অন্যান্য বিষয়ে তার পড়াশোনার অভ্যাস, শহরে থাকতে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা—সব মিলিয়ে তাকে এমন একটি প্রাণীতে পরিণত করেছে যে ঐ গ্রামে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। শিক্ষা ও বিবেচনাবোধ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জন্মজন্মান্তরের ভক্তিভাব থেকে তাকে রেহাই দিয়েছে ; কিন্তু মানুষের গদগদ ভক্তি এবং ভক্তি পাওয়ার লালসা যে মানুষকে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে তা-ই দেখে সে একেবারে অসহায় বোধ করে। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনকে সনাতনী আদর্শের অব্যাহত ধারা বলে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, আবার এখানে বাস করে এর মধ্যে গতিসঞ্চারের সুপ্ত ইচ্ছাও তার নেতিয়ে পড়ে। গ্রামে থেকে এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেও তাকে থাকতে হয় বাইরের লোক হয়ে। লোকটি মধ্যবিত্ত একজন 'ব্যক্তি', তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-খারাপলাগা সবই আছে। এই নিস্তেজ সমাজে বিলীন হয়ে যাওয়া তার স্বভাবে নেই। কিন্তু সে হল উপনিবেশের ব্যক্তি, সমাজে থেকেও নিজেকে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, নিজেকে আলাদাভাবে অনুভব করাও তার আয়ত্তের বাইরে। দিন যায়, স্বাতন্ত্র্যের বদলে নিজের বিচ্ছিন্নতা তার কাছে প্রকট হতে থাকে। বাপের সঙ্গে পর্যন্ত আত্মীয়তা ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে দূরত্ব। বাপের অপত্যস্নেহ চাপা পড়ে ঐ ঘোরতর বৈষয়িক বুড়োটির ক্ষুদ্রতা, লোভ আর লালসার নিচে। তার কিছুই করা হয় না। গেঁয়ো একটি মেয়ের জন্য নিজের দুর্বলতা বুঝতে বুঝতে মেয়েটির মন থেকে সে হারিয়ে যায়। গোটা পরিবেশ দিনদিন ভোঁতা থেকে ভোঁতাতর হতে থাকে, এই অবস্থায় সে নিজেও পরিণত হয় একটি সংকুচিত জীবে। ভয়াবহ

রকমের বিচ্ছিন্নতায় তার ক্রমাগত ক্ষয় উপন্যাসটির পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে, লোকটিকে ঝেড়ে ফেললেই যেন পাঠক বাঁচে। কিন্তু ঝরে পড়ার মতো অলীক মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গড়েন না। গল্পো বয়ান করার লেখক তো তিনি ননই, এমনকী চরিত্রসৃষ্টিও তাঁর কোনো কাজ নয়। মানুষের দিকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, ইচ্ছে হোক চাই না-ই হোক তার মধ্যে নিজের অনিবার্য ক্ষয় না-দেখে পাঠকের আর উপায় থাকে না।

উপন্যাসের সঙ্গে পাঠক একাত্ম বোধ করবেন, এটাই তো নিয়ম। সচ্চরিত্র, সাহসী বীরপুরুষ, উন্নতশির, আত্মত্যাগী—এঁদের তো কথাই নেই, এমনি নিরীহ ভালোমানুষ, গেরস্থ-টাইপের প্রেমিক, দেবদাস-মার্কা ছিঁচকাঁদুনে বা অপদার্থ বেকার হলেও চলে, এমনকী বদমাইশ, লম্পট, নিষ্ঠুর, দাঙাবাজ বা আলবদর কী শিবসেনা হলেও কোনো-না-কোনো জায়গায় লেখকের প্রশ্রয়ে চরিত্র একটুখানি হলেও ভালোবাসা দাবি করে এবং পাঠক তার ভেতর নিজেকে দেখে কিংবা দেখতে চায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের লেখার লোকজন পাঠকের দুর্বলতাকেই উসকে তোলে, তাদের মতো হওয়ার জন্য তাকে হাতছানি দেয় না। বরং পাঠককে তারা বড় ঝামেলায় ফেলে, নিজের অনেক ভেতরে চোখ ফেলতে বাধ্য হয়ে সে দেখে তার মধ্যে কী শোচনীয়, কী ভয়াবহ রকমের ধস নেমেছে। প্যাথলজির রিপোর্ট হাতে নিয়ে ল্যাবরেটরির দরজায় সে দাঁড়িয়ে থাকে, চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে, তার নাদুসনুদুস গতরটা তাকে এতদিন কী প্রতারণাই-না করে এসেছে! অনুবীক্ষণ যন্ত্র তার যে-রোগ শনাক্ত করেছে তার চিকিৎসা কেউ জানে না। চোখের সামনে তার ঘনঘোট অন্ধকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন গভীর কোনো খাদের কিনারে, নিচের দিকে তাকালে অনিবার্য-পতনের ভয় তার দাঁড়িয়ে থাকার বলটুকু পর্যন্ত শুষে নেয়।

এই রুগ্ণ ব্যক্তিটি কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়, কিংবা বহু পূর্বপুরুষের রক্তের স্রোতে এইসব রোগ তার শরীরে উজান বয়ে আসেনি। বর্ণে, ধর্মে ও শ্রেণীতে ছেঁড়া এবং স্টেটসম্যান, রামকৃষ্ণ, ক্ষুদিরাম, মহাত্মা, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, নজরুল ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তৃপ্ত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা হল এই 'ব্যক্তি'র পৃষ্ঠপোষক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্বের রচনায় ব্যক্তির গভীর ভেতরকার রোগ শনাক্ত হতে থাকে তাদের লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে। এর একটি হল অসুস্থ যৌনতা। এখানে তাঁকে ফ্রয়েডের তত্ত্বে প্রভাবিত বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা তখন থেকেই লক্ষ করা যায়। মানুষের যে-জীবনস্পৃহা ও মরণপ্রবণতাকে আদিমকাল থেকে মানুষকে সমন্বয় ও সংঘাতের ভেতর পরিচালিত করে বলে ফ্রয়েড বিবেচনা করেন তা কিন্তু শ্রেণীনিরপেক্ষ, সমাজকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কহীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকজন কোনো-না-কোনোভাবে নিজ নিজ শ্রেণীগত অবস্থানের শিকার। হাজার বছর ধরে যেসব মূল্যবোধকে গৌরব দেওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে সমাজে, তারও লাভ-লোকসান হিসাব আছে, তাও শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। যাকে আমরা বিবেক বলে মহিমান্বিত করি, নিম্নমধ্যবিত্ত একজন ভদ্দরলোক তাকেও ব্যবহার করে একেকজনের কাছে একেকরকম করে। গণেশ, কুবের ও ধনঞ্জয়—পদ্মানদীতে মাছ ধরার এই ছোট দলের তিনজনেই কিন্তু গরিব, নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। মাছ ধরার নৌকাটির মালিক বলে ধনঞ্জয়ের অবস্থানটা একটু উঁচুতে, তামাক সাজানো হলে হুঁকোতে প্রথম টানটি দেবে সে-ই এবং সুযোগ পেলেই সে কুবের ও গণেশকে ঠকায়। গণেশ লোকটা বেশ

বোকা, কুবেরের চেয়েও তার আর্থিক অবস্থা খারাপ, সুতরাং কুবের তাকে অবহেলা করে। যে-লোকটি কুবেরের কাছ থেকে আড়ালে দুটো ইলিশ মাছ হাতিয়ে নিয়ে 'কাইল দিমু' বলে দাম না-দিয়েই কেটে পড়ে, সেও কিন্তু উচ্চবিত্ত নয়, তবে কুবেরের তুলনায় সচ্ছল এবং সর্বোপরি একজন ভদ্দরলোক তো বটেই। এখানে শোষণের বুনুনিটা বেশ বোঝা যায়। গণেশ যদি বোকা না-হয়ে একটু চালাকচতুর হতো তাহলেও কুবের কোনো-না-কোনোভাবে তাকে অবহেলা করতই। ধরা যাক, ধনঞ্জয় মহাপুরুষ। তা হলেও নৌকার মালিক হওয়ার জন্যই কুবের ও গণেশকে না-ঠকিয়ে তার আর উপায় নেই, তার ঐ একটুখানি আর্থিক সঙ্গতিই তাকে ওদের ঠকাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সস্তা মাছ ছাড়া আরকিছু হাতাবার ক্ষমতা ঐ নিম্ন-মধ্যবিত্তের লোকটির জীবনেও হবে না এবং এই দায়িত্বপালনে তার টার্গেট সবসময়েই নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। মেজবাবুর মতো গরিবের বন্ধু দেশের নিরন্ন মানুষকে উদ্ধারের মতলব আজও ছাড়েননি ; রংবেরঙের জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় এমনকী সমাজতান্ত্রিক পোশাক শরীরে চড়িয়ে তাঁরা এখন একটির পর একটি ভোটের বিপ্লব করেই চলেছেন। আরেকটি গল্পে পরিবারে রোজগেরে ছেলেটির প্রতি সবার উপচে-ওঠা-স্নেহ কি একেবারে আকস্মিক? বিপত্নীক বেকার জ্যাঠামশায়ের চাকরি জোগাড় হয়েছে শুনে সমস্ত বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক দুধ জোগাড় করতে বেরোয় অনেক রাত্রে, দুধ না-হলে জ্যাঠামশায়ের আফিমের মৌতাত জমবে না। যাকে মূল্যবোধ বলি তা তো বটেই, এমনকী মানুষের প্রবৃত্তি পর্যন্ত সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে ওঠানামা করে, সমাজকাঠামো অনুসারে তার ভাঙচুর হয়। একটি উপন্যাসে একই পরিবারের একটি ভাগ উচ্চবিত্ত এবং আরেকটি ভাগ নিম্নমধ্যবিত্তের পর্যায়ে পড়ায় তাদের জীবনযাপন থেকে শুরু করে মানসিক গঠন পর্যন্ত আলাদা। কোনো অংশকেই গৌরব দেওয়ার বা ধিক্কার দেওয়ার প্রবণতা নেই, নির্বিকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সময় কোনো রাজনৈতিক দর্শনে আস্থা না-থাকা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রবণতা, মূল্যবোধ, প্রবৃত্তি, বিকার প্রভৃতি বিশ্লেষণে তাদের শ্রেণীগত রুগ্‌ণতার দিকে তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই সময়ের লেখায় মানুষের যৌনতা কিন্তু মোটেই সুস্থ নয়। যৌনস্পৃহার আদিম বলিষ্ঠ প্রকৃতি এখানে অনুপস্থিত। কাম এখানে জীবনচালিকা শক্তি নয়, চরিত্রের যৌনতা অসুস্থ। তাঁর রুগ্‌ণ মানুষ, ক্লিষ্ট মানুষ বাঁচার উত্তেজনা বুঝতে যৌনতার ঝাঁঝ পেতে চায়। কামকে সুস্থভাবে, স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করার শক্তি থেকে তারা বঞ্চিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-চরিত্রটিকে খুব কামুক বলে ঠাহর করা হয় সে-লোকটিও কিন্তু একটির পর একটি মেয়েকে আকর্ষণ করে, অথচ সুস্থ জীবনযাপনের মধ্যে কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাপনের কামনায় কারও সঙ্গে কামকে গভীরভাবে কী তীব্রভাবে অনুভব করার তাগিদ তার শরীরে কী স্বভাবে কোথাও নেই। তার যৌনতা কিংবা কাম হল ব্যারাম, ঠিক করে বললে কঠিন ব্যারামের উপসর্গ।

মানুষের অনেক ভেতরে খানাতল্লাশি চালিয়ে অন্ধকার ও ঝাপসা মনোজগতের যে-সুষ্ঠু পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে বার করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে এখন পর্যন্ত তা তুলনাহীন। কিন্তু অবচেতনের প্রলাপ নোট করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি, মানুষকে সম্পূর্ণ করে চিনতে গিয়ে তার আবেগের বিকার, বুদ্ধির অপচয় এবং শক্তির ক্ষয়কে পর্যবেক্ষণ করেছেন নানা দিক থেকে। এর প্রকাশ নির্মোহ ও নির্বিকার, কিন্তু নির্লিপ্ত কিংবা

নিরপেক্ষ শিল্পী তিনি কখনেই ছিলেন না। রোগের শনাক্তকরণেই তাঁর ক্ষোভের এই প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সামাজিক অনাচার এর প্রেক্ষাপট, অনাচারটি সমাজব্যবস্থার ফল। রোগের যিনি শনাক্তকরণ করেন তিনিই অনুভব করেন যে এর প্রতিষেধক দরকার। মার্কসবাদী হওয়ার অনেক আগে থেকেই রোগনিরাময়ের উপায় তিনি খুঁজছিলেন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও কৌশল সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল তাঁর ছিল, কিন্তু এতে তাঁর আস্থার কোনো প্রকাশ কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নেই। রুগ্‌ণ ও বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অবদমিত কাম, তার স্বপ্ন, অপূর্ণ কামনা ও চাপা সাধকে বিশেষ পদ্ধতিতে টেনে বার করে তাকে সাময়িকভাবে আরাম দেওয়া যায়। অথবা পূর্বপুরুষের ভয়, আতঙ্ক, স্বপ্ন, অপমান, গ্লানি কিংবা বেদনাকে রোগের কারণ বলে নির্ণয় করলেও রোগীর নিজের দায়ভাগের মোচন হতে পারে। কিন্তু এতে আরোগ্য কোথায়? সমাজের যে-ব্যবস্থা রোগের শেকড়কে লালন করে তাকে উপড়ে ফেলবে কে? উপনিবেশের জন্মপঙ্গু 'ব্যক্তি' ভুগছে সায়েবদের ব্যক্তিসর্বস্বতার ব্যারামে। এখানে কেবল রোগ বা বিকারটির দিকে সমস্ত মনোযোগ দেওয়ায় মানুষের সামগ্রিক চেহারাটিই উপেক্ষিত হয়। এই চিকিৎসা তাই কাজ করে আফিমের মতো। এতে চিকিৎসার প্রতি আকর্ষণই রোগীর দিনদিন তীব্র হতে থাকে, আরোগ্যের সংকল্প তো দূরের কথা, সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা পর্যন্ত লোপ পায়। একটি উপন্যাসে উচ্চবিত্ত পরিবারের বিষাদগ্রস্ত এক মহিলাকে দেখি মনোবিজ্ঞানীদের লেখার নিয়মিত পাঠে তাঁর রোগের উপশম তো হচ্ছেই না, বরং জটিলতা বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিকে দেখতে দেখতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেন যে তার ওপর অনেক দিনের অনেক মানুষের অনেক সংস্কার ও অনেক প্রথার চাপ কী প্রকট! এই চাপটিকে তিনি পাঠককে হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়েন। এইসব প্রথা ও সংস্কার লালিত হয় কড়া বিন্যাসের ভেতর, বিন্যাসটির উৎস দেখতে গেলে সমাজ ও সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি তাঁর চোখে উন্মোচিত হয়।

সমাজভাবনা কথাসাহিত্যের একটি প্রধান শর্ত। সমাজের যে-কোনো রদবদল যাঁদের চোখে বিষ, সমাজ নিয়ে উদ্বেগ কিন্তু তাঁদেরও কোনো অংশে কম নয়। বাংলা উপন্যাসের শুরুতে বিধবাবিবাহ যাঁর কাছে মূর্খের তৎপরতা এবং তরুণী বিধবা প্রেমে পড়লে মেয়েটিকে গুলি করে না-মারা পর্যন্ত যাঁর শক্ত কলমটা ক্ষান্ত হয় না কিংবা আরও কিছুদিন পর সুন্দরী বিধবার ক্ষুরধার জিভে সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে লম্বাচওড়া বাণী হাঁকিয়ে তারপর তাকে গৌরব দিতে ঐ জিভেই ফের হবিষ্যি ছাড়া যিনি আরকিছু তুলে দেন না, বড়ভাইয়ের পর জন্মগ্রহণে ছোটভাইয়ের আক্ষেপের কিছু নেই—এই অজুহাতে বর্ণভেদের প্রতি যিনি নিজের প্রশ্রয়ের কথা ঘোষণা করেন—সমাজের কাঠামোয় যাতে এতটুকু চিড় না-ধরে সেজন্য তাঁরা বড়ই উদগ্রীব। সুতরাং, সমাজভাবনা তাঁদের কোনো অংশে কম নয়, এটি না-থাকলে অত বড় বড় লেখক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

সমাজভাবনা তো বটে, সেই সময়ের রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন লেখকদের অনেকেই জড়িত ছিলেন। তাঁদের সাহিত্যকর্মেও সমসাময়িক রাজনীতির পরিচয় বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় বেশিই এসেছে। বাংলা ভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখিত হয়েছে ঐ সময়েই, তার কোনো-কোনোটিতে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে লেখকের অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে। এর পাশাপাশি বাংলার নিম্নবিত্ত চাষির জীবন, পুরনো সমাজের ভাঙন,

মূল্যবোধের ক্ষয় প্রভৃতির যথাযথ চেহারাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ত্যাগী পুরুষের মহিমা মানুষকে মুগ্ধ করলেও এইসব ত্যাগ দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও জীবনবোধে কী প্রভাব ফেলল কিংবা এসবে আদৌ কোনো সাড়া পড়ল কি না তার পরিচয় অনুপস্থিত। একজন খুবই বড় মাপের শিল্পীর লেখায় নিম্নমধ্যবিত্তের দারিদ্র্য প্রকাশিত হয় সমস্ত গ্লানি নিয়ে। কিন্তু এই দারিদ্র্য লেখকের নিজের এবং ঐ দরিদ্র লোকদেরও মোলায়েম ভালোবাসায় স্নিগ্ধ, পাঠক গরিব হওয়ার ধিক্কার ধরতেই পারেন না। এই যে দেশপ্রেমের দীপ্তি, আত্মত্যাগের তেজ এবং দারিদ্র্যের তাপ—এর কোনোটাই এই সমাজের নয়, এ সবই অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে ধার করা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই জানতেন, সেই নক্ষত্র যদি আদৌ কখনো থেকেও থাকে তো তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, মৃত নক্ষত্রের আলোতে তিনি পথ চলতে চাননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক বড় লেখকদের সবারই সমকালীন রাজনীতিতে আস্থা ছিল, মধ্যবিত্তের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কার বা আদর্শ বলে বিবেচিত সংস্কারের সহাবস্থানে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেননি, জগাখিচুড়ি কিছু ধারণাকে রাজনৈতিক আদর্শের মর্যাদা দেওয়ার আরামদায়ক রেওয়াজকে তাঁরা মেনে নেন উদ্দীপনার সঙ্গে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট যেভাবে তৈরি করেন তাতেই সমকালীন রাজনীতির প্রতি তাঁর প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। একটি উপন্যাসে বড়লোকের ভালো ছেলে চরিত্রটি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের জেদি ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন তরুণীকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিচলিত হয়ে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে একটি মিটিং হচ্ছে দেখে সে সেখানে ঢুকে পড়ে। রাজনৈতিক সভাটির মঞ্চে বসে-থাকা-বক্তাদের একজনকে সে চেনে, লোকটি পাকা ধান্দাবাজ। বক্তাদের ভাষণে তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চে উঠে পড়ে এবং নিজেই চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করে। সভায় হাজির সবাইকে সে ধিক্কার দেয় এই বলে যে, তারা সব ন্যাকা, নিষ্ক্রিয় এবং স্বার্থপর। শ্রোতারা তার কথায় মজা পেয়ে গেছে, বিক্ষুব্ধ তরুণকে আরও বলার জন্য তারা উৎসাহিত করে। অবস্থাটা সভার উদ্যোক্তাদের জন্য কেবল বিব্রতকর নয়, বিপজ্জনকও বটে, মিটিং তো পণ্ড হতে যাচ্ছে। এখন মঞ্চ থেকে তাকে নামাবে কে? তাদের এই বিপদ কাটে মঞ্চেরই এক নেতার ফন্দিতে। নেতা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বিক্ষুব্ধ তরুণকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানায়। এবার তরুণ কিন্তু বিব্রত বোধ করে, সে আর কিছু বলতে পারে না। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পড়তেই বিদ্রোহী তরুণের বিস্ফোরণ চুপসে জল। সে চুপচাপ বসে পড়ে। মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ চাপা দেওয়াই হল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য। আন্দোলন আর সংগ্রামের পরিণতি গড়ায় আপোস পর্যন্ত। সে-সময়ের রাজনীতির সারমর্ম শেষ পর্যন্ত আপোস এবং সেই অপোসে সাড়া দেওয়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাতে নেই। সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বে যার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন সেই লোকটি ঔপনিবেশিক শাসনে বামন, বর্ণপ্রথার চোখ-রাঙানিতে জড়সড়, শ্রেণীশোষণে ক্লিষ্ট এবং আপোসকরা-রাজনীতিতে সন্তুষ্ট ও কাতর। শ্রীশ্রীকালীমাতার পদপ্রান্তে উত্তপ্ত মুণ্ড লুটিয়ে সায়েব মেরে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞায় এরা উত্তেজিত, আবার সায়েবদের হাতে বেদম প্যাঁদানি খেয়ে অহিংসার বাণীতেও এরা মুগ্ধ। উল্লেখযোগ্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটি কখনো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় শাসন প্রবর্তনের

জোশে মাতোয়ারা আবার কখনো সায়েবি কায়দায় জীবনযাপন করেও ধর্মের নাম করে নিজেদের আলাদা রাজনীতি তৈরি করতে তৎপর। মধ্যবিত্ত তখন রংবেরঙের ফন্দিকে আদর্শের জোব্বা পরাতে লিপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সমাজজীবনের খুঁটিনাটি খুব বেশি নেই। কিন্তু ব্যক্তিটির দিকে নজর দিলেই তার স্রষ্টা সমাজ, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির প্রকৃতি, স্বভাব ও পরিচয় গোপন থাকে না।

আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক
অনন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে—করে হতবাক।

এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তির রোগনির্ণয় করেছিলেন বলেই রোগনিরাময়ের পথ-অনুসন্ধানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকণ্ঠা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও তীব্র। রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার বিলাসিতা তাঁর ছিল না, মানুষের রুগ্ণ অন্তর্লোকে খানাতল্লাশির কাজটি তিনি করেছিলেন ক্ষোভ ও উদ্বেগ নিয়ে। প্রথম থেকেই তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে, ব্যক্তি হল সমাজের তৈরি এবং তার রুগ্ণতা ও ক্ষয়ের উৎস হল সমাজ। এই অসুস্থ ব্যক্তিটির সুস্থ হয়ে মানুষ হওয়ার জন্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন যে সবচেয়ে জরুরি, এই কথাটি সোজাসুজি না-বললেও এই অনিবার্য প্রতিষেধক সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তিনি সচেতন। সৎ, অকপট ও নির্মোহ বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষকে তার যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে অনুভব করানো ঔপন্যাসিকের কাজ, কিন্তু বড়মাপের শিল্পী তার মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত না-হয়ে পারেন না। জীবনের ব্যাখ্যার সঙ্গে এর পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন কার্ল মার্কস, এই পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব তাঁর দর্শনে তারও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তাই মার্কসবাদী হওয়াটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি তাঁর উটকো কোনো সিদ্ধান্ত নয়। পরবর্তী পর্বের লেখার সঙ্গে প্রথম পর্বের লেখার পার্থক্য থাকলেও কোনো বিরোধ কিন্তু নেই। বরং বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শেষ পর্বের রচনায়।

চল্লিশের দশকের শুরুতে দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। মার্কসবাদী সংগঠন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে তাৎপর্যময় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, কলকারখানা ও রেলওয়ে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শামিল হয়। সামন্ত শোষণকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার আয়োজন না-থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ হল তেভাগা আন্দোলন। কংগ্রেসের গদগদ ভক্তিভাবের আড়ালে তাদের পুঁজিবাদ-তোষণ দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। কংগ্রেসের প্রধানের পদ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গান্ধির চক্রান্ত দলের হাজার হাজার কর্মীর অনুমোদন পায়নি। গান্ধির কর্মকাণ্ড কংগ্রেসের বহু কর্মীর কাছে তাঁর মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দেয়। এমনকী পূর্ব বাংলার নিভৃত গ্রাম থেকে কংগ্রেসের সমর্থক ও কর্মীগণ গান্ধিকে ইংরেজের বন্ধু, মন্ত্রী-উজিরদের প্রভু প্রভৃতি বিশেষণে চিহ্নিত করে মুদ্রিত লিফলেট প্রচার করে। কংগ্রেসের ভেতরকার এই অসন্তোষের কারণ যা-ই হোক,

সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সামন্ত–দাপট ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধ ক্ষোভসঞ্চারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা খাটো করে দেখা যায় না। প্রতিক্রিয়াশীল দল মুসলিম লীগেও ইংরেজের পদলেহী সামন্ত–প্রভু, নবাব, নবাবজাদা, খানবাহাদুর, খানসাহেব প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে এই গোষ্ঠী যথেষ্ট সাড়া জাগায়। এইসব প্রতিষ্ঠানে সামন্ত–দাপট ও সামন্ত–সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্টদের তৎপরতার ফলেই।

এই দশকে বাংলা কবিতায় সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রকাশ করার আয়োজন চলে। বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী ঢুকেছিল তিরিশের দশকে, চল্লিশে এসে তারা তাদের ওপর আরোপিত মধ্যবিত্তসুলভ ভাবাবেগ ঝেড়ে ফেলার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল। সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করে অনেক বই লেখা হতে লাগল, সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক শিক্ষিত তরুণ বাঙালির কাছে বিবেচিত হল আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, আমাদের দেশেও বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী অনেকে শ্রেণীসংগ্রামের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হলেন।

তরল ভাবাবেগ পরিচালিত এবং পশ্চাৎমুখী সংস্কার ও উদ্ভট ধারণার দ্বারা পরিচালিত মধ্যবিত্তের ওপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এই পরিবর্তনের আভাস নিশ্চয়ই প্রেরণাদায়ক। এই সময় সাহিত্যচর্চায় তিনি মানুষের এমন শক্তির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন যা দিয়ে ব্যক্তির রুগ্‌ণতা নিরাময়ের লক্ষ্যে সামাজিক ব্যাধি নাশ করা সম্ভব। তাঁর এই পর্বের লেখায় নতুন উদ্যোগটি পাঠকের চোখ এড়ায় না। কিন্তু মূল প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে না। তাঁর রচনা আগের মতোই এগিয়ে চলে মানুষের স্বভাব ও প্রবণতা এবং ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে করতে। তবে এখানে এই বিশ্লেষণ পরিচালিত হল সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মানুষের শক্তির অনুসন্ধানে।

এই শক্তি সবচেয়ে বেশি ধারণ করে নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। উপনিবেশের ব্যক্তিবাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে তারা মুক্ত, তারা ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়নি, হাজার দুর্বলতা নিয়েও তারা মানুষই রয়ে গেছে এবং মানুষ মানেই অনেক মানুষ, ঐক্যবদ্ধ মানুষ। সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাও তাদের একটু বেশি। এর একটা কারণ এই যে, অনেকের সঙ্গে মিলতে হলে একান্ত নিজের কিছু ছাড়তে হয় ; ছাড়ার মতো জিনিস তাদের নেই বলে নিরাপত্তার পিছুটানে পদেপদে তাদের থমকে দাঁড়াতে হয় না। তবে শুধু এজন্য নয় কিন্তু। পেশার সঙ্গে তারা অনেক ঘনিষ্ঠ, এই ঘনিষ্ঠতার ফলে একই পেশার অন্য মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার তাগিদ তাদের বেশি। তার সৃষ্টিশীলতার প্রকাশও তার পেশার মধ্যেই, এজন্য তাকে নিভৃতে যেতে হয় না, তার জমি কিংবা যন্ত্রই তার গভীর আবেগপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে দেখি, সুতার অভাবে তাঁতিরা যখন বেকার ও নিরন্ন, হতাশ ও বিক্ষুব্ধ, তখন এক মধ্যরাতে গ্রামের নীরবতা চিরে বেজে ওঠে তাঁত চালাবার খটখট আওয়াজ। নিজের কাজ করতে না–পারায় হাতে–পায়ে খিল ধরার দশা হয়েছে, শুধু শরীরের জড়তা নয়, কর্মহীনতার মানসিক চাপ কাটাতেই সুতা ছাড়াই সে তাঁত চালাতে বসেছে। শ্রমজীবীর কাজের মধ্যেই তার প্রেরণাকে তুলে ধরে তার শক্তির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে যা খেয়াল করি তা হল এই

যে, সুতা লোপাটকারী বিত্তবানদের বিরুদ্ধে গ্রামের সব তাঁতির সমবেত ক্রোধই তার সৃজনশীলতার প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু মধ্যবিত্তের বেলায় কী হবে? শোষণের প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে হোক আর ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই হোক, মধ্যবিত্তের একটা ভূমিকা থাকেই। অবচেতনভাবে এই ভূমিকা পালন করতে করতে সৃষ্টিশীলতার শক্তি তার লোপ পায়। তার মেধা প্রয়োগ করতে হয় সমাজে বা পরিবারে নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে, এজন্য তাকে নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতে হয়। তার বুদ্ধি মানেই ফন্দি, তার উদ্দেশ্যের প্রতিশব্দ হল মতলব। ফন্দিপটু আর মতলববাজ লোক ব্যক্তির কোটর থেকে বেরিয়ে আর মানুষ হতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরের মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো ফন্দিচর্চা ছেড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের অধঃপতিত অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে, সমাজকে বোঝে এবং এর পরিবর্তনের জন্য তাদের মাথাব্যথাও প্রবল। এই শ্রেণীর অনেক তরুণকে দেখি যারা নিজের পরিবার ও শ্রেণীর 'মূল্যবোধ' ও 'নীতি'তে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম পর্বের মধ্যবিত্ত চরিত্রের দমবন্ধ হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা এখানে এসে পরিণত হয়েছে অনাস্থা ও বিরক্তিতে। কারও কারও ভেতর এই অবস্থা উঠে এসেছে ক্রোধে। এখন এই ক্রোধকে সমাজ ব্যবস্থা পালটাবার সংকল্পে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাদের কতটা?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্বের একটি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের একটি তরুণ ঐ ধরনের লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মাতৃহীন এই ছেলেটি মধ্যবিত্ত পরিবারিক জীবনে মোটেই স্বস্তি পায় না, ভালোবাসার নামে তরল ভাবালুতা এবং স্নেহের বন্ধনের নামে পুরুষমানুষকে চিরশিশু করে রাখার প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে প্রত্যাখ্যান করে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের চেয়ে সে বরং আরাম পায় একেবারে নিম্নবিত্ত অস্পৃশ্যদের অকপট ও বেপরোয়া আড্ডায়। এদিকে দেশের পরাধীনতাও তার কাছে অসহ্য, সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সে উদ্গ্রীব। কিন্তু ঐ দল তার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। দলের শক্ত শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়তে তার অনিচ্ছা এর আপাতকারণ হলেও সন্ত্রাসবাদীদের স্যাঁতসেঁতে সনাতন ভারতীয়ত্ব, উদ্ভট ভারতীয় রহস্যময়তার প্রতি ঘিনঘিনে ভক্তিভাব প্রভৃতির প্রতি ঐ তরুণের ঘৃণাই তার সঙ্গে তার সহ-অবস্থানের প্রধান বাধা। অস্পৃশ্য নিম্নবিত্তের মদের আসরে তার আড্ডা দেওয়া কিংবা নিষিদ্ধ এলাকায় তার আসা-যাওয়া ভক্তিরসে টইটম্বুর সন্ত্রাসবাদীদের শুচিবায়ু স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

কিন্তু তারপর? এই সাহসী ও সংস্কারমুক্ত ছেলেটি কি শেষ পর্যন্ত নিজের কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে পারল? তার সাহস, বেপরোয়া স্বভাব, প্রতিষ্ঠিত সংস্কারকে অবহেলা করা—এসবের উৎস হল তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মধ্যবিত্তের পঙ্গু কিংবা স্বাভাবিক পরিণতিই তাকে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ উপহার দিয়েছে, যেখান থেকে এই আলো সে ধার করেছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোন সাহসে? তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয় পারিবারিক রক্তের স্রোতে ; অসুস্থ হয়ে সুন্দরী মামির সেবা নিয়ে নিজের অজান্তেই সে সেবা করে মামির অবদমিত কামনাকে।

চরিত্রে শক্তি এবং স্বভাবে সামঞ্জস্য পাই বরং তার চাষি-বন্ধুর মধ্যে। ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে পড়েও তার জাতের স্বভাব সে হারায়নি। মধ্যবিত্তের ঘোরতর

ব্যক্তিবাদ থেকে সে আজন্ম মুক্ত। যেসব স্যাঁতসেঁতে আবেগ ঝেড়ে ফেলতে মধ্যবিত্তের বিদ্রোহী সন্তানকে মুণ্ডু ঝাঁকাতে হয়, সেগুলো তাকে মোটে স্পর্শই করেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার নেই, তার আছে গোঁয়ার্তুমি। এই গোঁয়ার্তুমি তাকে তার সমাজের আর দশজন থেকে বিচ্ছিন্ন তো করেই না; বরং তাদের দুর্বলতা ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করতে তাকে সাহায্য করে। তার একান্ত নিজের স্বার্থ আর পারিবারিক স্বার্থ আর তার সমাজের স্বার্থে কোনো ফারাক নেই, কোথাও রুখে দাঁড়ালে সে নিজের স্বার্থেই দাঁড়াবে, ঐ স্বার্থ ও তার নিজের সমাজের স্বার্থ অভিন্ন। তার শক্তির প্রকাশে, এমনকী সম্ভাবনাতেও রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোকের চেয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে তার আসন অনেক পোক্ত। কিন্তু এই যোগ্যতা দিয়ে গোটা দেশের সমাজ–পরিচালনা কী সেটা ভাঙার দায়িত্ব কি সে পায়? কিংবা সেই দায়িত্ব তার আসছে এমন কোনো আভাস কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে দিতে পারেন?

এই প্রশ্ন তাঁর শেষ পর্বের গোটা শিল্পকর্ম সম্বন্ধেই করা যায়। প্রথম পর্বের মতো এখানেও তাঁর সব লেখাই পরিকল্পনাপ্রসূত। যান্ত্রিক কিংবা ছককাটা গল্প নয়, কিন্তু স্কিম ধরে কাজ করার অভ্যাস তাঁর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঘটনা কী কাহিনীতে প্রধান গুরুত্ব না–দিয়েও এবং চরিত্রসৃষ্টির দিকে বিশেষ মনোযোগ না–থাকলেও গভীর বোধ ও তীব্র অনুভূতির কারণে তাঁর লেখা কখনোই শিথিল নয়, পরিণতি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্বের লেখায় তাঁর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাহিনীর ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য অখণ্ড স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয় না। প্রায়ই কাহিনীকে উপচে ওঠে তাঁর সিদ্ধান্ত, চরিত্রের বুদ্ধি সমাজের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রথম পর্বের রচনায় সমাজব্যবস্থার রাক্ষুসে হাঁয়ের ভেতর রুগ্‌ণ ও হাঁসফাঁসকরা ব্যক্তিকে দেখে বিচলিত পাঠককে তিনি পরের পর্বের রচনায় ঐ সমাজভাঙার স্বপ্ন কিন্তু দেখাতে পারেন না। বিচ্ছিন্ন মানুষ যেমন তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে, ভাগ্য–পরিবর্তনের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষ কিন্তু তার মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা সেভাবে পায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা হলে কী করতে পারতেন? সাহিত্যের পণ্ডিত সমালোচকদের জন্য এর জবাব দেওয়া সোজা, কারণ শিল্পীর দায়িত্ববোধ ও তাগিদ থেকে তাঁরা মুক্ত এবং সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি–বিবেচনাকে তাঁরা আমল দেন না। তাঁদের রেডিমেড রায় হল : মার্কসবাদকে গ্রহণ না–করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্ধকার ভেতরটা অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকলেই ভালো করতেন। তো, এতে কী হতো?—ব্যক্তির ক্ষয় ও রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে রূপ নিত বিশেষজ্ঞের দক্ষতায় এবং এই দক্ষতা তাঁকে বঞ্চিত করত মানুষকে সামগ্রিকভাবে দেখার শক্তি থেকে। দক্ষ বিশেষজ্ঞ হওয়ার দশা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন শিল্পী হিসাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে। অন্তর্দৃষ্টি কোনো অলৌকিক উপহার নয়, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টির প্রধান উপাদান হল ক্রোধ। প্রথম পর্বের শিল্পচর্চাতেও তিনি নিরপেক্ষ নন, মানুষকে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে খুঁড়তে খুঁড়তেই তাঁর ক্ষোভ দানা বাঁধে ক্রোধে। সমাজব্যবস্থাকে মানুষের রোগের কারণ জেনে তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হয় ঐ ব্যবস্থার ওপর। ব্যবস্থাটির বিনাশের সংকল্প থেকেই তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পর্বের শিল্পচর্চার বিরোধ কোথায়? মানুষের প্রতিরোধের শক্তিকে তিনি পাঠককে অনুভব করাতে পারলেন না কেন? তা হলে কি বলতে হবে যে, মার্কসবাদ তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়নি? অনেকদিন থেকেই তা–ই বলা হচ্ছে বটে। কিন্তু, তাঁর প্রথম পর্বের রচনাতেও

মধ্যবিত্ত-সংস্কার, ক্ষুদ্রতা, ভক্তিভাব ও শোচনীয় সীমাবদ্ধতাকে খুলে ফেলার বিশ্লেষণও তো মার্কসবাদী প্রবণতাই। এভাবে দেখতে দেখতে পরিবর্তনের তাগিদ বোধ করলে মার্কসবাদী হওয়া ছাড়া তিনি আর কী করতে পারেন?

মার্কসবাদ গ্রহণের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর যা করতে পারতেন তা হল এই : তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী অনেক বামপন্থি লেখকের মতো ইচ্ছাপূরণের গপ্পো ফাঁদা। জঙ্গি মজুরদের দিয়ে মালিককে ঘায়েল করে গোটা কয়েক লাল সূর্য উঠিয়ে তিনি নিরাপদে বিপ্লবের জয়ধ্বনি করতেন। দেশে বিক্ষোভ থাকলেও রাজনীতিতে প্রতিরোধের সংকল্প গভীর ও ব্যাপক না-হলে সাহিত্যে তার রঙিন ছবি আঁকা ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কী? এই ভাঁওতাবাজি হল বিপ্লববিরোধী তৎপরতা। বিপ্লবের মাধ্যমে সভ্যতার ফসলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে মার্কসবাদ। এই দর্শনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা হলে তাঁর শিল্পকর্মে পাঠককে সেই তাপ দিতে পারলেন না কেন যা বিপ্লবের স্বপ্নকে ইন্ধন জোগায়?

ঐ আগুনের তাপ বোঝার প্রধান শর্ত হল সমাজে সেই রাজনীতির আঁচ থাকা। এই আঁচের প্রধান উৎস হল রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক দল থাকে বুর্জোয়াব্যবস্থার ভেতরেই। কিন্তু বুর্জোয়াব্যবস্থাকে উৎখাত করাই এর লক্ষ্য। এই দল সামাজিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে না; সমাজকাঠামোর বিলোপসাধন করে নতুন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অভিন্ন আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রায় নিয়ে সবাইকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে মার্কসবাদী দর্শনের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটায়। মার্কসবাদকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে নিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চার বিষয় নয় ; এটি তাঁর কাছে মানুষের দুরারোগ্য রোগনিরাময়ের উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার হাতিয়ার। উপন্যাসে কোনো দর্শন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, চরিত্র ও কাহিনী এবং মানুষের জীবন ও তার বিশ্লেষণেই তার বিকাশ ঘটে। সমকালীন রাজনীতিতে সেই দর্শনের চর্চা এমনভাবে থাকে যাতে তা সামাজিক স্বভাবের অন্তর্গত হয়।

রাজনীতির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতে, রাজনীতিতে নিয়োজিত কিংবা রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্তের সবাই যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হবে এরও কোনো মানে নেই। কিংবা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত কর্মী কী নেতা যে বাড়িঘর ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে ঠাঁই নেবে অথবা তারা সব গরিব দেখে দেখে বিয়ে করবে—একথা ভাবা হাস্যকার। কিন্তু এই রাজনীতির চর্চা মধ্যবিত্তের বড় একটি অংশে নতুন ভাবনা তৈরি করবে এবং সংস্কৃতিতে এর প্রভাব ফেলবে। এর লক্ষণ তো দেখা গিয়েছিল। কমুনিস্টদের তৎপরতাই তো প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন কংগ্রেস, এমনকী মুসলিম লীগের ছোট অংশের মধ্যে হলেও একটুখানি তোলপাড় তুলেছিল। কিন্তু সেটা টিকল কোথায়? ব্যাপক সামাজিক প্রভাব ফেলার আগেই সেটা একেবারে মিইয়ে গেল।

ছাত্রদের যে-অংশটি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তারা বড় হয়ে কর্মজীবনে ঢুকতে-না-ঢুকতে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তেভাগার চাষিদের রক্ত কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পরিণত হল গোলাপি আভার মিষ্টি উত্তেজনায়। ওদিকে কংগ্রেসের সামন্তদাস আপোসকামী নেতৃত্বের

বিরুদ্ধে প্রধান শক্তি সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাতে চলে গেলেন ফ্যাসিবাদের ঢালের আড়ালে। কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের নেতা বলে পরিচিত তখন জওয়াহরলাল নেহরু। ভারতীয় রাজনীতির হ্যামলেট এলাহাবাদের এই রাজপুত্র সমাজতন্ত্রের আবেগে মাতোয়ারা, আবার যথাসময়ে গান্ধির সামন্ত চরণপ্রান্তে নতমুণ্ড। তাঁর সমাজবাদের বুলিতে কমিউনিস্টরা অভিভূত। ওদিকে ফ্যাসিবাদ–বিরোধিতার নাম করে ইংরেজবিরোধিতা স্থগিত রাখার জন্য কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্ত কি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য? সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রধান শত্রুকে রেয়াত দেওয়া কি আন্তর্জাতিকতাবাদের বিলাসিতা ভোগ করা নয়? এই বিলাসিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষায় না। তাঁর উপন্যাসের একটি চরিত্র কমিউনিস্টদের ঐ মনোভাবকে ধিক্কার দেয় 'রুশপনা' বলে। যে–রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত, তারই প্রবক্তাদের সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা থাকলে ঐ রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ উপন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় কীভাবে?

১৯৩৪ সালে লন্ডন প্রবাসী ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা যে–প্রগতিশীল সংগঠন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঐ দশকের শেষে এবং চল্লিশের দশকে এই দেশে তার বিকাশ ঘটতে থাকে। ঐ সংগঠনের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত আমাদের প্রশংসা পেয়ে আসছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী শিল্পী ও লেখকদের এই সংগঠন গোটা দেশজুড়ে উদ্দীপনামূলক নাটক ও সংগীতচর্চার যে–ব্যাপক আয়োজন করে এখন পর্যন্ত তা অতুলনীয়। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই তার সাফল্য ম্লান হয়ে আসে এবং মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব প্রায় মুছে যায়। প্রগতি লেখক সংঘের সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার প্রভাব কিন্তু সমার্থক নয়। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার সঙ্গে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার বক্তব্যও তাঁদের শিল্পচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার কারণে সেখানে ঠাঁই দিতে হয়েছে অনেককে, ফলে ছাড়ও কম দিতে হয়নি। দেখতে দেখতে শ্রেণীসংগ্রামকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল কেবলই ভালো সমাজগড়ার নিরাপদ বাসনা। সেখানে কে না ছিলেন? গান্ধির অহিংস ও হিংস্র অনুসারী, তাঁর হিংসুটে বিরোধী লোকজন, মুসলিম লীগের অপেক্ষাকৃত উদার অংশের সঙ্গে জুটেছিলেন ঐ সংগঠনের জেহাদি ও তৌহিদি সমর্থকগণ। এটা তখনকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মনোভাবেরই প্রতিফলন। জওয়াহরলালের প্রকৃতিতে সমাজবাদের উপাদান পাওয়া, পাকিস্তান দাবিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করা—সব কি ঘোরতর স্ববিরোধিতা নয়? ওটাও ভালো, এটাও ভালো, 'সস্তা ভালো, দামিও ভালো, তুমিও ভালো, আমিও ভালো'—সবাইকে ভালো ভাবার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে যারা তাদের জন্য 'সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলাগুড়'—এই সহাবস্থানের ইচ্ছার উৎস হল দায়িত্বকে ঝামেলা ভেবে তাই এড়াবার প্রবণতা। এইসব মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসার কারণ হল সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেও বিপ্লবের ধাক্কা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার লোভ।

ফল কী হয়েছে? জওয়াহরলালকে সমাজবাদী বলে যারা পুলকিত তাঁর কাছে তারা জিনজার গ্রুপের বেশি দাম পায় না। আদার একটুখানি ঝাঁঝ ছড়ানো ছাড়া কমিউনিস্টরা আরকিছু করতে পারে বলে তিনি গণ্য করেন না। সবাইকে একদেহে লীন করার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সবচেয়ে ক্ষতি হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের। এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কমিউনিস্টদের শ্রমিক আন্দোলন ও তেভাগা অন্য দলগুলোর ভেতরেও প্রগতিশীল ভাবনার আলো ফেলতে শুরু করেছিল, সেই

ভাবনা ক্রমেই পিছিয়ে যেতে শুরু করল। মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও যে একটি অংশ সামন্ত-প্রভুদের কোণঠাসা করার আয়োজন করেছিলেন, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি এসে তাঁদের সমস্ত শ্রমের ফল ভোগ করতে লাগলেন বিত্তবান প্রায়-বুর্জোয়া নেতারা এবং আরও কিছুদিন যেতে-না-যেতেই সবাইকে উৎখাত করে দল কবজা করে ফেলে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তিতে নিয়োজিত সামন্ত-প্রভুরা। মুসলমান তরুণ বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন তাঁদের অনেকেই পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করতে লাগলেন। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক বছর আগেই 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠিত হল, এঁদের সাহিত্যচর্চা অবশ্যই বাংলা ভাষায়, কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্যভাবনায় এঁরা বিভ্রান্ত। প্রতিভাবান মুসলমান কবি ইসলামি ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে ঢুঁ মারলেন মধ্যপ্রাচ্যের পুরাণে যার চরিত্রের অনেকেই অমুসলমান। নিজেদের মুসলমান-পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য এঁদের উৎসাহ কখনো কখনো উন্মাদনার ধার ঘেঁষে গেছে। এমন মুসলমান কলেজ-শিক্ষকের কথা শুনেছি যিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের মার্কসবাদে আস্থা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে না-পেরে শেষ পর্যন্ত মিনতি করেন 'কমিউনিস্ট যখন হবেই তো মুসলমান কমিউনিস্ট হয়ো'।

কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হতে-না-হতে কংগ্রেসের সনাতন ভারতীয়ত্ব ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মধ্যবিত্তকে এতটাই আচ্ছন্ন করে যে, দেশভাগের সময় বাংলাকে অখণ্ড রাখার দুর্বল উদ্যোগটিকে তারা রোধ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগে। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কেউ-কেউ পর্যবসিত হলেন শুধুই হিন্দুত্বে, মুসলমান বাঙালির সঙ্গে বসবাস করা তাঁদের রুচিতে বাধল। পাকিস্তান-বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলমানদের জীবনযাপন, তাদের পারিবারিক প্রথা, মুসলমান নাম প্রভৃতি নিয়ে এমন সব ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগলেন যেখানে ন্যূনতম রুচির পরিচয় নেই। জনপ্রিয় দৈনিক *আনন্দবাজার* দীর্ঘকাল ধরে একই জাতির একটি প্রধান সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে-ইতর মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল তা থেকে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত রেহাই পায় কী করে? এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় *দৈনিক আজাদ* বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সাম্প্রদায়িকতার উসকানি দেওয়া, পশ্চাৎপদ মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয় পত্রিকার ভূমিকা অসাধারণ। এত করেও নজরুল ইসলামকে হটানো গেল না। মুসলমান মধ্যবিত্তের ঘরে-ঘরে তখন জিন্নাহ্‌ ও নজরুলের উদ্ভট সহ-অবস্থান।

মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি এই অবস্থায় কোন পর্যায়ে নেমে আসতে পারে? হিন্দুদের বিশুদ্ধ হিন্দু এবং মুসলমানদের সাচ্চা মুসলমান থাকার উসকানি দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলেন গান্ধি। তাঁর ভক্ত এবং শত্রু সবাই তাঁর এই আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস লিখছেন, বিশেষ করে শেষের দিকে, দেশ জুড়ে তখন শুধু হিন্দু আর শুধু মুসলমান, মানুষ পাওয়া ভার। তখন সুস্থ থাকতে পারেন কেবল কমিউনিস্টরা ; সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করা, দেশবাসীর কাছে প্রকৃত শত্রুকে শনাক্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দায়িত্ব পালন করার কথা তো তাঁদের। অথচ সাম্প্রদায়িকতার মোকাবেলা করতে তাঁরা হাঁক ছাড়লেন, 'গান্ধি-জিন্নাহ্‌ এক হও'। তাঁরা ঐক্য চাইলেন দুটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। গান্ধি-জিন্নাহ্‌র ঐক্যে মানুষের

লাভ কী? এই দুটোই তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নিজের সংগঠনের এই 'দাবি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেচনা করেন আবদার বলে এবং ঐ সময়ের পটভূমিতে লেখা একটি উপন্যাসে কমিউনিস্ট কর্মীর মুখ দিয়ে নিজের কথা জানান, গান্ধি ও জিন্নাহ্‌র ঐক্য চেয়ে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করেছেন।

অথচ দল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির জন্য মনের টান জীবনের শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছেন। প্রবল দারিদ্র্যে জীবনযাপন করলেন, সপরিবারে কষ্ট করলেন, মৃত্যু হল প্রায় বিনা চিকিৎসায়। নিজের শরীরের ওপর যতভাবে সম্ভব অত্যাচার চালিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যেও চোখে পড়ে তাঁর অসাধারণ দায়িত্ববোধ। বড়লোক ভাইদের ওপর নির্ভর না-করে বৃদ্ধ পিতাকে রেখেছেন নিজের সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ না-করাটাও তাঁর দায়িত্ববোধেরই আরেকটি প্রকাশ। দলের নীতি নির্ধারণ করার অবস্থান তাঁর কখনোই ছিল না, আশা করেছিলেন যে এদের দিয়েই সমাজের পরিবর্তনসাধন সম্ভব হবে। এই আশাটুকু না-থাকলে তাঁকে আগেই আত্মহত্যা করতে হতো।

অন্যদিকে, এই দল মধ্যবিত্তের ভেতর স্বপ্ন ও সংকল্প সৃষ্টি না-করে বরং মধ্যবিত্তের সংস্কারে পরিচালিত হয়েছে। কংগ্রেসে ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য কামনা করে তাঁরা চরম মূর্খতার পরিচয় দেন। শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য তাঁদের বিবেচনায় না-থাকার ফলেই এরকম উদ্ভট কথা তাঁদের মনে হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার কথা যদি ছেড়েই দিই তো মধ্যবিত্তের মানসিকতাটি তখন কোন পর্যায়ে? যারা অসাম্প্রদায়িক তারাই-বা কোন মনোবৃত্তির অধিকারী? কোটি কোটি চাষির প্রাণান্ত শ্রমের ফসলে মধ্যবিত্তের মুখের গ্রাস জোটে। ঐ ভাত খেয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়, পড়তে পড়তে কেউ-কেউ মার্কসবাদীও হয়। কিন্তু ঐ চাষা থাকে না-খেয়ে, তার ছেলের অক্ষরজ্ঞান হয় না, অন্ন খুঁজতে শহরে এসে বস্তিতে বাঁচে কুকুর বিড়ালের মতো। এ নিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুকের ছোট্টো কোনো কোণেও অপরাধবোধের একটুখানি কাঁটাও তো বেঁধে না। স্তালিনের হাতে ফ্যাসিবাদের পতন হওয়ায় সভ্যতার বিপর্যয় রোধ হল। খুব ভালো, সবাই খুশি। কিন্তু ফ্যাসিবাদের প্রাচীনতম ও ইতরতম চেহারা ভারতীয় বর্ণপ্রথায় তো চিড় ধরে না। বিয়েতে পণ নেওয়া অব্যাহত থাকে, তরুণী-বিধবার বৈধব্যের আগুনকে আলো বলে ঠাহর করার অভ্যাস চল্লিশের দশকেও লোপ পায়নি।

প্রথম পর্বের রচনায় সেই সময়ের রাজনীতি, সামাজিক অনাচার, আদর্শের ছলে বিচিত্র সব সংস্কারের উদ্ভট সহ-অবস্থান সামনে না-এনেও এসবের শিকার রুগ্ণ ব্যক্তিটিকে যথামাত্রায় তুলে ধরেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের ক্ষয়কে উন্মোচন করে পাঠককে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ক্ষয়ের নিরাময়ের সংকল্প খুঁজতে গেলেন যেখানে সেখানে তখনও ঐ অবক্ষয় অব্যাহত রয়েছে। বিদেশি শাসনের অবসান ঘটছে, সেখানে বিপুল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। শ্রমজীবী লড়াইতে নেমেছে, লড়াইয়ের নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা ঐ হাতই মেলাতে চায় ভক্তিবাদীদের সঙ্গে। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীরা হেরে গেছে, কিন্তু দেশের বিশাল সমাজে ফ্যাসিবাদের কদর্য রূপের চর্চায় বিরতি পড়েনি। দুর্ভিক্ষে মুনাফা লোটে যারা, ক্ষমতায় আসে তারাই। নতুন রাজনীতির রোগা ধারাটি মধ্যবিত্তের যে-পরিবর্তনটুকু এনেছে সেখানেও নতুন ধরনের উদ্ভট সহ-অবস্থান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন যদি কোথাও থাকে তো তা পাওয়া যায় কেবল নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর জীবনে। উচ্চবিত্ত ও নানা কিসিমের মধ্যবিত্তের লাথিঝাঁটা খেয়ে তাদের খাওয়াপরার সংস্থান করে এবং নিজেরা না-খেয়ে, উচ্চবর্ণের কাছে জানোয়ারের অধম হয়ে থেকে এবং দফায়-দফায় ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েও তারা যে বাঁচে এবং বাঁচার জন্য আরও অনেকের জন্ম দেয়, তা কেবল বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার বলেই সম্ভব হচ্ছে। এরাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার পাত্র, এরা তাঁর উপন্যাসের বিষয়ও হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন-রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের রাজনৈতিক কর্মী। এই কর্মীও শ্রমজীবীর কাছে অনেক শেখে, প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করার শক্তি পায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত কোটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে পায় না। যে-সংস্কৃতির ভেতর সে বড় হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করতে করতেই তো তার শক্তির অনেকটা নষ্ট হয়। বিভ্রম কাটাতে, খোঁয়ারি সারাতে যার সময় যায়, স্বপ্ন দেখবে সে কখন? আর সেই স্বপ্ন ও রূপায়ণ তো আরও অসম্ভব কাজ।

উপন্যাস কাজ করে ঘোরতর বর্তমানের ভেতর। আদিম মানুষের সঙ্গে হিংস্র জানোয়ারের লড়াই নিয়ে গল্প লিখলেও লেখককে দাঁড়াতে হয় বর্তমানের এবড়োখেবড়ো ডাঙায়। রূপকথা, কেচ্ছা, ফ্যান্টাসি তো উপন্যাসে থাকতেই পারে, অনেকের লেখায় বেশ অনেকটা জুড়েই থাকে ; কিন্তু এগুলো ব্যবহৃত হয় বর্তমানকে তাৎপর্যময় করার লক্ষ্যে। যে-মধ্যবিত্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে মানুষের স্বপ্নে রূপায়ণের দায়িত্ব নেয় সেই লোকটির আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত, সততায় ফাঁক নেই এবং তার নিষ্ঠা নিরঙ্কুশ। মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়ায় তার অপরাধবোধ দিনদিন প্রকট হয়, এর সঙ্গে মেশে ক্ষোভ ও বেদনা, এগুলোকে সে গড়ে তোলে ক্রোধে। তার সংস্কৃতির মান উন্নত বলেই সে নতুন পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তখন গোটা সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধ একেবারেই অন্যরকম। তাকে এগুতে হয় পদেপদে বিশ্লেষণ করতে করতে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হয় স্বয়ং লেখককে। লেখক তার হাত না-ধরলে তো সে পড়ে যাবে। চরিত্র তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে, তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আর হয় না, পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ হয় শিথিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন তাই শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংকল্প হয়ে ফোটে না। এই কথাটি চেপে গেলে বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্যময় শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের খুব বড় মাপটিকেও অস্বীকার করা হয়।

বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় উৎপন্ন 'ব্যক্তি'র বিশেষ কোনো সমস্যা কী সংকটকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখার জন্য ছোটগল্পের চর্চা হয়ে আসছে আজ দেড়শো বছর ধরে। 'ছোটগল্প মরে যাচ্ছে ...' এই চরম জবাবটি শুনে মনে হতে পরে, ঐ সমাজ–ব্যবস্থা ও তার হাল মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যেমন সামন্তব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে মহাকাব্যকে বিদায় নিতে হয়েছে। অথচ মানুষের বীরত্ব ও মহত্ত্ব, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, করুণা ও হিংস্রতা, ক্ষমা ও ঈর্ষা, ক্রোধ ও ভালোবাসা এবং ভোগ ও ত্যাগের সর্বোচ্চ রূপের প্রকাশের মধ্যে সেই সময়ের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে পরম গৌরব দেওয়া হয়েছে মহাকাব্যেই। দিন যায়, অন্য যুগের পাঠকের কাছে মানুষের এই দেবত্ব লোপ পেলেও সে মহত্তর গৌরব নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। মহাকাব্যের গৌরব বাড়ে। কিন্তু অন্যদিনে এসে মানুষকে প্রকাশ করার জন্য এই প্রকরণটিকে শিল্পী আর ব্যবহার করতে পারেন না, নতুন সমাজে মানুষ আর অতিমানব নয়, সে নিছক ব্যক্তিমাত্র। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির উত্থানের সঙ্গে তার প্রকাশের স্বার্থে, বিকাশের তাগিদেও বটে, জন্ম হয় উপন্যাসের। প্রথম দিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোতে সমাজের নতুন মানুষ 'ব্যক্তি'কে গৌরব দেওয়ার উদ্যোগ স্পষ্ট, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর কারণেই ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পিচ্ছিল পথ ধরে বন্দি হল ব্যক্তিসর্বস্বতার স্যাঁতসেঁতে কোটরে তখন এই মাধ্যমটিই তার ক্ষয় ও রোগ শনাক্ত করার দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের ঘাড়ে। আজ রোগ ও ক্ষয়ের শনাক্তকরণের সঙ্গে আরও খানাতল্লাশি চালিয়ে ব্যক্তির মানুষে উন্নীত হওয়ার সুপ্ত শক্তির অন্বেষণে নিয়োজিত হয়েছে উপন্যাসই। আর ছোটগল্প তো তার জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির রোগ ও ক্ষয়কে তীক্ষ্ণভাবে নির্ণয় করে আসছে। এই সমাজব্যবস্থার একটি ফসল হয়েও ছোটগল্প এই ব্যবস্থার শ্রীচরণে তার সিঁদুরচর্চিত মুণ্ডুখানি কোনোদিনই ঠেকিয়ে রাখেনি যে এর মহাপ্রয়াণ ঘটলে তাকেও সহমরণে যেতে হবে। তা ছাড়া, এই বুর্জোয়া শোষণ ও ছলাকলার আশু–অবসানের কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

তবে হ্যাঁ, ছোটগল্পের একটা সংকট চলছে বটে। বাংলা ভাষায় বেশকিছু শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখা হয়েছে বলেই এই সংকটটি চোখে পড়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, তাঁর পরেও

আন্তর্জাতিক মানের গল্প লিখেছেন বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিক। তাঁদের বেশির ভাগই মারা গেছেন, জীবিতদের বেশির ভাগই হয় কলম গুটিয়ে রেখেছেন নয়তো মনোযোগ দিয়েছেন অন্য মাধ্যমে। প্রকাশকদের নজরও উপন্যাসের দিকে, গল্পের বই ছাপলে তাদের নাকি লোকসান। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর বিশেষ সংখ্যা মানে হাফ–ডজন হাফ–ডজন উপন্যাস, ছোটগল্পের পাত্তা সেখানেও নেই। এখন লোকে নাকি গল্প পড়তে চায় না, ঘরে বসে ভিসিআরে গল্প দেখে। কিন্তু তা হলে উপন্যাস বিক্রি হয় কী করে? গড়পড়তা উপন্যাস আর গড়পড়তা ভিসিআরের ছবির মধ্যে তফাতটা কোথায়? জনপ্রিয় উপন্যাস হলেই সেটাকে তরল বলে উড়িয়ে দেওয়ার মানে হয় না, লেখকের উদ্দেশ্য বা মতলব যা–ই থাক, নিজের সমস্যাকে কোনো–না–কোনোভাবে শনাক্ত হতে না–দেখলে পাঠক একটি বইয়ের অনুরাগী হবে কেন? আর শিল্পমানে উন্নত উপন্যাস পৃথিবী জুড়ে যত লেখা হচ্ছে ঐ মাপের ছোটগল্পের পরিমাণ সে–তুলনায় নগণ্য। ছোটগল্পের প্রকাশ কিন্তু আগেও খুব একটা ছিল না, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের পাঠক বরাবরই কম। তবু আগে ছোটগল্প লেখা হয়েছে এখন অনেক কম হচ্ছে। মনে হয় এই সংকটের কারণটা খুঁজতে হবে ছোটগল্পের ভেতরেই।

কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে একরৈখিক আলোর মধ্যে তাকে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করার শর্তটি পালন করা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে দিনদিন কঠিন হয়ে পড়ছে। একটি মানুষকে একটিমাত্র অনুভূতি বা সমস্যা দিয়ে চিহ্নিত করা এখন অসম্ভব। লেখকের কলম থেকে বেরুতে–না–বেরুতে এখনকার চরিত্র বেয়াড়া হয়ে যায়, একটি সমস্যার গয়না তাকে পরিয়ে দেওয়ার জন্য লেখক হাত তুললে সে তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গায়ে তুলে নেয় হাজার সংকটের কাঁটা। লেখকের গলা শুকিয়ে আসে, একটি সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য। এত সংকটের ব্যাখ্যা করার সুযোগ এখানে কোথায়? অর্জুনের মতো নজরে পড়া চাই পাখির মাথাটুকু, লক্ষ্যভেদ করতে হবে সরাসরি, আশপাশে তাকালে তীর ঐ বিন্দুটিতে পৌঁছবে কী করে? লেখক তখন থেমে পড়েন, গলার সঙ্গে শুকোয় তাঁর কলম। কারণ, ছোটগল্পের শাসন তিনি যতই মানুন, এটাও তো তিনি জানেন যে তাঁর চরিত্রটির উৎস যে–সমাজ তা একটি সচল ব্যবস্থা, সেখানে ভাঙচুর চলছে এবং তার রদবদল ঘটছে অবিশ্বাস্য রকম তীব্র গতিতে। পরিবর্তনের লক্ষ্য হল শোষণপ্রক্রিয়াকে আরও শক্ত ও স্থায়ী করা। এর প্রধান হাতিয়ার হল রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ক্রমেই স্ফীতকায় হচ্ছে। মানুষের ন্যূনতম কল্যাণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ না–নিলেও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে চলেছে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট কোনো কৃষিনীতি সে নেবে না, কিন্তু সারের দাম বাড়িয়ে চাষির মাথায় বাড়ি মারবে নির্দ্বিধায় ; পাটের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে চাষিকে সে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। বন্যার পর, দুর্ভিক্ষের সময় জমি থেকে উৎখাত হয়ে নিরন্ন গ্রামবাসী বিচ্যুত হয় নিজের পেশা থেকে, কিন্তু নতুন পেশা খুঁজে নিতে রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার ডঙ্কা বাজিয়ে যে–ব্যবস্থার উদ্ভব, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলেও কি কিছু অবশিষ্ট আছে? দম্পতির শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে রাষ্ট্র হুকুম ছাড়ে, ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানের বেশি যেন পয়দা কোরো না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও খাদ্যের দায়িত্ব নিতে তার প্রবল অনীহা। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনের মচ্ছব চলে, সেখানে ব্যবস্থা এমনই মজবুত যে কোটিপতি ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই যে নির্বাচিত হয়। দফায়–দফায় গণআন্দোলনে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী প্রাণ দেয়, রাষ্ট্রের মালিক পালটায়, ফায়দা

লোটে কোটিপতিরা। রাষ্ট্রের মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য গ্রামে পর্যন্ত টেলিভিশন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে চাষাভুষারা বসে বসে টেলিভিশনের পর্দায় আমেরিকানদের সাম্প্রতিক জীবনযাপন দেখে, সেখানকার মেয়েপুরুষ সব তীব্র গতিতে গাড়ি চালায়, রকেট ছোড়ে, তাদের একটি প্রধান চরিত্রের নাম কম্পিউটার, তার কীর্তিকলাপও বিস্তারিত দেখা যায়। বাড়ি ফিরে ঐ চাষি পায়খানা করে ডোবার ধারে, ঐ ডোবার পানি সে খায় অঞ্জলি ভরে, টেলিভিশনে মস্ত করিডোরওয়ালা হাসপাতাল দেখে মুগ্ধ চাষি বৌছেলেমেয়ের অসুখ হলে হাঁস-মুরগি বেচে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছে শোনে যে ডাক্তারসাহেব কাল ঢাকা গেছে, ডাক্তারসাহেব থাকলে শোনে যে এখানে ওষুধ নেই। তখন তার গতি পানি-পড়া-দেওয়া ইমাম সাহেব। রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলার গ্রাম এই-ই ছিল, তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকের যে-বিবরণ লিখে গেছেন, তাতে এই একই পরিচয় পাই। পরে শরৎচন্দ্র কৃষকের ছবি আঁকেন, তাতেও তেমন হেরফের কই? তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকী সেদিনের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে-চাষিকে দেখেছিলেন সেও এদেরই আত্মীয়। কিন্তু একটা বড় তফাত রয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফের তার দেখা পর্যন্ত, বড়জোর রেলগাড়িতে চড়ার ভাগ্য কারও কারও হয়ে থাকবে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে আরও পরে। বাংলাদেশের নিভৃত গ্রামের বিত্তহীন চাষি বিবিসি শোনে, টেলিভিশন দেখে, জমিতে শ্যালো মেশিনের প্রয়োগ সম্বন্ধেও সব জানে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার তার জীবনে আর সম্ভব হয় না। টেলিভিশনের ছবি তার কাছে রূপকথার বেশি কিছু নয়। রূপকথা বরং অল্পক্ষণের জন্য হলেও তার কল্পনাকে রঙিন করতে পারত, একটা গল্প দেখার সুখ সে পেত। গান আর গাথার মতো রূপকথা শোনাও তার সংস্কৃতিচর্চার অংশ। পক্ষীরাজ তো কল্পনার ঘোড়া, এর ওপর সেও যেমন চড়তে পারে না, গ্রামের জোতদার মহাজনও তাকে নাগালের ভেতর পাবে না। কিন্তু টেলিভিশনে-দেখা-জীবন তো কেউ-কেউ ঠিকই ভোগ করে। ঢাকা শহরের কেউ-কেউ এর ভাগ পায় বইকী। তাদের মধ্যে তার চেনাজানা মানুষও আছে। এই দুই দশকে শ্রেণীর মেরুকরণ এত হয়েছে যে গ্রামের জোতদারের কী সচ্ছল কৃষকের বেপরোয়া ছেলেটি ঢাকায় গিয়ে কী করে কী করে অনেক টাকার মালিক হয়ে বসেছে, সে নাকি এবেলা ওবেলা সিঙ্গাপুর-হংকং করে। চাষিরা নিজেদের কাছে তাই আরও ছোট হয়ে গেছে। তবে কি ঐ জীবনযাপন করতে তার আগ্রহ হয় না? না, হয় না। তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্পৃহাকে সংকল্পে রূপ দিতে পারে যে-রাজনীতি তার অভাব আজ বড় প্রকট। রাজনীতি আজ ছিনতাই করে নিয়েছে কোটিপতির দল। এদের পিছে পিছে ঘোরাই এখন নিম্নবিত্ত মানুষের প্রধান রাজনৈতিক তৎপরতা। এখনকার প্রধান দাবি হল রিলিফ চাই। এনজিওতে দেশ ছেয়ে গেল, নিরন্ন মানুষের প্রতি তাদের উপদেশ : তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। কী করে?—না, মুরগি পোষো, ঝুড়ি বানাও, কাঁথা সেলাই করো। ভাইসব, তোমাদের সম্পদ নেই, সম্বল নেই, মুরগি পুষে, ডিম বেচে, ঝুড়ি বেচে তোমরা স্বাবলম্বী হও। কারণ, সম্পদ যারা হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে তা তাদের দখলেই থাকবে, ওদিকে চোখ দিও না। রাষ্ট্রক্ষমতা লুটেরা কোটিপতিদের হাতে, তাদের হাতেই ওটা নিরাপদে থাকবে, ওদিকে হাত দিতে চেষ্টা কোরো না। তাদের মানুষ হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, অধিকার-আদায়ের স্পৃহা এবং অন্যায় সমাজব্যবস্থা উৎখাত করার সংকল্প চিরকালের জন্য বিনাশ করার আয়োজন

চলছে। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী তাই ছোট থেকে আরও ছোট হয়, এই মানুষটির সংস্কৃতির বিকাশ তো দূরের কথা, তার আগের অনেক অভ্যাস পর্যন্ত লুপ্ত হয়, কিন্তু নতুন সংস্কৃতির স্পন্দন সে কোথাও অনুভব করে না।

এখন এই লোকটিকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কি 'ছোট প্রাণ ছোট কথা'র আদর্শ দিয়ে কাজ হবে? তার একটি সমস্যা ধরতে গেলেই তো হাজারটা বিষয় এসে পড়ে, কোনোটা থেকে আরগুলো আলাদা নয়। একজন চাষির প্রেম করা কী বৌকে তালাক দেওয়া, তার জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কী ভূমিহীনে পরিণত হওয়া তার ছেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে রওনা হওয়া এবং সেখান থেকে সৌদি আরব যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় টাউটের পাল্লায় পড়া, তরুণ চাষির প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা—এসবের সঙ্গে সারের ওপর ভরতুকি তুলে নেওয়া কিংবা জাতীয় পরিষদের ইলেকশনে তিন কোটিপতির ইলেকশন ক্যাম্পেনে টাকার খেল দেখানো কিংবা এনজিওর কার্যক্রমের সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা এমনকিছু বিচিত্র নয়। ছোটগল্প লিখতে গিয়ে কোন ব্যাপারটা আনব আর কোনটা আনব না, সমস্যাকে তুলে ধরতে গেলে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি, ছোটগল্পের সীমারেখা কোথায়—এসব প্রশ্ন কি ছোটগল্প লেখাকে জটিল কাজ করে তুলছে না?

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কী উচ্চমধ্যবিত্তের চরিত্র অনুসরণ করা কঠিন। নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত আর বাপ-দাদার শ্রেণীতে পড়ে থাকতে চায় না, সবারই টার্গেট বড়লোক হওয়া। যে যে-পেশায় থাকুক-না, ওর মধ্যেই পয়সা বানাবার ফন্দিফিকির বার করার তালে থাকে। এখন মধ্যবিত্তের সংস্কার বলি, মূল্যবোধ বলি কিংবা মূল্যবোধ বলে চালানো সংস্কার, অথবা অভ্যাস, রেওয়াজ, আদবকায়দা, বেয়াদবি বেতমিজি—এগুলো মোটামুটি সবারই কমবেশি জানা। খারাপ লেখকও জানেন ভালো লেখকও জানেন। কিন্তু যে-লোকটি মানুষ হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে, কী মধ্যবিত্তের সংস্কার যার রক্তে, সে যখন শয়নে স্বপনে পশ লিভিংয়ের ধান্দায় থাকে তখন সে বড় দুর্বোধ্য মানুষে পরিণত হয়। আবার চুরিচামারি করে, ঘুষ খেয়ে অজস্র মানুষের গলায় লালফিতার ফাঁস পরিয়ে, স্টেনগান মেশিনগান বা বাখোয়াজির দাপটে, এমনকী বিদ্যা বেচেও কয়েক বছরে যারা উচ্চবিত্তের প্রাসাদে প্রবেশ করেছে এবং তারপর সারাজীবনের অভ্যাস, সংস্কার, রেওয়াজ, প্রথা সব পালটে 'উইথ রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট' বুর্জোয়া হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত বরং বলি ব্যতিব্যস্ত, ছোটগল্পে তাদের যথাযথ শনাক্ত করা কি কম কঠিন কাজ! ভণ্ডামি মধ্যবিত্তের স্বভাবের অংশ বহু আগে থেকেই। কিন্তু ভণ্ডামির ভেতরেও যে সামঞ্জস্য থাকে, এখন তাও খুঁজে পাওয়া ভার। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহাচ্যাম্পিয়ন, বাংলার 'ব' বলতে প্রাণ আনচান করে ওঠে, চোখের জলে বুক ভাসায় এমন অনেকের ছেলেমেয়ে জন্ম থেকে থাকে বাইরে, বাংলা ভাষা বলতেও পারে না। রাজনীতি থেকে সর্বক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ্‌র বুলি হাঁকায় এমন অনেক সাচ্চা মুসলমানের মক্কা হল আমেরিকা, ছেলেমেয়েদের আমেরিকা পাঠিয়ে তাদের গ্রিন কার্ড, ব্লু কার্ড না রেড কার্ড করার রঙিন খোয়াবে তারা বিভোর। আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা যে-জীবনযাপন করে তা কি কোনো দিক থেকে ইসলামি? পিরসাহেবের হুজরায় গিয়ে আল্লার করুণা পাবার জন্য কেঁদে জারজার হয়ে হুজুর পাকের তবাররক নিয়ে সেই বিরিয়ানি খায় হুইস্কি সহযোগে এবং নগদ টাকার সঙ্গে সেই পবিত্র হুইস্কি নিবেদন করে আমলাদের সেবায় টেন্ডার পাবার উদ্দেশে—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত কোন আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত?

শহরে উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত প্রযুক্তির সুযোগ যা পাচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর তুলনায় তা অনেক ক্ষেত্রেই কম নয়। প্রযুক্তি আসছে, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার বালাই নেই। জীবনে বিজ্ঞান পড়েনি এমনসব বিদ্যাদিগ্‌গজরা টেলিভিশনে ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে বিদ্রূপ ঠাট্টা করার স্পর্ধা দেখায়। এমনকী বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাওয়া পণ্ডিতেরা সরকারি মাধ্যমগুলোতে প্রচার করে যে, বিজ্ঞানীদের যাবতীয় কথা পবিত্র ধর্মগ্রন্থেই নিহিত রয়েছে, বিজ্ঞানীদের কর্ম সব ঐসব বই থেকে চুরি করে সম্পন্ন করা হয়। পাকিস্তানের নরখাদক সেনাবাহিনীর গোলামরা গাড়ি হাঁকিয়ে দেশের এ-রাত ও-রাত ঘোরে, ফ্রিজের কোকাকোলায় চুমুক দিতে দিতে মাইকে ঘেউঘেউ করে, সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল শয়তানের কারসাজি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে। টেলিভিশন আর ভিসিআরের কল্যাণে এখন ঘরে-ঘরে আমেরিকা। কিন্তু কাজের প্রতি ওদের মনোযোগ ও দায়িত্ববোধ কি আমাদের ভদ্রলোকদের কিছুমাত্র প্রভাবিত করেছে? রাস্তায় কেউ কি ট্রাফিক আইন মানে? বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ বাড়ে? স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে উৎসাহী হয়? যা এসেছে তা হল আগ্নেয় অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের কৌশল রপ্ত করা। বিজ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফল ভয়াবহ, এর ফল হল নিদারুণ সাংস্কৃতিক শূন্যতা এবং অপসংস্কৃতির প্রসার। কোন সাংস্কৃতিক পরিবেশে তরুণদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, এই দেশ বসবাসের অযোগ্য? কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাষ্ট্রদখলের যুদ্ধে যারা নামে তারা কি এইসব তরুণের হতাশা মোচন করার কোনো কর্মসূচি নেয়? গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা যায়, কিন্তু টাকার অভাবে বিপুলসংখ্যক সরকারি পদ বছরের পর বছর শূন্য পড়ে থাকে। রাষ্ট্রেরই-বা ক্ষমতা কতটা? রাষ্ট্রেরও বাপ আছে, রাষ্ট্র কি ইচ্ছা করলেই মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারে? তার বাপ কি তাকে সুবিধামতো কলকারখানা তৈরি করতে দেবে? সারের ওপর ভরতুকি কি সে ইচ্ছা করলেই অব্যাহত রাখতে পারে? কর্মীদের বেতন নির্ধারণ করতে পারে? রাষ্ট্রের কোমরে বাঁধা দড়ির প্রান্তটি যে-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে তাকে লক্ষ্য করাও তো ছোটগল্প-লেখকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। বাঙালি বনাম বাংলাদেশি যুদ্ধে প্রাণ দেয় ইউনিভার্সিটির ছেলে, ইউনিভার্সিটিতে তালা ঝোলে আর গ্রামে পাটের দাম না-পেয়ে পাটে আগুন জ্বালিয়ে দেয় বৃদ্ধ চাষি। সেই রিক্ত চাষির গালে কার হাতের থাপ্পড়ের দাগ? কার হাত? মায়ের গয়না বেচে যে-তরুণ পাড়ি দিয়েছে জার্মানি কী আমেরিকায় সে তো আর ফেরে না। তার মায়ের নিঃসঙ্গতাকে কি শুধু মায়ের ভালোবাসা বলে গৌরব দেওয়ার জন্য গদগদচিত্তে লেখক ছোটগল্প লিখবে? কর্মসংস্থান করতে না-পেরে যে-যুবক দিনদিন অস্থির হয়ে উঠছে, নিজের গ্লানিবোধকে চাপা দিতে হয়ে উঠছে বেপরোয়া, অসহিষ্ণু এবং বেয়াদব, তার ছিনতাইকারী হয়ে ওঠা, কিছুদিনের মধ্যে এই পেশায় তার সহকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, একটির পর একটি গোষ্ঠী পালটানো এবং এ থেকে সবাইকে অবিশ্বাস করার প্রবণতার ভয়াবহ শিকারে পরিণত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে অনুভূতিহীন, স্পৃহাবঞ্চিত নিম্নস্তরের প্রাণী হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা—এই লোকটিকে পরিচিত করানো তো বটেই, এমনকী শুধু উপস্থাপন করতেও কত বিচিত্র বিষয়কেই-না মনে রাখতে হয়। বলা যায় যে, এসবের উৎস হল অভাব, অভাব তো আমাদের পুরনো সঙ্গী। কিন্তু তা কি আগে কখনোই এরকম ব্যাপক, গভীর এবং সর্বোপরি জটিল প্রক্রিয়ার ভেতর আবর্তিত

হয়েছে? আমাদের অভাব এখন পুঁজিবাদী ব্যক্তির সম্পদ। আমাদের অভাবমোচনের মহান দায়িত্বপালনের এরকম সুযোগ আগে কোনোদিন তারা পায়নি। এই উদ্দেশ্যে তারা অবাধে এখন যেখানে-সেখানে ঢোকে, তারাই আমাদের প্রভু, তাদের নিপুণ কার্যক্রমে তাদের প্রভুত্ব মেনে নিতে সব দ্বিধাদ্বন্দ্বই আমরা ঝেড়ে ফেলছি। তাদের দরাজ হাতে আমাদের দায়ভার তুলে দেওয়ার জন্য আমরা উদগ্রীব। ফলে অভাবমোচনের জন্য মানুষের সমবেত স্পৃহাকে বিনাশ করার আয়োজনে তারা অনেকটাই সফল। অভাব হয়ে ওঠে মানুষের কাছে নিয়তি। সমাধানের স্পৃহা না-থাকলে সমস্যাকে সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায় না। নিরাময় করতে চাই বলেই রোগকে রোগ বলি, নইলে সর্দি থেকে শুরু করে ক্যান্সার এইডস পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাধিকে দাড়িগোঁফ গজানো আর চুল পাকা আর দাঁত পড়ার মতো শারীরিক নিয়ম বলে মেনে নিতাম। সমস্যা-উত্তরণের সংকল্পের জায়গায় এখন সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই প্রধান। এর ওপর চলছে সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা, যা কিনা অভাব থেকে মুক্তির স্পৃহাকে দমন করা এবং মানুষ হয়ে বাঁচবার সংকল্পকে মুচড়ে দেওয়ার চক্রান্তের একটি অংশ। মানুষের শাসিত স্পৃহা ও দমিত সংকল্পকে আবর্জনার ভেতর থেকে খুঁজে বার করে আনার দায়িত্বও বর্তায় কথাসাহিত্যিকের ঘাড়ে।

সমাজের প্রবল ভাঙচুর, সমাজব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ প্রভৃতির ফলে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটগল্পের শরীরেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। উপন্যাসে এই পরিবর্তনটি আসছে লেখকের প্রয়োজনেই। কাহিনী ফাঁদা আর চরিত্র উপস্থাপন এখন উপন্যাসের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই গল্পের সমস্ত দায়িত্ব পালন করা হয় বলে এখন আর কেউ মনে করে না। গল্প ভেঙে উপন্যাসের মধ্যেই আরেকটি গল্প তৈরি হচ্ছে, আবার একই গল্প লেখকের কয়েকটি ছোটগল্পে আসছে নানা মাত্রায়, নানা ভঙ্গিতে। একই চরিত্র একই নামে বা ভিন্ন নামে লেখকের কয়েকটি ছোটগল্পে আসতে পারে, তাতেও না-কুলালে এ-চরিত্র আসন করে নিচ্ছে লেখকের উপন্যাসে। 'ছোট প্রাণ, ছোট কথা' বলে এখন কিছু আছে কি? 'ছোট দুঃখ' কোনটি? প্রতিটি ছোট দুঃখের ভেতর চোখ দিলে দেখা যায় তার মস্ত প্রেক্ষাপট, তার জটিল চেহারা এবং তার কুটিল উৎস। ছোটগল্পের হৃৎপিণ্ডে যে-প্রবল ধাক্কা আসছে তা থেকে তার শরীর কি রেহাই পাবে?

ব্যক্তির একটি আপাত-সামান্য ও আপাত-ছোট সংকটকে পাঠকের সামনে পেশ করতে হাজির করতে হচ্ছে আপাত-অপ্রাসঙ্গিক একটি সাহায্যসংস্থার রিপোর্টের অংশ। খবরের কাগজের ভাষা এমনকী একটি কাটিং নিহত সন্তানের মায়ের উদ্বিগ্ন শোকের প্রেক্ষাপট বোঝাতে সাহায্য করতে পারে। গার্মেন্টসে নিয়োজিত তরুণীর গ্লানিবোধ নিয়ে আসার লক্ষ্যে লেখক বিজ্ঞাপনের একটি লাইন তুলে দিতে পারেন। খরায় ধুঁকতে থাকা চাষের জমিকে প্রধান চরিত্র করে প্রকাশিত হতে পারে শুধু সেখানকার সমাজ নয়, শহরের একটি বেয়াদব মাস্তানের অসহায় অবস্থা। সরকারি প্রজ্ঞাপনের আকারে উপস্থাপন করা যায় মুষ্টিমেয় বিত্তবানের সম্পদ কুক্ষিগত করার লালসাকে। কোথাও খুব পরিচিত কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এমন বেঁকেচুরে এসে পড়ে যে মূল কবিতাকে আর চেনা যায় না, এই বিকৃত কবিতার লাইন হাতকাটা কোনো শ্রমিকের পায়ে ঝিঁঝি ধরাকে যথাযথ প্রেক্ষিতে তুলে ধরার

জন্য হয়তো বিশেষভাবে দরকারি। একটা শ্যালো মেশিনের কলকবজার মিস্ত্রিসুলভ বর্ণনায় উন্মোচিত হয় একটা গোটা এলাকার মানুষের হতাশ হৃদয়। একজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ কী বুদ্ধিজীবীর কোনো পরিচিত কর্মকাণ্ডের বিশ্বস্ত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবের গভীর ভেতরকার কোনো বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লেখক তাঁকে করতে পারেন ফ্যান্টাসির চরিত্র, এতেও একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে নামহীন গোত্রহীন হাজার মানুষের বিশেষ কোনো সংকট।

ছোটগল্পে এই পরিবর্তন যে ঘটছে না তা নয় ; কিন্তু তা তেমন চোখে পড়ে না। তার প্রধান কারণ এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভূমিকা এই ব্যাপারে গৌণ। তাঁদের মধ্যে সৎ ও ক্ষমতাবানরা কিছুদিন আগে সামাজিক ধসের ভেতর থেকে হাড্ডিমাংস জোড়া দিয়ে মানুষকে উপস্থিত করেছিলেন পাঠকের সামনে, সাম্প্রতিক সময়কে উন্মোচন করার স্বার্থেই যে এই মাধ্যমটিকে গড়েপিটে নেওয়া দরকার তা নিশ্চয়ই হাড়ে–হাড়ে বোঝেন তাঁরা। তা হলে তাঁরা গল্প লেখেন না কেন? খ্যাতি লেখককে প্রেরণা হয়ত খানিকটা দেয়, তবে খ্যাতি তাঁকে আরও বেশি সতর্ক করে রাখে খ্যাতি নিরাপদ রাখার কাজে। নিজের ব্যবহৃত, পরিচিত ও পরীক্ষিত রীতিটি তাঁর বড় পোষমানা, এর বাইরে যেতে তাঁর বাধোবাধো ঠেকে। কিংবা নিজের রেওয়াজ ভাঙতে তাঁর মায়া হয়। তাই ছোটগল্পের জন্য ভরসা করতে হয় লিটল ম্যাগাজিনের ওপর। প্রচলিত রীতির বাইরে লেখেন বলেই লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের দরকার হয় নিজেদের পত্রিকা বার করার। বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলায় ছোটগল্পের ছিমছাম তনুখানি অনুপস্থিত, সাম্প্রতিক মানুষকে তুলে ধরার তাগিদে নিটোল গল্পো ঝেড়ে তাঁরা তৈরি করছেন নানা সংকটের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত ছোটগল্পের খরখরে নতুন শরীর। এইসব লেখকদের অনেকেই অল্পদিনে ঝরে পড়বেন, সমালোচকদের প্রশংসা পাবার লোভ অনেকেই সামলাতে না–পেরে চলতে শুরু করবেন ছোটগল্পের সনাতন পথে। হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজনও যদি মানুষের এখনকার প্রবল ধাক্কা খাওয়াকে উপযুক্ত শরীরে উপস্থাপনের দায়িত্বপালন অব্যাহত রাখেন তো তাতেও ছোটগল্পের মুমূর্ষু শরীরে প্রাণসঞ্চার সম্ভব। এঁরা তো বটেই, এমনকী যাঁরা ঝরে পড়বেন বা সমালোচকদের পিঠ–চাপড়ানোর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, তাঁদের অল্পদিনের তৎপরতাও ভবিষ্যতের লেখকদের যেমন অনুপ্রাণিত করবে, তেমনি বিরল সততাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় অগ্রজ লেখকও এঁদের কাজ দেখে পা ঝেড়ে উঠতে পারেন।

রবীন্দ্রসংগীতের শক্তি

তথাকথিত পাকিস্তানি সংস্কৃতির অজুহাতে তৎকালীন পূর্ব–পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা কখনো স্তিমিত হয়নি। বরং সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলো রাজনীতি প্রচার ও সংস্কৃতিচর্চায় কোনোরকম ভূমিকা পালন করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নইলে ভাষা আন্দোলন, '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১–এর স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্ভব হল কী করে? সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় সরকারি রক্তচক্ষু বিঘ্নের সৃষ্টি তো করতে পারেইনি বরং শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের রুখে দাঁড়াবার জন্য প্ররোচিত করেছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ব্যান্ড মিউজিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা বেড়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করা কিংবা ছোট করার অপচেষ্টা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত মানুষের সমর্থন পায়নি, এখনও পায় না।

এটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ কোনো অনুরাগ বা ভক্তির নিদর্শন নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রধান আবেদন ব্যক্তির কাছে। এই আধুনিক ব্যক্তি যে–সমাজে গড়ে ওঠে, আমাদের দেশে সেই সমাজ এখন নির্মীয়মান। নানা কারণে এ–সমাজে ব্যক্তির বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হচ্ছে না। এই সমাজগঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র। কিন্তু বিদেশি সাহায্যসংস্থাসমূহের রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের পরোক্ষ উসকানিতে ধর্মান্ধ অপশক্তির উৎপাত প্রভৃতির কারণে রাষ্ট্র যেমন শক্ত হতে পারে না, ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশেও তেমনি পদেপদে বিঘ্ন ঘটে।

রবীন্দ্রচর্চায় মাঝে মাঝে যে বিঘ্নের সৃষ্টি করা হয় তার কারণ কিন্তু তথাকথিত পাকিস্তানি সংস্কৃতি নয়। বরং সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট ধর্মান্ধদের উৎপাত। এই উৎপাত কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন এইসব ইতর লোকদের বিরুদ্ধে একটু সংঘবদ্ধ হলেই এরা গর্তে ঢুকে পড়ে।

সিংহভাগ শিক্ষিত মানুষের রাজনৈতিক মতামত যা–ই হোক–না কেন, একটি আধুনিক সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য তারা উদ্গ্রীব। সুতরাং পঙ্গু হোক, রুগ্‌ণ হোক, ব্যক্তির বিকাশ এখানে কোনো–না–কোনোভাবে ঘটেই চলেছে।

এই ব্যক্তির একান্ত অনুভব সবচেয়ে বেশি সাড়া পায় রবীন্দ্রসংগীতে। তাই এই পঙ্গু বা রুগ্‌ণ ব্যক্তিটিকে বারবার যেতে হয় তাঁর গানের কাছেই।

রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে-ব্যক্তিকে তিনি শক্তসমর্থ মানুষ। আমাদের পঙ্গু ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতে নিজেকে শনাক্ত করতে চায় শক্ত মানুষ হিসেবে। হয়তো এই দেখাটা ভুল কিন্তু এই ভুল দেখতে দেখতেই সে একদিন শক্ত একটি ব্যক্তিতে বিকশিত হতেও তো পারে। তখনই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ববান মানুষ দায়িত্বশীল, সে কেবল নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকতে পারে না। তাই তার চারদিকের মানুষের প্রতি সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ওঠে। *রাশিয়ার চিঠিতে* সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে কোনো ভ্রান্তি ছিল না। অসাধারণ শক্তিমান মানুষ যে-কোনো জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও মঙ্গল দেখে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য।

বাংলাদেশেও ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান যথাযথ মর্যাদা পাচ্ছে। এবং শক্তসমর্থ ব্যক্তিগঠনে এই গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রবীন্দ্রনাথের গান মানুষকে বিপ্লবের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে না। কিন্তু শক্তসমর্থ ব্যক্তিগঠনে রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষমতা অসাধারণ। শক্ত মানুষের সমবেত শক্তি মানববিরোধী অচলায়তন ভাঙার অন্যতম প্রেরণা তো বটেই।

বুলবুল চৌধুরী

গ্রিস দেশের একজন লোকের কথা শুনেছি হাজার বছরের আয়ু পেলেও সম্পূর্ণ বাঁচা যার সম্পন্ন হয় না। না, লোকটি গ্রিক পুরাণের কোনো দেবতা বা অনিন্দ্যকান্তি কোনো পুরুষ নয় ; ভূমধ্যসাগর বা ঈজিয়ান উপসাগরের দ্বীপ–উপদ্বীপের কোনো কাব্যে তার নাম পাওয়া যায় না। সে একেবারেই একালের মানুষ, তার জন্ম ও বৃদ্ধি একটি উপন্যাসের মধ্যে। নাম জোরবা, 'জোরবা দি গ্রিক' বললে অনেকেই চিনবে। আধুনিক গ্রিক কথাশিল্পী নিকোস কাজানজাকিসের শক্তসমর্থ আঙুলের পেষায় লোকটি এমন সাংঘাতিক মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছে যে, মনে হয় তার পূর্বপুরুষ প্রমিথিউস কী একিলিসের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী হেসেখেলে কাটিয়ে দিলেও তার শরীরে এতটুকু চিড় ধরবে না।

খুব বিচিত্রভাবে ও তীব্রভাবে জীবনযাপন করা ছিল তার স্বভাব। নানারকম পেশায় নিয়োজিত ছিল : কখনো খনিতে কাজ করেছে, কখনো মালপত্র ফেরি করে বেড়িয়েছে ; আবার কামারের কাজ করতে করতে হাঁপরের টানে নিজেই জ্বলে উঠেছে আগুনের শিখা হয়ে ; সমুদ্রের নাবিক হয়ে ঢেউয়ের ফণায় চড়ে সমুদ্রকে গেঁথে নিয়েছে বুকের সঙ্গে ; জোরবা কখনো প্রেমিক ছিল, কখনো ছিল বিপ্লবী। প্রতিটি পরতকে সে উপভোগ করেছে, প্রতিটি মুহূর্তকে অনুভব করেছে তীব্রভাবে। উপভোগ ও অনুভব করার ক্ষমতা তার স্বভাবের অন্তর্গত। তার স্বভাবে আর কী ছিল? তার সমস্ত অনুভূতিকে জোরবা তুলে ধরতে চাইত মানুষের কাছে। কথা বলায় তার ক্লান্তি নেই, আবার বলার জন্য কথারও তার শেষ নেই। কিন্তু কথা দিয়ে তার অনুভূতির কতটা বোঝাবে? তার বিশাল আনন্দ, তার গভীর বেদনা ও উপলব্ধি বোঝাবার জন্য ভাষা যখন কুলাত না জোরবা তখন কী করত? জোরবার পা জোড়ায় তখন ডানা গজাত, কেবল জিভ ও কণ্ঠের ওপর ভরসা না–করে সমস্ত দেহপট সে তুলে ধরত বন্ধুর সামনে। জোরবা তখন নাচত। বাক্যকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জোরবা তখন হাত পাতত নিজের শরীরের কাছে। নাচ তার কাছে কেবল প্রকাশের একটি মাধ্যমমাত্র নয়, তীব্র ও গভীর মুহূর্তগুলো অসহনীয় হয়ে উঠলে নিজের ভেতরকার প্রবল কম্পন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নাচই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। তিন বছর বয়সের ছেলে মারা গেলে স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল জোরবা। মাথার ভেতর শোক যখন কেবলি ভারী থেকে আরও ভারী

হয়ে নামল, পুত্রের মৃতদেহের সামনে সে তখন নাচতে শুরু করল। নাচতে না-পারলে তার মগজ তখন ফেটে চৌচির হয়ে যেত, পাগল হওয়া ছাড়া তার তখন আর গত্যন্তর ছিল না। আমাদের যেমন হাসি কী কান্না, কারও কারও যেমন সঙ্গীত কী কবিতা, কারও কারও যেমন ছবি কী অভিনয়, জোরবার তেমনি ছিল নাচ।

এই জোরবা একজন মহৎ শিল্পীর বিরল সৃষ্টি। বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে বুলবুল চৌধুরী নিজেই নিজের সৃষ্টি, তিনি নিজেই শিল্পী, শিল্পও তিনি। তিনিই জোরবা, কাজানজাকিসও তিনি নিজে। মানুষের অস্তিত্বের মূল সত্যটির অনুসন্ধান ও তার প্রকাশ— এই দুটোই ছিল তাঁর জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অস্তিত্বের সারাৎসারের জন্য অনুসন্ধান তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী, একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। প্রকাশের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মাধ্যম ভাষাকেও তিনি ব্যবহার করেছেন, একটি উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প লেখা ছাড়াও নাটক লেখার উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন। নাট্যমঞ্চে অনেকবার এসেছেন, একটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। কিন্তু জোরবার মতো তাঁকে সবসময় ও শেষ পর্যন্ত ধরনা দিতে হয়েছে নৃত্যের পরম মাধ্যমটির কাছে। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম, এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে গান গাইলেও সেখানে পাপ। আর নাচ? শরীরকে যেভাবে পারো অস্বীকার করো—মুসলমান ভদ্দরলোকদের প্রধান ব্যায়াম তখন এই। সেই সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে রশীদ আহমদ চৌধুরী নিজের সত্য-অনুসন্ধান ও উপলব্ধি-জ্ঞাপনের জন্য বেছে নেন শরীরের বেহায়া প্রদর্শনী। এতে তাঁর অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়—এতে সকলেই নিশ্চয়ই একমত। কিন্তু এই সাহসের কাজটি বুলবুল চৌধুরীর কোনো সচেতন উদ্যোগের পরিণতি নয়। মুসলমানসমাজের ধর্মান্ধ গোঁড়ামিকে আঘাত করার জন্য তিনি নৃত্যচর্চা শুরু করেন—এরকম সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর অনুসন্ধান ও অনুভূতি এবং শরীরকে তিনি একটি অখণ্ড সত্তায় সংহতি দিয়েছিলেন, কিংবা আরও সোজা করে বলা যায় যে, তাঁর গভীর ভাবনাবোধ থেকেই চেতনা ও শরীর একাত্মতা লাভ করেছিল। আফ্রিকায় কোথাও কোথাও সাপের পূজার প্রচলন রয়েছে—পূজারিরা মনে করে যে যাবতীয় পশুপাখি মাটিকে স্পর্শ করে কেবল পা দিয়ে, আর সর্বাঙ্গে অনুভব করে বলে সাপ নাকি পৃথিবীকে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্যটিকে স্পর্শ করার জন্য বুলবুল চৌধুরী যেমন নিবিড় অনুসন্ধান চালান এবং যেভাবে তাকে অনুবব করেন তার প্রকাশের জন্য ভাষা বা নাট্যমঞ্চ বা পর্দা তাঁর কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। অনুসন্ধান-জ্ঞাপনের জন্য তাঁর দরকার পড়ে গোটা শরীরের, অন্য কোনো মাধ্যম সেখানে অল্প ও অসম্পূর্ণ।

তাই পশ্চাৎপদ ও ধর্মান্ধ সমাজের পটভূমিতে এরকম অমিত সাহসকে বিশেষভাবে প্রশংসা করার দরকার নেই। যিনি নিজের সমস্ত দেহকে ব্যবহার করেন নিজের জিজ্ঞাসাকে জ্ঞাপন করার জন্য তাঁর রক্তে এই সাহস হচ্ছে একটি মৌল উপাদান। এজন্য তাঁর আলাদা কোনো প্রস্তুতির দরকার পড়েনি। আদ্যোপান্ত শিল্পস্বভাব হলেও বুলবুল চৌধুরী স্বভাব-শিল্পী নন। প্রকৃতি ও জীবনে অবিরাম গতি সঞ্চার করে চলেছে যে-তরঙ্গ নৃত্যে তারই সংহত রূপ দেখা যায়। সংহত তরঙ্গের সাহায্যেই নৃত্যশিল্পী মানুষের মধ্যে রসসঞ্চারের চেষ্টা করেন। রসসৃষ্টির মধ্যে নৃত্যকে সীমাবদ্ধ না-রেখে বুলবুল চৌধুরী এর সাহায্যে জীবন সম্পর্কে নিজের জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি-প্রকাশের আয়োজন করেন। আনুষ্ঠানিক নৃত্যশিক্ষার সুযোগ

তিনি পাননি। তাতে শাপে বর হয়েছে এই যে, মুদ্রার কসরত–প্রদর্শনীকে তিনি নৃত্যশিল্পের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেননি। বরং মানুষের আনন্দ–বেদনার অনুসন্ধানকে স্পষ্ট রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেন।

কলকাতায় তাঁর প্রথম নৃত্যপ্রদর্শনী বেকার হোস্টেলের একটি অনুষ্ঠানে। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখন তাঁকে পরিপূর্ণ যুবক বলাও মুশকিল, সেই নৃত্যে একজন ব্যাধের পাখিশিকারের প্রচেষ্টা ও তার সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে বুলবুল চৌধুরী নিজের অজ্ঞাতেই জীবনের একটি অতিপরিচিত সত্যকেই নতুনভাবে তুলে ধরেন। *হাফিজের স্বপ্ন* কী *ইরানের এক পান্থশালা* কী *ব্রজবিলাস* প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বপ্নময়তার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাতকেই জানাবার একেকটি সফল প্রচেষ্টা। এইসব নৃত্যে বিক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত চিত্তকে সর্বাঙ্গে জ্ঞাপন করার জন্য তিনি বড় বেশি উদ্গ্রীব। এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেন ধ্রুপদরীতি, প্রচলিত মুদ্রা ও আঙ্গিকেই তাঁর রোমান্টিক চেতনা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতিটি কাজে উপমহাদেশের ধ্রুপদ নৃত্যকলা কেবল আমেজসৃষ্টির পর্যায়কে অতিক্রম করে যায়, দর্শক সেখানে নিজের গভীর ভেতরটিতে বড় উদ্বেলিত বোধ করে।

কেবল এই রোমান্টিক তৎপরতার মধ্যে নিয়োজিত থাকলেও বুলবুল চৌধুরী বড় শিল্পী বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু অস্তিত্বের গভীরে মহৎ খোঁড়াখুঁড়ি থেকে তিনি দেখতে পান যে মানুষের আনন্দ–বেদনা বা দুঃখ–ক্ষোভের অনেক ভেতরে রয়ে গেছে সমাজব্যবস্থার অবাঞ্ছিত কাঠামো। কাঠামোটি নির্মিত হয়েছে কিছু বদমাইশ ও শয়তান মানুষের কারসাজির ফলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি উপসর্গ এরই উৎপাদন। এই উপলব্ধিকে রূপ দেওয়ার তাগিদে রচিত হয় *মহাবুভুক্ষা* বা *ব্ল্যাক আউট*। এখানেও কিন্তু ভারতীয় ধ্রুপদ নৃত্যের কলা ও আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু ধ্রুপদ নৃত্য রস–সঞ্চারের সাহায্যে মানুষের মধ্যে আমেজ সৃষ্টি করে। বুলবুল চৌধুরী তাকেই তরঙ্গায়িত করলেন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাবার জন্য। তাঁর শিল্পকর্ম তাই কেবল কোমল ও পেলব প্রবৃত্তির অনুরণনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না। বরং, অনেক ভেতরে ঢুকে মানুষকে তিনি হাত ধরে নিয়ে গেছেন এমন একটি খাড়া জায়গায় যেখান থেকে সে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে বিচলিত বোধ করে এবং ভাবনায় উদ্বেলিত হয়। মানুষের নিদারুণ অপমান ও গ্লানি এবং এরই মধ্যে বাঁচবার জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের দিকে চোখ না–মেলে মানুষের তখন আর কোনো উপায় থাকে না।

সুকুমার প্রবৃত্তির কোমল আন্দোলন ও সামাজিক পটভূমিতে মানুষকে দেখার প্রচেষ্টা— উভয়ক্ষেত্রে ভারতীয় নৃত্যের ধ্রুপদরীতিকে তিনি স্পষ্ট আকার দিতে সক্ষম হন। নৈপুণ্য ও কসরতের সাহায্যে আমেজ ধরিয়ে যাঁর বিলুপ্তি ঘটত তাঁর শরীরে এসে তা–ই হয়ে উঠল মহৎ শিল্পীর উপলব্ধি–প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম।

ব্যক্তি ও সমাজের আনন্দ–বেদনা–সংকটের মূল ভিত্তিটির খোঁজে বেরিয়েছিলেন বলে বুলবুল চৌধুরীর পক্ষে কেবল ধ্রুপদরীতির ওপর নির্ভর করে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। সংস্কৃতির নানা স্তরে তাঁকে অভিযানে বেরুতে হয়। পাশ্চাত্য নৃত্যকলার ভিত্তিতে সেখানকার লোকনৃত্যের প্রভাবে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে নিজেদের লোকসংস্কৃতির দিকে। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ নিজের নিজের পেশায় কাজ করার সময় সেখানে সৌন্দর্য ও রসসঞ্চার করে আসছেন। ভদ্রলোকদের সংস্কৃতিচর্চা হল

মনোরঞ্জনের উপায়, আর শ্রমজীবীর সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁর পেশার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁদের গান কী কথা বলবার ভঙ্গি কী কাজের ভেতরকার ছন্দ কোনোটাই পেশার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো উটকো ব্যাপার নয়। লোকসংস্কৃতি তাই যে কেবল শ্রমজীবীদের জীবনযাপনের অংশ তা-ই নয়, তা তাঁদের জীবনধারণেরও একটি উপাদান। পেশার সঙ্গে সংস্কৃতির এই অবিচ্ছিন্নতার কারণেই হাজার বছরের লুণ্ঠন ও শোষণ সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মধ্যে সংস্কৃতিচর্চা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের জীবনযাপনের মান আগেও কোনোদিন ভালো ছিল না, যতই দিন যাচ্ছে ততই তা আরও নিচে নামছে। তাঁদের সংস্কৃতিচর্চাও একই পর্যায়ে রয়ে গেছে, এতে নতুন ধারা সংযোজিত হয় না। কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে লোকসংস্কৃতি নতুন মাত্রা পায়, নতুন ব্যঞ্জনায় তা উদ্ভাসিত হয় এবং এইভাবে সংস্কৃতি উন্নীত হয় শিল্পকর্মে। আমাদের দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহ ছাড়া লোকনৃত্যের তেমন প্রচলন নেই। কিন্তু বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের কাজের মধ্যেই নৃত্যের তরঙ্গ বার করতে বুলবুল চৌধুরীকে বেগ পেতে হয়নি। জেলের জাল ফেলবার ভঙ্গি, চাষির লাঙল-চষা কী মই-দেওয়া, নৌকা-বাইবার সময় মাঝির হাতের ব্যবহার—এ-সবের ভেতরকার ছন্দ একজন শিল্পীর হাতে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। এমনকী ক্ষমতার গুণে শিল্পী এর সাহায্যে তাঁর বক্তব্যও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

অস্বীকার করা যায় না যে লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে দিনদিন বাড়ছে। এঁরা প্রায় সবাই লোকসংস্কৃতির ব্যাপক প্রদর্শনীতে আগ্রহী। ব্যাপক প্রদর্শনীতে লোকসংস্কৃতি খুব পরিচিতি পায়। এটা হল সংরক্ষণের কাজ। কিন্তু কেবল সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দিলে সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে না, তা হয়ে পড়ে প্রাণহীন, নির্জীব স্থিরচিত্রের মতো, তা হয়ে থাকে জাদুঘরের সামগ্রী। লোকসংস্কৃতির অবিকল সংরক্ষণ করার কাজটিকে সৃজনশীল শিল্পী তেমন গুরুত্ব দেন না, অন্তত এই কাজের ভার তিনি গ্রহণ করেন না। একে তিনি ব্যবহার করেন, নতুন মাত্রা দিয়ে একে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলাই তাঁর দায়িত্ব। চট্টগ্রামের চাকমা নাচ কী ময়মনসিংহের গারো নাচ, এমনকী অনেক পরিণত মণিপুরী নৃত্য ঢাকার মহাবোদ্ধা ও বিজ্ঞ দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করার মধ্যে সৃজনশীলতার পরিচয় নেই, এই তৎপরতাকে সংস্কৃতিচর্চার অতিরিক্ত মূল্য দেওয়াটা বাড়াবাড়ি। মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির আবেগময় প্রকাশের জন্য ভারতীয় ও ইরানি পুরাণ ও গাথা ব্যবহার করে বুলবুল চৌধুরী তাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর, লোকসংস্কৃতি তাঁর কাছে লাভ করে নতুন মাত্রা ; তিনি একে গতিশীল করেন এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের চোখে যা ছিল কেবল কয়েকটির অভ্যাস তার সাহায্যেই তিনি সামাজিক কাঠামোর অনাচারগুলো তুলে ধরেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যু হয়, কিন্তু নৃত্যকলায় লোকসংস্কৃতির এরকম ব্যাপ্তি এই উপমহাদেশে আর কেউ দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আমাদের শিল্পসৃষ্টির সমগ্র ক্ষেত্রটি আজ একঘেয়ে ও প্রাণহীন। আমাদের কবিতার একটি মান তৈরি হয়েছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল মোটামুটি পাঠযোগ্য কবিতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ছন্দ, শব্দ, বাক্য, প্রতীক, উপমা, রূপক প্রভৃতি এমনভাবে তৈরি হয়ে আছে যে কলমের একটু ব্যায়াম করতে পারলে একটি কবিতা মোটামুটি দাঁড় করানো চলে। প্রেম, ভালোবাসা, এমনকী প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত প্রস্তুত। কেউ যদি এসবের

মধ্যে নিজেকে ফিট করিয়ে নিতে পারেন তা ভাবনার কিছু নেই, কবিতা আপনা–আপনি বেরিয়ে আসে। ফলে বাংলা কবিতা এখন শিল্পের আনন্দ ও কম্পন, বেদনা ও তার এবং সংশয় ও সংকল্প থেকে বঞ্চিত। নৃত্যকলা, সংগীত, নাটক, উপন্যাস ও চিত্রকলা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। বহুপ্রচলিত গান কী ছড়ার মতো, মিনাবাজারে প্রদর্শিত এমব্রয়ডারির মতো, ড্রয়িংরুমে ঝোলানো পাটের শিকা কী রঙ–করা–কুলার মতো কিংবা সায়েবসুবোর বৌ–ঝিদের চাইনিজ–রান্নার মতো শিল্পচর্চা আজ শৌখিন সংস্কৃতিচর্চায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

বুলবুল চৌধুরী, হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, কেবল বুলবুল চৌধুরীই এই অবস্থা থেকে আমাদের শিল্পচর্চাকে উদ্ধার করতে পারতেন। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের মধ্যে শিল্পচর্চার যথার্থ সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা ছিল কেবল তাঁরই। সেই সময় আমাদের এখানে প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ যে ছিলেন না, তা নয়। দেশের শিল্পসংস্কৃতির যথার্থ ঐতিহ্য ও অবস্থান সম্বন্ধে তাঁদের রচনা ও উক্তি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে মধ্যবিত্তসমাজকে সাহায্য করেছে। আবেগকে সম্বল করে মানুষের জীবনযাপন ও আনন্দ–বেদনাকে রূপ দেওয়ার জন্য অনেকেই তৎপর হয়েছে। কিন্তু সমাজ, মানুষ ও ব্যক্তিকে গভীরভাবে জানবার জন্য সামগ্রিক ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল কেবল বুলবুল চৌধুরীর। কোনো তত্ত্ব প্রয়োগ না–করে, কিংবা তরল ও শিথিল আবেগের দ্বারা তাড়িত না–হয়ে জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি এই দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন। সমাজসংস্কারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে কম, বোধহয় নেই বললেই চলে ; বরং তাঁর শিল্পসৃষ্টির যে–বিবর্তন দেখা যাচ্ছিল তাতে বোঝা যায় যে তাঁর নিরঙ্কুশ আস্থা ছিল কেবল বিপ্লবেই। এর ফলে আঙ্গিক ও বিষয় তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, ধ্রুপদরীতির ব্যবহারের সময় সামন্ত আমেজকে পাত্তা দেননি। নিজের উপলব্ধির যাতে জলাঞ্জলি না–ঘটে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন। শিল্পের সবগুলো মাধ্যম তাঁর চোখে অবিচ্ছিন্ন। তিনি জানেন : সবকিছুর উৎস মানুষের চেতনা। লোকসংস্কৃতির নমুনা গ্রাম থেকে শহরে বহন করে আনার সংগ্রাহকের কাজ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং, শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে যে–ছন্দ, তাদের কাজকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যে–সংস্কৃতি—নিজের জিজ্ঞাসাজ্ঞাপনের জন্য তার প্রয়োগের মধ্যে তাকে শিল্পের মহিমা অর্পণ করেছেন। আবেগ ও বিশ্লেষণ, অনুভূতি ও প্রজ্ঞাকে বুলবুল চৌধুরী নিজের অনিন্দ্যকান্তি দেহে স্রোতস্বিনী করে তুলেছিলেন। তাই বিশ্বাস করি : আমাদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে বরফ গলাবার তাপ তিনিই দিতে পারতেন।

শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি

গল্পটা যখন পড়ি বয়স তখন ১২/১৩ বছর। এরপর সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে গেল, কিন্তু আজও কোনো গ্রামের রাস্তা ধরে যখন হাঁটি তো একটি বালকের কথা খুব মনে পড়ে। বিধবার একমাত্র ছেলে, কারখানায় কাজ খুঁজতে শহরে যাচ্ছে, ভরদুপুরে গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি হয়রান হয়ে পড়ে। পাশে তরমুজের খেত দেখে পিপাসায় তার গলা একেবারে কাঠ হয়ে এসেছে। বেলা পড়ে যায়, আর কেবলি তার মার কথা মনে হয়। মা বুঝি মুরগিগুলোকে আধার দিচ্ছে, আর কেবলি তার খেলার সাথিরা এলে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে—না, তার ছেলে ঘরে নেই, শহরে গেছে চাকরি খুঁজতে। ঐটুকু ছেলে, মায়ের কোল খালি করে দূরে চলে যায় শরীর খাটাতে। না, তাদের তো শরীর নয়, তাদের হল গতর। মুখে দুধের গন্ধ যেতে-না-যেতে গতর না-খাটালে তাদের টিকে থাকাই দায়। এই শেষ কথাগুলো কিন্তু গল্পটিতে এমন ঝাঁঝালো করে বলা হয়নি, কিন্তু মায়ের গভীর দীর্ঘশ্বাস পাঠকের বুকে প্রবল বেগে ঝাপটা মারে।

আরেকটি গল্পে জুনু আপা নামে একটি মেয়ে আছে। দুর্গা যেমন বহুকাল হল দিদির কায়েমি স্বত্ব নিয়ে আসন পেতে বসেছে, এই মেয়েটিও একটু ঝাপসা হলেও আরেকটি জায়গা দখল করে রয়েছে। এই বয়সেও *পথের পাঁচালী* পড়ি আর ভাবি, দিদিটা আর কটা দিন বাঁচলেও তো পারত! দুর্গা সোনার সিঁদুরকৌটা চুরি করেছিল বলে দারুণ খারাপ লাগে। কিন্তু জুনু আপার জন্য কষ্টটা কেবল বেদনা আর শোকে মসৃণ হয়ে থাকে না, এই কষ্ট একটু জটিল। ব্যক্তিত্ব না-হলেও ব্যক্তি তাকে বলতেই হয়। দুর্গা নিজের পাড়ায় কী বাড়িতে প্রভাব ফেলতে না-পেরেও জন্মের পর থেকে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চিত্তে বেদনা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু জুনু আপা কী একটা কাণ্ড করে বাড়ির মুরুব্বিদের বিব্রত করে তোলে, মুরুব্বিদের মনে কী আছে কে জানে, তবে এটুকু বুঝি যে চাইলেও তারা তাকে সেই আসন আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু জুনু আপার জন্য দুঃখ তো আমার এই জীবনে আর কাটবে বলে মনে হয় না। এর সঙ্গে যোগ হয় তার অস্পষ্ট অপরাধের জন্য অস্বস্তিকর গ্লানিবোধ। পরম প্রিয়জনের ভুলের জন্য কী পাপের জন্য এই গ্লানি কিন্তু দুর্গার জন্য বোধ করতে হয়নি। দুর্গা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, গরিব ঘরের দিদি আমার, ছোটখাটো লোভ ছিল, দুষ্টুমি

করত। পরম পবিত্র দুর্গার স্মৃতিতে কাঁটা নেই। কিন্তু জুনু আপার ভুল কোনো দুষ্টুমি নয়, বাড়ির মুরুব্বিদের কাছে তা হল অপরাধ। তার ভুলের কাজটা ভুল কেন, এই ভুল অপরাধ কেন, অপরাধটিকে পাপ বলে গণ্য করব কেন—এসব না-জেনেও তাকে নিষ্পাপ ভাবতে পারি না, আবার তাকে পর করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াও আমার সাধ্যের বাইরে।

বাংলাদেশের বিহারি সম্প্রদায়ের সীমাহীন দুর্দশার কথা মনে হলে আমার চোখে কিন্তু জেনেভা ক্যাম্পের ছবি ভাসে না। বরং, যখনই জেনেভা ক্যাম্পের ওদিকটায় যাই, গোটা এলাকার ওপর ক্রেন ছাড়াই আকাশ থেকে ঝুলতে থাকে একটা মালগাড়ির অন্ধকার ওয়াগন। সেখানে ঘরকন্না করে একটি বিহারি পরিবার। অন্য দেশে তাদের দেশ ছিল, সেখানে বাপদাদার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা এখানে এসেছে। এখানে তাদের ঘর জোটেনি, পায়ের নিচে মাটিও পায় না তারা। মালগাড়ির পরিত্যক্ত ওয়াগনে তাদের বসবাস, দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটে না। এক প্রজন্মে দুবার বাস্তুচ্যুত এই সম্প্রদায় নিয়ে আরও গল্প এখানে লেখা হয়েছে। কিন্তু নিজের মাটি থেকে ওপড়ানো মানুষের শেকরছেঁড়া চেহারা '*পৌষ*' গল্পে যেমন প্রকট, অন্য কোথাও তার ছায়াও দেখেছি বলে মনে হয় না।

একটির পর একটি ছবি, ধারাবাহিক সব ছবি যিনি ৩০/৩৫ বছর ধরে পাঠকের চোখে সেঁটে রাখতে পারেন, পাঠকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো ঝাপসা না-হয়ে দিনদিন বরং টাটকা হতে থাকে, তিনি তো বড় কম লোক নন। আব্বাস, জুনু আপা, পৌষ, ইমারত—এইসব গল্প যখন পড়ি তখন লেখক নিয়ে কৌতূহল ছিল না, গল্পের লোকজন নিয়েই বুঁদ হয়েছিলাম। এর পরপরই স্কুলে থাকতেই *জননী* পড়ি, অতটা সাড়া পাইনি। পরে বুঝেছি, বইটা পড়ার জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার। বাংলারই প্রধান একটি সম্প্রদায়—তাদের সমস্যা ও সংকটের যেটুকু মোকাবেলাও করে তারাই, তা যেমন এসেছে, তেমনি বেদনা ও বিশ্বাসের যা তারা ভোগ করে গোটা দেশবাসীর সঙ্গে তাকেও ঠিক স্পর্শ করা যায় এই বইতে। দ্বিতীয়বার *জননী* পড়ে লেখক সম্বন্ধেও জানবার আগ্রহ হল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখাও হল ঐ সময়েই।

১৯৫৯ সাল, আই. এ. পড়ি, আমাদের কলেজে বদলি হয়ে এলেন শওকত ওসমান। বইয়ের লোকেরা যাকে বলে রোমাঞ্চ, তিনি আমাদের পড়াবেন শুনে আমরা রীতিমতো তা-ই বোধ করতে লাগলাম। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত সব বই পড়ে ফেলেছি। *সমকাল* তখন এখানকার সবচেয়ে উঁচুমানের সাহিত্য পত্রিকা বলে বিবেচিত, শওকত ওসমান সেখানে নিয়মিত লেখেন বলে পত্রিকাটির মান আরও বেড়েছে। *সমকালে* তাঁর সবচেয়ে সাম্প্রতিক লেখাটিও খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলাম যাতে স্যারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই সব গড়গড় করে শোনাতে পারি।

কিন্তু তিনি আমাদের ক্লাসে *জোহরা* উপন্যাস পড়াবেন জেনে মনটা দমে গেল। *মোসলেম ভারত* পত্রিকা প্রকাশ করে মোজাম্মেল হক যে-সামাজিক ও সাহিত্যিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন সেজন্য আজও তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মী হিসেবে সবার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু উপন্যাস তিনি না-লিখলেই পারতেন। জোহরার ভাষা বেশ দুর্বল, শিথিল, কাহিনী কোনো আকর্ষণ তৈরি করতে পারে না। পাত্রপাত্রী বেশির ভাগই মুসলমান, কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজচিত্রও এই বইতে পাওয়া যায় না। এই বইটি যে কেন পাঠ্য করা হয়েছিল তা বোঝা খুব মুশকিল। আমাদের পরের বছর থেকেই

ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে *জোহরার* বদলে অন্য উপন্যাস পাঠ্য করা হয়েছিল। আবার এই এতকাল পর জানতে পারলাম এবার থেকে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য *ঐ জোহরা* ফের পাঠ্য করা হয়েছে। স্কুলে বইটি পড়তে যারা বাধ্য সেই ছেলেমেয়েদের জন্য খুব খারাপ লাগছে : উপন্যাসের খুব দুর্বল একটি দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রাখা হচ্ছে। এই বই যাঁরা পাঠ্য করেন তাঁদের সাহিত্যবোধ তো একেবারেই নেই, মনে হয় বিদ্যাচর্চার সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। কয়েকজন আকাটমূর্খের হাতে দেশের পাঠ্যসূচি-প্রণয়নের ভার দেওয়া হলে শিক্ষার মান কোথায় পড়াবে ভাবতে ভয় হয়। তা শওকত ওসমান আমাদের প্রথম যে-উপকার করলেন তা হল এই যে, ক্লাসে তিনি বইটি একবার ছুঁয়েও দেখলেন না। এর বদলে তিনি শুরু করলেন উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। একটি সমাজ কোন অবস্থায় এলে সেখানে উপন্যাস-রচনা হতে পারে, মহাকাব্যের যুগে উপন্যাস লেখা হয়নি কেন, ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে উপন্যাস-রচনার সম্পর্ক কী—এই নিয়ে দিনের পর দিন, ক্লাসের পর ক্লাস বলতে লাগলেন। ইউরোপের রেনেসাঁস তাঁর বড় প্রিয় প্রসঙ্গ, উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রেনেসাঁস সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন। যে-কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দিতেন। উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারমূলক আন্দোলন ও বিদ্যাচর্চার আগ্রহকে তিনি তুলনা করতেন ইউরোপের রেনেশাঁসের সঙ্গে। সামন্তসমাজের অবসান, রেনেসাঁস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উপন্যাসের উদ্ভব, বুর্জোয়াসমাজের বিকাশ, পুঁজির দাপট, সমাজতান্ত্রিক-সমাজের অপরিহার্যতা—এসব বিষয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি করেন তিনিই। তাঁর মতামতে আমার নিরঙ্কুশ আস্থা যে সব ব্যাপারে এখন অবিচল রয়েছে তা নয়। তাঁর কোনো কোনো মন্তব্য এখন মানি না। আবার শওকত ওসমানের মতামতও কোনো কোনো বিষয়ে এক জায়গায় থেমে নেই, অনেক বদলেছে। এই বদলানোকে সবসময় বিবর্তন বলে মেনে নেওয়া মুশকিল। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে ধিক্কার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করাকে সঙ্গতিপূর্ণ বলে স্বীকার করি কীভাবে? এককালে শ্রেণীসংগ্রামে তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। সেখানে মধ্যবিত্তসুলভ জাতীয়তাবাদ পাকাপোক্ত আসন পেতে বসলে তাকে ব্যাখ্যা করি কীভাবে? যাঁর 'থুথু' গল্পে শোষণের প্রতি নিপীড়িত মানুষের ঘৃণা পরিণত হয় প্রতিরোধের সংকল্পে, তাঁরই ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অস্বীকার করাকে স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন বলে কি মেনে নেওয়া যায়?

তিনিই একদিন ক্লাসে এবং সাহিত্যকর্মে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন খুব বিশ্বাসের সঙ্গে। আবার নিজের মত ও রুচি তৈরি করা যে সাহিত্যপাঠের জন্য জরুরি কাজ এ-কথাটিও শওকত ওসমান জোর দিয়ে বলতেন। যা-ই বলো না-কেন, তা যেন তোমার ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, নতুন একটা কথা পড়েই কেবল নতুন বলেই কিংবা অভিনব বলেই সেটাকে গ্রহণ করলে উটকো ঠেকবে, স্বভাবের সঙ্গে মিশবে না। তবে তিনি যা-ই বলুন-না কেন, জোর করে ছাত্রদের ওপর কোনোকিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তাঁর একেবারেই ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে যাকে বলে অবাধ মেলামেশা তা তিনি করতেন না, ঠিক হিট টিচার তিনি কোনোদিনই নন। অন্তত আমরা কলেজে তাঁকে একটু ভয়ই পেতাম। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে তিনি পাবলিক লাইব্রেরিতে খুব যেতেন, এখন সেটা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির একটি অংশ। ঐ সময়

আমরাও ওখানে নিয়মিত গিয়েছি, তবে স্যার যেতেন পড়তে। বিদ্যাচর্চা আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল শরিফ মিয়ার চায়ের দোকানের আড্ডা। তা মাঝে মাঝে পড়ার হলেও ঢুকেছি বইকী। এমনও হয়েছে, পড়ার টেবিলে বসে আমরা কয়েকজন গল্প করে চলেছি, কথাকে আর ফিসফিসানির পর্যায়ে রাখা যায়নি, হঠাৎ একই টেবিলের ওপার থেকে ধমক শুনলাম, 'কথা বোলো না'। শওকত ওসমান সাহেব বিরক্ত হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এরপর ভয়ে না-পারি কথা বলতে, না-পারি পড়তে। শরিফ মিয়ার দোকানেও দেখা হয়ে যেত, অনেক গল্প করতেন, তবু ছাত্রদের সঙ্গে একটু দূরত্ব তাঁর বরাবরই ছিল। মনে পড়ে, কোনো কোনো দিন রমনা রেসকোর্সের পাশে তখনকার অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তা ধরে তিনি একা একা হেঁটে গেছেন মৈমনসিংহ গেটের দিকে, কিংবা ডানদিকে ঘুরে চলে গেছেন নীলখেতের রাস্তায়। চুপচাপ তাঁকে অনুসরণ করেছি, পাশাপাশি হাঁটতে সাহস হয়নি। কলেজে ও ক্লাসের বাইরে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে কম। কিন্তু ক্লাসে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন শক্তি ছিল যে তা-ই দিয়ে ছাত্রদের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলতে পারতেন। শওকত ওসমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে তখন আমি আর কলেজের ছাত্র নই। কিন্তু পুরনো ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় কখনোই এতটুকু চিড় ধরে না, তাদের প্রশ্রয়ও তিনি দেন, নিজের লেখা সম্বন্ধে তাদের মতামত চান। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের অনেকেই এখন লেখালিখির কাজে নিয়োজিত, তাদের কারও কোনো লেখা যদি তাঁর এতটুকু ভালো লাগে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে তা জানিয়ে দেন। কারও লেখার অকপট প্রশংসা করতে তাঁর জুড়ি নেই। যে-কেউ ভালো লিখলে তিনি যে কী খুশি হন তাঁকে ঐ সময়ে না-দেখলে তা বিশ্বাস করা মুশকিল। ছাত্রের কৃতিত্বে তিনি সবসময়েই আনন্দিত, তাঁর ছাত্রদের কেউ যদি কোনোদিন তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে তো, আমি নিশ্চিত, তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন। কৃতী ছাত্রদের নিয়ে এরকম গর্ববোধ করতে, এরকম উচ্ছ্বসিত হতে পারেন কজন শিক্ষক?

শওকত ওসমানকে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে একটু ভয়ই হয়। পুরনো দিনের কথা বলতে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। লক্ষ করেছি, তাঁর প্রথম দিকের গল্প কিংবা উপন্যাস *জননী* নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি প্রসঙ্গ পালটাতে চান, এসব লেখায় কি তাঁর উৎসাহ নেই? অথচ ঐসব তো আমার প্রিয় লেখা। তিনি শুনতে চান তাঁর সাম্প্রতিক লেখা সম্বন্ধে মতামত। এমনকী খবরের কাগজে তাঁর কোনো চিঠি বেরলেও সে-সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া জানতে চান। তবে হ্যাঁ, তাঁর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি তো থেমে নেই যে কেবল আগের শিল্পকর্ম নিয়েই বেঁচে থাকবেন। কাজ তিনি করে যাচ্ছেন অবিরাম। অবসর নেওয়া তাঁর ধাতে নেই, বিশ্রাম নেওয়ার অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকী কলেজের চাকরি থেকে অবসর নিলেও শিক্ষকতার কাজ থেকে কিন্তু তিনি অব্যাহতি নেননি। তাঁর সঙ্গে অল্প একটু সময়ের জন্যও দেখা হওয়া মানেই কিছু-না-কিছু শিক্ষা অর্জন করা। অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতের মিল না-ও হতে পারে, কিন্তু যে-কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তিনি তাঁর মত-প্রকাশ করবেনই। আমার কোনো লেখা কী মন্তব্য যদি তিনি অনুমোদন করতে না-পারেন তো স্পষ্ট ভাষায় সেটাও জানিয়ে দেবেন।

তিনি ঘোরতরভাবে সমকালসচেতন। সমসাময়িক কালের মানুষ, রাজনীতি, নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, আন্দোলন, সংগ্রাম, সংঘাত, যুদ্ধ, আপোস প্রভৃতি নিয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তাঁকে ক্রমে স্পর্শকাতর করে তুলছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। বয়স তাঁকে ভোঁতা করে না, বরং বয়সের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি আরও ধারালো, আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

এই অবিরাম তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শওকত ওসমানের রচনায় অস্থির ছায়া ফেলে। তাঁর বাক্য হয়ে আসছে ছোট ও তীক্ষ্ণ। ব্যঙ্গ করে ও শ্লেষ মিশিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাঁর এখন অনেক বেশি। যখন-তখন তিনি বিদেশি শব্দ প্রয়োগ করেন—এ কেবল ভাষাকে গয়না পরাবার শখ মেটানো নয়, তীব্র প্রতিক্রিয়াকে শাণিত করে বলাই এ-ধরনের শব্দ-ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য।

শওকত ওসমানের লেখা তাই ক্রমে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এখানে ক্ষোভ ও বিরক্তিই প্রধান। অস্থিরতার কারণে এই ক্ষোভকে তিনি ঘৃণায় এবং বিরক্তিকে ক্রোধে পরিণত হওয়ার সুযোগ দেন না। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেয়ে নিজের অসন্তোষ ও বিরক্তি ঘোষণা করার স্পৃহা তাঁর অনেক বেশি তীব্র। তাঁর ব্যঙ্গ প্রায়ই ছাপিয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্যকে, গল্পের চরিত্রের স্বভাব ও আকার উপচে ওঠে তাঁর প্রতিক্রিয়া। প্রথম দিকের রচনায় তাঁর ঝাঁঝ কম, কথা বলার স্বর একটু নিচু, কিন্তু তাতে পাঠককে স্পর্শ করতে, এমনকী ধাক্কা দিতেও কোনো অসুবিধা হয়নি। হয়তো জোরে কথা বলা তাঁর শিল্পীস্বভাবের বাইরে, তাই এখনকার উচ্চকণ্ঠ অনেক সময় তাঁর গলা চিরে ফেলে, কথা বুঝতে তাই একটু বেগ পেতে হয়।

কিন্তু এ নিয়ে পরোয়া করার মতো লেখক তিনি নন। নিজের প্রতিক্রিয়াকে ঘোষণা করাটা এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে জরুরি, নিজের উত্তেজনাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তিনি অস্থির। তাই শওকত ওসমানের সাম্প্রতিক লেখায় তাপ যতটা অনুভব করি, আলো সে পরিমাণে কম। অন্তত তাঁরই প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসের তুলনায় তো বটেই। কিন্তু এইসব লেখায় তাঁর মেধা, তাঁর দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর শিল্পবোধ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় কিন্তু চাপা থাকে না। তবে নিজের প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনাকে খুঁটিয়ে দেখার সময় তিনি দিতে চান না। মনে হয়, তাঁর দেখা ও শোনা যাবতীয় বিষয় ও ঘটনার প্রতিক্রিয়া তিনি দ্রুত নোট করে রাখছেন, এগুলো নিয়ে বড় কোনো কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমরা বহুকাল ধরে যে-মহৎ উপন্যাসের প্রতীক্ষা করছি শওকত ওসমানের সাম্প্রতিক লেখায় তারই মহাপ্রস্তুতি চলছে। এই প্রস্তুতিপর্বে তিনি যা লিখছেন তা আমাদের যে-কোনো সফল বা নিটোল গল্প কী উপন্যাসের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রস্তুতিপর্বে তিনি যা লেখেন তা কেবল নির্মাণ নয়, সৃষ্টি।

আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমির সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের স্বপ্ন ও সংকট, উদ্যম ও ক্লান্তি এবং আশা ও বেদনার বিশাল ও গভীর কাহিনীসৃষ্টির যে-প্রস্তুতি তিনি নিয়ে চলেছেন, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমকালীন ও আগামী কর্মীদের শিল্পী হিসাবে গড়ে উঠতে তা শক্ত ভিত্তির জোগান দেবে।

স্মৃতির শহরে কবির জাগরণ

> বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও, চলে যা সেখানে
> ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড়ো ব্যস্ত,
> এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন
> একটুও সময় নেই। *দুঃসময়ের মুখোমুখি* : শামসুর রাহমান।

কিন্তু হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বাচ্চুকে এড়ানো যায় না, শামসুর রাহমানের রচনায় সে নানাভাবে উঁকি দেয়। স্মৃতির শহর প্রধানত তারই কথা, শামসুর রাহমানের শৈশব ও বাল্যকালের স্মৃতিচারণ। নিজের ছেলেবেলার জন্য তাঁর তীব্র নস্টালজিয়া এবং তাঁর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠার শহরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য টান এই বই লিখতে তাঁকে একরকম বাধ্য করেছে। বইটির প্রায় শুরুতেই সেই সময়কার ঢাকার-রাস্তা ও সরু অলিগলি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া এবং ঘাসবিচালির গন্ধ–ছড়ানো–আস্তাবল আর রৌদ্রহাওয়ায় ঝিকিয়ে–ওঠা–চাবুকের সানুরাগ উল্লেখ পাঠককে জানিয়ে দেয় যে আমাদের এই শহরের সঙ্গে কবির সম্পর্ক কেবল মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের নয়। অনেকদিনের গভীর সাহচর্য ও তীব্র ভালোবাসা প্রিয়জন সম্পর্কে স্নিগ্ধ ও ঝাঁঝালো কথাবার্তা বলতে তাঁকে নিঃসংকোচ করে তুলেছে।

শামসুর রাহমানের আবেগ খুব প্রবল ও টেকসই। মাহুতটুলির গলিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যে–লোকটি ল্যাম্পোস্টে আলো জ্বালাত আজ অর্ধ শতাব্দী পার করে দিয়েও তাঁর মনে সে একই দীপ্তিতে জ্বলছে। 'সর্বাঙ্গে আঁধার মেখে' যখন 'চিবুক ঠেকিয়ে হাতে' তিনি 'প্রাত্যহিকের বাঁটি কতোটা' তার হিসাব মেলান, 'জীবনের পাঠশালা' থেকে পালানো চিন্তায় তিনি যখন নিস্তেজ, তখন আলো দেখার স্পৃহায় তিনি সেই বাতিওয়ালাকে কামনা করেন তাঁর কবিতায়। ('শৈশবের বাতি–অলা আমাকে' : *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। আর *স্মৃতির শহর* বইতে বাতিওয়ালা উপস্থিত হয়েছে নিজের গৌরবে। একটি মইয়ের ধাপে দাঁড়িয়ে সে আলো জ্বালাচ্ছে, তার মুখমণ্ডল এখন একটি আলোর প্রদীপ। আস্তাবলের হাড়জিরজিরে ঘোড়া ও ঘোড়ার সহিস শামসুর রাহমানের কবিতায় আসে সময়বদলের কথা বলতে। ('জনৈক সহিসের ছেলে বলছে' : *বিধ্বস্ত নীলিমা*')। আর *স্মৃতির শহর*–এ এসে দেখি যে

সাত রওজার সেই ঘোড়াগুলো এবং তাদের সঙ্গী হাড্ডিসার লোকটি হয়ে উঠেছে হিরো। কবির কোনো বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য তারা কেবল বাহনমাত্র নয়, এখানে আলোচ্য চরিত্র তারা, বিষয়বস্তুও তারাই। মাহুতটুলির পিঠেওয়ালি বুড়ি, আর্মানিটোলা স্কুলের মাঠ, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে মেঘমালার রঙিন চলচ্চিত্র দেখা, গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ গলিতে আলিজান ব্যাপারির খড়মের আওয়াজ, তারা মসজিদের গায়ে সূর্যের বিদায় নেওয়ার আয়োজন, মসজিদে এফতার খাওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা—এসব তিনি আজও অনুভব করতে পারেন শৈশবকালের স্পন্দন দিয়ে। তাঁদের বাড়িতে কলের জলের ব্যবস্থা হওয়ায় ভিস্তির আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়—এ কি আজকের কথা? কিন্তু ভিস্তির জন্য বিরহকষ্ট তাঁর এখন পর্যন্ত টাটকাই রয়ে গেছে। তাঁর করোটি, তাঁর পাঁজর জুড়ে শৈশবকাল যেমন বাস্তু আসন পেতে বসেছে কার সাধ্য তাকে এতটুকু টলায়?

শামসুর রাহমানের কবিতার জায়গাজমির অনেকটা জুড়ে থাকে ঢাকা শহর। তিনি ঢাকার লোক, এখানেই বড় হয়েছেন, কিন্তু শহরকে তিনি দেখেন কখনো 'প্রবাসী কিংবা প্রণয়ীর চোখে'। এর কোনোকিছুই তাঁর চোখে একঘেয়ে হয় না, প্রবাসীর কৌতূহল এবং প্রেমিকের উৎকণ্ঠায় এই শহরকে নতুন নতুন পরতে উন্মোচন করেন তিনি। আমাদের এই বহুকালের শহরটি তার এঁদো বস্তি, জৈষ্ঠে পোড়া ও শ্রাবণে ভেজা ঠেলাগাড়ি, জনসভা, মিছিল, পার্ক, ল্যাম্পোস্ট, ফুটপাথ—সব, সবই তাঁর কবিতায় ঘোরতরভাবে উপস্থিত। জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে, তার পাতালের কালি কুড়িয়ে আনতে, তার সকল রহস্যময়তা খুলে দেখার জন্য বারবার তিনি মাধ্যম করেছেন এই শহরকে। *স্মৃতির শহর* কিন্তু ঢাকাকে তাঁর বক্তব্যপ্রকাশের একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি, ঢাকা এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুতে, ঢাকাই তাঁর বক্তব্য।

তবে ঢাকা এখানে সত্যি স্মৃতির শহর, এই শহরের শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে তাঁর শৈশব। শামসুর রাহমানের কবিতায় রঙিন ও সুদূর শৈশবকাল এসে কঠিন বর্তমানকে করে তোলে কালো ও অবাঞ্ছিত। এই দ্রুতশ্বাস-সময়ে শৈশবের স্মৃতি বিব্রতকর। এগারো বছরের বাচ্চুকে দেখে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। তাকে এড়াবার জন্য তাঁকে কত ফন্দিই-না করতে হয়। আর *স্মৃতির শহর* বইতে? গোটা বইয়ের প্রাসাদ জুড়ে গলি, উপগলি, রাস্তা, রাস্তার মোড়, পার্ক, স্কুলের মাঠ, মসজিদ, পুকুর, জনসভা, মিছিল—সব জায়গায় শ্রীমান বাচ্চুর একচ্ছত্র দাপট, এখানে সে রাজাধিরাজ। মাহুতটুলি লেন, পগোজ স্কুলের সিঁড়ি ও ক্লাসরুম, অরুণ, সুনীল, সূর্যকিশোর, আশরাফ, হোসেনি দালান, মহরম ও জন্মাষ্টমীর মিছিল—এরা হল এই মহারাজার সহচর-সহচরী। এদের জন্য শামসুর রাহমানের মমতাবোধ অসাধারণ, এই ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। *স্মৃতির শহর* বইতে এই ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে বেদনার মধ্যে। এদের সঙ্গে শৈশবকালের যোগাযোগটি তাঁর ছিঁড়ে গেছে। এই বিচ্ছেদ তাঁকে এমনভাবে আহত করে যে, দুঃখ ও বিষাদে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন।

সেইসঙ্গে ভেঙে পড়ে তাঁর লেখার গাঁথুনি, চিড় খায় রচনার ঋজু শরীরে। ছেলেবেলার জন্য এবং এই শহরের সেই সময়ের জন্য কাঁচা আবেগ শামসুর রাহমানকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, বেদনা বা সুখের সঙ্গে যে-ন্যূনতম দূরত্ব ব্যক্তিগত আবেগকে সর্বজনীনতা দান করে, যা না-হলে আর পাঁচজনের পক্ষে তা অনুভব করা যায় না, এই বইতে তার অভাব লক্ষ করি। বেদনা বা ভালোবাসা—যা-ই বলি-না কেন—পাঠককে যদি স্পর্শ

করতে হয় তো প্রকাশের জন্য আপাত-নির্লিপ্ততা অপরিহার্য। কোনো অভিজ্ঞতা বা কল্পনা— এই আপাত-নির্লিপ্ত বিবরণ থেকেই পাঠক সে-সম্বন্ধে লেখকের আবেগকে ঠিক ঠাহর করতে পারে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কী কল্পনা থেকে জাত বেদনা কী আনন্দপ্রকাশের সময় লেখক অশ্রু গোপন করতে না-পারলে তার আবেদন অনেকটাই নষ্ট হতে বাধ্য। দুঃখে ভারাক্রান্ত শামসুর রাহমান তাঁর বেদনার কথা বলতে কোথাও কোথাও একই কষ্টের পুনরুক্তি করেন। যেমন, আর্মানিটোলার পুরনো গির্জার ওখানে সূর্যকিশোরদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেশত্যাগী বন্ধুর জন্য তাঁর বেদনার কথা নানাভাবে বলতে বলতে বোধটাকে তিনি ভোঁতা করে ফেলেন। হোসেনি দালান তাঁর বুকে যে-ভিজে ও ঠাণ্ডা হাহাকার জাগিয়ে তোলে তা বড় বেশি স্যাঁতসেঁতে। এখানে গেলে তাঁর কান্না-কান্না লাগত—এগিয়ে-পড়া বর্ণনার কল্যাণে এটা আমাদের কাছে একটি অপ্রয়োজনীয় তথ্যের বেশি কোনো মর্যাদা পায় না।

সরস্বতীর পায়ের কাছে রাজহাঁস দেখে তাঁর নিহত পরমপ্রিয় হাঁসজোড়ার কথা মনে পড়লে পাঠকমাত্রেই অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু হাঁসজোড়ার কথা বলতে বলতে তাঁর রচনাও কান্নায় ভেঙে পড়বে কেন? গোশতের লাল সুরুয়াই তো তাঁর কষ্ট বোঝাবার জন্য যথেষ্ট, সেখানে সেই কষ্টের সানুরাগ বিবরণ প্রায় বিলাপে পরিণত হয়েছে, ফলে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গেছে। শামসুর রাহমানের একটি কবিতায় এই প্রসঙ্গটি এসেছে অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে :

> ক্ষুধার্ত প্রহরে
> একদিন সহসা তার পালকবিহীন
> কতিপয় লালচে ভগ্নাংশ
> খাবার টেবিলে এলো ভয়ানক বিবমিষা জাগিয়ে আমার।
> — *ছেলেবেলা থেকেই* : এক ধরনের অহংকার।

কাচের দোকানে ঝুঁকে বসে ছবি আঁকত যে নঈম মিয়া তার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ খুব আকর্ষণীয়। শ্যাওলা-পড়া-দেওয়ালের মতো তার খোঁচা-খোঁচা-দাড়িওয়ালা-গালের কথা পড়ি, তার কাশির কথা পড়ি আর লোকটিকে মন দিয়ে দেখতে পাই। কিন্তু প্রসঙ্গটির শেষভাগে এসে লেখক যখন বারবার বলেন, তাকে তিনি ভুলতে পারেননি, কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, তখন বিষয়টি নেতিয়ে পড়ে এবং পাঠক তাকে ভুলতে পারবে না এরকম নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। *স্মৃতির শহর* প্রায়ই এরকম তরল ভাবালুতায় গড়িয়ে পড়ে, ফলে লেখকের সুখ ও বেদনায় সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে কঠিন। আবার এই একই কারণে ঢাকা শহরের একটি বিশেষ সময়কে জানবার সুযোগও এই বইটি দিতে পারে না।

কিন্তু শামসুর রাহমানের এই লেখাটি যে অসংলগ্ন বা তাঁর স্মৃতিমালা এলোমেলো তা কিন্তু নয়। বরং এই বইতে একটি সতর্ক স্কিম পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সঙ্গে গল্প বলা থেকে এর শুরু, গল্প বলা সাঙ্গ হলে ব্যাঙ্গমা দম্পতির উড়ে যাওয়ার মধ্যে লেখার ইতি। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা, দৃশ্য, অভিজ্ঞতা সবই খুব স্পষ্ট, পরস্পরের এলাকা ডিঙিয়ে যাবার স্মৃতিচারণসুলভ প্রবণতা এদের কম। কিন্তু এই আঁটোসাঁটো কাঠামোর ভেতর

বুনট বড় শিথিল। আবেগের ভাবালুতাময় প্রকাশ তো আছেই, এ ছাড়া শামসুর রাহমানের গদ্যও এই শিথিল বিন্যাসের একটি প্রধান কারণ।

শামসুর রাহমানের কবিতায় কথ্য গদ্যরীতির ব্যবহার যে সফল এ-সম্বন্ধে প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ। কথ্যভঙ্গি তাঁর কবিতাকে লাবণ্যময় ও স্বচ্ছন্দ করে। আবার পাশাপাশি তাঁর গদ্যে কাব্যের প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। এই প্রভাব বেশির ভাগ সময়েই ভালো হয়নি। বাক্যগঠনে তিনি সাধারণ কথ্যরীতির কাঠামোটি ঠিক না-রেখে প্রায়ই কবিতার ভঙ্গি নিয়ে আসেন। গদ্য তখন অস্বাভাবিক এবং কখনো কখনো অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। থিবসের কবি পিন্ডারের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন 'ঐ বাড়িতে বসে কত কবিতা লিখেছেন তিনি, ঘুঙুরের মতো বাজিয়েছেন শব্দকে'। এই বাক্যে কবিতার প্রভাব খুব চোখে পড়ে, কিন্তু এতে কাব্যময়তার সৃষ্টি হয় না, বাক্য বরং এলিয়ে পড়েছে এবং পিন্ডারের কাব্যচর্চার ব্যাপারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

'যেতাম নতুন কাপড় পরে আব্বার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে। সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে পড়তো খোদার দরবারে, সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে সেজদা দিতো মসজিদের ঠাণ্ডা মেঝেতে।—নাক, কপাল, হাতের তালু আর পায়ের পাতা সেই ঠাণ্ডায় আদর খেতো কিছুক্ষণ। সুরা মুখস্থ করানো হয়েছিলো আমাকে। বেশ কয়েকটা সুরা জানা ছিলো আমার।' উদ্ধৃত অংশের একটি বাক্যও কথ্য বাংলার রীতিতে লেখা হয়নি। রচনার একঘেয়েমি এড়াতে কিংবা বিশেষ কোনো কথার ওপর জোর দিতে মাঝে মাঝে এরকম বাক্য লেখা দরকার হয় বইকী। কিন্তু অনুচ্ছেদ জুড়ে বাক্যের এরকম বিন্যাস একটানা করে গেলে গদ্যের গঠন কি দুর্বল হয়ে পড়ে না?

কয়েক জায়গায় শিশু-পাঠকদের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ-স্থাপনের জন্য শামসুর রাহমান বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই প্রচেষ্টা কিন্তু সব জায়গায় সফল হয়নি। যেমন, 'মজাদার শব্দ করে ঘোড়া ছুটতো দিগ্বিদিক'—এখানে 'মজাদার' কথাটি ঘোড়া ও বাক্য উভয়ের গতি শ্লথ করে দিয়েছে। কিংবা 'তখন আমাদের এই চমৎকার দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন আলেকজান্ডার'—এই বাক্যে 'চমৎকার দুনিয়া' শুনতে বেশ স্মার্ট, কিন্তু এখানে এর প্রয়োগ কি সমর্থনযোগ্য? ওয়াল্ট ডিজনির জগৎকে চমৎকার দুনিয়া বলতে পারি, কিন্তু আমাদের জীবনযাপনের একমাত্র এবং প্রথম ও শেষ অবলম্বন পৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসা বোঝাবার জন্য এখানে 'চমৎকার' কথাটি কি একটু .জিল নয়?

'শিউরে উঠেছিলাম। শিউরে উঠেছিলাম আমি, আমরা'। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ দেখে বিচলিত হওয়ার কথা বোঝাবার জন্য এই বাক্য লিখিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি যেমন নাটকীয়, তেমনি বড় সাজানো মনে হয়। একটি বালক যেন কথা না-বলে ডায়ালগ ছাড়ছে। একটি ক্ষুব্ধ ও শিহরিত বালকের যন্ত্রণা প্রকাশ করা এই বাক্যের সাধ্যের বাইরে।

'বেড়ালের মত পা ফেলে আসতো সন্ধেগুলো'। এই বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে মাহুতটুলির গলিতে সন্ধ্যাগমের দৃশ্যের বর্ণনা। অনুচ্ছেদের শুরুতেই এরকম একটি ব্যতিক্রমি বাক্য ও উপমায় পাঠকের খটকা লাগে। এই বাক্যের জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার, নইলে এতে সায় দেওয়া কঠিন। গদ্যরচনায় ব্যবহৃত হয় বিষয়কে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে। গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতিতে উপমা কখনো বিঘ্নের সৃষ্টি করে না। কিন্তু *স্মৃতির শহর*-এ উপমার একমাত্র ভূমিকা হল বাক্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধি। এই অলংকার যেন ভার হয়ে

বসেছে বাক্যের শরীরে, বাক্য তাই কখনো কখনো ভারে নুয়ে পড়ে, এগুতে পারে না। এক এক জায়গায় এমন হয়েছে যে স্মৃতিচারণা করতে করতে স্বপ্নাচ্ছন্ন একটি পরিবেশ হয়েছে, এমন সময় উপমা এসে পাথরের মতো চেপে বসেছে পাঠকের ওপর। যেমন, স্কুলের বন্ধুদের সম্বন্ধে বলতে বলতে একটি মেজাজ তৈরি হয়ে আসছিল, সেই মুহূর্তে 'নামগুলো যেমন মাণিকের আলো দিয়ে গড়া' এই বাক্য মেজাজটিকে ছিঁড়ে ফেলে। ছেলেবেলার বন্ধুদের জন্য কষ্টবোধের প্রকাশ কিন্তু তাঁর কবিতায় অনেক স্বচ্ছন্দ, এখানে উপমা স্বাভাবিক, উপমা ব্যবহারের জন্য জায়গাটি যেন তৈরি করাই ছিল।

অরুণ, সুনীল, সুবিমল, সূর্যকিশোর, তাহের,
শিশির, আশরাফ আজ কয়েকটি নাম, শুধু নাম,
মাঝে মধ্যে জোনাকির মতো জ্বলে আর নেভে।
—*ছেলেবেলা থেকেই* : এক ধরনের অহংকার।

এখানে উপমাটি অর্থবহ, প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যময়। চিত্তে এইসব বন্ধুরা এখন উজ্জ্বলভাবে অবস্থান করে, কিন্তু তাঁর বর্তমানকালের জীবনযাপনে এদের কোনো ভূমিকা নেই—এই কথাটি কিন্তু অনুভব করা যায় উপমাটির জন্যই। সর্বোপরি এই উপমা কবিতার শরীরের সুসঙ্গত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু *স্মৃতির শহর*–এর ঐ অংশে উপমাটি অপরিহার্যতা অর্জন করতে পারেনি। *স্মৃতির শহর* রচনার সচেতন পরিকল্পনার পরিচয় আরও পাই ঢাকা শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতা সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়ার প্রয়াসে। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চালের কথার পরেই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রধান খাদ্যের তালিকায় আটার রুটির অন্তর্ভুক্তির কথা, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের শহরে আসা এবং মানুষের দুর্বিষহ ক্ষুধার কথা সফলভাবে বলা হয়েছে।

লোকপরম্পরায় শুনে বা ইতিহাস পড়ে আমাদের জন্মের বহুকাল আগেকার ঘটনা আমাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির অন্তরঙ্গতা অর্জন করে। শামসুর রাহমানের স্পর্শকাতর বুকে ঐতিহাসিক ঘটনা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিক বস্তু প্রভৃতি স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। লালবাগ কেল্লার প্রসঙ্গ এমন স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে যে, এই ঐতিহাসিক প্রাসাদটির জন্য পাঠকও হৃদয়ে উত্তাপ অনুভব করে। বড় কাটরার কথাও উল্লেখযোগ্য। নির্মাণের কালে এই অট্টালিকাকে কেন্দ্র করে মুঘল যুবরাজের স্বপ্ন ও সাধ এবং এর এখনকার হতশ্রী চেহারার কথা পাশাপাশি থাকায় দালানটি জড় পদার্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঢাকায় প্রায় বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। দাঙ্গা এই বইতে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে লেখকের ক্ষোভও বেশ সোচ্চার। ধর্মান্ধ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার জন্য শামসুর রাহমান বরাবরই উচ্চকণ্ঠ, *স্মৃতির শহর* থেকে জানতে পারি, শৈশব থেকেই তিনি এই অমানবিক ও পাশবিক শক্তিকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তবে একটি কিন্তু আছে। এখানে বিষয়টি এসেছে বিবৃতির ভেতর। তা না-হয়ে এটা যদি তাঁর অভিজ্ঞতার

মধ্যে আসে তো তাঁর স্মৃতিচারণের সঙ্গে যেমন খাপ খায় তেমনই পাঠককে আর একটু স্পর্শ করতে পারে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা এই বইতে লেখা হয়েছে একটু পাঠ্যপুস্তকীয় রীতিতে। হয়তো এই কারণেই প্রসঙ্গটিকে মূল প্রবাহের বাইরের ব্যাপার বলে মনে হয়। আবার এর উপসংহারে 'একবার বিদায় দে মা' গানটির উল্লেখ আকস্মিক এবং অতিনাটকীয় বলে বেমানান। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন শামসুর রাহমানের কবিতার একটি অত্যন্ত পরিচিত প্রসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা মানুষের মুখে-মুখে ফেরে। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিস্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ করি।

এই বইতে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বরং উপস্থিত হয়েছে অনেক তীব্রতা নিয়ে। ঐ সময় দেশবাসীর রক্তের সঙ্গে বেইমানি করে খাজা আবদুল গনির নবাব খেতাব লাভ করার ছোট ইতিহাসটি বইটির মূল্যবান অংশ। ঢাকা শহরের আদি অধিবাসীদের ওপর ঢাকার কাগজি নবাবদের দাপট ও শোষণ নিয়ে তিনি এখানে একটু আলোকপাত করতে পারতেন। এঁদের সম্বন্ধে এই বইয়ে তেমন কিছুই বলা হয়নি। ঢাকার আদি বাসিন্দাদের অসাধারণ কৌতুকবোধ, তাঁদের সহৃদয় আতিথেয়তা এবং গল্প বলার অপূর্ব আকর্ষণীয় ভঙ্গি—এসব কি লেখকের স্মৃতিচারণে থাকবার কথা নয়?

শেষ অধ্যায়টিতে শামসুর রাহমানের কাব্যচর্চার প্রস্তুতির কথা পাই, এইজন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেবেলার তাঁর প্রিয় বই সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানেই প্রথমে পাওয়া গেল। তাঁর প্রিয় পাঠাগার, পাঠাগার গড়ে ওঠার গল্প, পাঠাগারে তাঁর আসা-যাওয়া প্রভৃতি বিবরণ শামসুর রাহমান এবং ঢাকা শহর সম্বন্ধে উৎসাহী সবাইকে আকর্ষণ করবে। দুবছরের বোন নেহারের মৃত্যুতে লেখা গদ্যরচনাটি—তা যতই কাঁচা হোক—সংযোজিত হলে কবি হিসেবে তাঁর গড়ে-ওঠার একটি স্তরের পরিচয় পাওয়া যেত। বইটি এখানে শেষ হলেই ভালো হত। অন্তত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আশৈশব ভালোবাসা ঘোষণা করা কি আদৌ প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিবেচনা করেন? বিশেষ করে তাঁর কবিতা লেখার সঙ্গে এই ঘোষণা প্রাসঙ্গিক হয় কী করে? মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগই কি মানুষের কবিতা লেখার প্রধান উৎস? যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন না মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কি কোনো অংশে কম? এই তিন লাইনের স্তবকটি একটি তরল নাটকের তৈরি করেছে এবং এতে পেশাদার রাজনীতিবিদদের জেল থেকে বেরিয়ে কিংবা মন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করে শহীদ মিনার পরিদর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্মৃতির শহর বইয়ের প্রধান আকর্ষণ শামসুর রাহমান নিজে। ১০৮ পৃষ্ঠার বইতে তাঁর কাব্যচর্চার কথা কোথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়নি, কয়েকটি জায়গায় কেবল বিনীত উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলার স্বভাবে স্ফুটনোন্মুখ একজন কবিকে অনুভব করি। বইটির সব জায়গায় লাজুক ছেলেকে দেখি, সে যা দেখে তাতেই তার অগাধ কৌতূহল। আবার নতুন কিছু ঘটলেই খুশিতে সে হৈচৈ করে ওঠে তা নয় ; বরং লুপ্ত জিনিসের জন্য, প্রবাহিত সময়ের জন্য, পরিত্যক্ত কোনো কোনো প্রথার জন্য মনটা তার ভার হয়ে থাকে। সবই সে অনুভব করে মমতা ও বেদনা নিয়ে। মানুষের সুখে সে যতটা চাঙা হয়ে ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশি ভেঙে পড়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়। এখানে রাস্তায়, গলিতে, ফুটপাথে,

পার্কে, মসজিদে, স্কুলে, মিছিলে, মিটিঙে একটি বালককে আমরা কবি হয়ে উঠতে দেখি। এ-বই একটি বালকের কবি হয়ে ওঠার চালচিত্র, একজন কবির উন্মোচনের গল্প।

তাঁর স্মৃতির শহর ঢাকার কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য, সেই কারণে আমরাও এই শহরের কাছে ঋণী। তাঁর কবিস্বভাবের অনেকটাই তৈরি করেছে এই শহর, এই শহরের স্বভাব তাঁকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিয়ে চলেছে। ঘটনার আবেগে উদ্বেলিত আবার একই সঙ্গে ঘটনাসমূহের প্রতি উদাসীনতা তাঁকে কখনো আকৃষ্ট করে, কখনো আঘাত দেয়। কাব্যচর্চার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে শামসুর রাহমানের একটি প্রধান প্রবণতা হল নানারকম স্বৈরাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধকে রূপ দেওয়া। এখানেও কিন্তু ঢাকা শহরের ভূমিকা মোটেও গৌণ নয়, দেশ যখন জ্বলে ওঠে লেলিহান শিখায় তার উত্তাপ প্রবলভাবে অনুভব করা যায় ঢাকা শহরেই। মানুষের অধিকার-প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে রাজপথে, মিছিলে ছুটতে ছুটতে যে-কিশোর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর বন্দুকের সামনে বুক পেতে শুয়ে নেয় বন্দুকের শক্তিকে তার শক্তির ওজন মেপে শামসুর রাহমানের কবিতায়। আসাদের রক্তমাখা শার্ট তাঁর কবিতায় ওড়ে বিদ্রোহের লাল পতাকা হয়ে। মৌলানা ভাসানীর সফেদ পাঞ্জাবি শান্তির নিশান নয়, বরং তাঁর বল্লমের মতো হাত বারবার ঝলসে ওঠে, পল্টনের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি বিচূর্ণিত দক্ষিণ-বাঙলার শবাকীর্ণ উপকূলের বার্তা দেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে। ১৯৭১ সালের ঢাকা কেবল একটি অবরুদ্ধ নগরী নয়, শামসুর রাহমানের কবিতায় তা শত্রুনিধনের সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত সাহসী মানুষের জনপদ। স্বাধীনতার পর থেকেই স্বৈরাচারের নতুন চেহারাও তাঁর চোখ এড়িয়ে থাকতে পারেনি। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত স্বৈরাচার প্রতিরোধে ঢাকা শহরে মানুষের আন্দোলন ও উত্থান তাঁকে উত্তেজিত করে আসছে, অনুপ্রাণিত করে আসছে স্বৈরাচারী সরকারের নির্যাতন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের নানারকম হিসাবনিকাশে। আন্দোলন স্তিমিত হলে এই ঢাকা শহরই হয়ে পড়ে সবচেয়ে নিস্তেজ। শামসুর রাহমানের কবিতায় ঢাকা নগরীর উত্তেজনা, সংকল্প, উত্থান এবং পাশাপাশি এর ক্লান্তি ও হতাশা ধরা পড়ে সবচেয়ে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে। ঢাকা শহরের নিশ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর কবিতায় অনুসৃত হয় নির্ভুল গতিতে। এই শহরের সঙ্গে তিনি হেঁটে চলেছেন ছায়ার মতো। *স্মৃতির শহর*-এ প্রকাশিত তাঁর শৈশবকালেও এর আভাস মেলে, মাঝে মাঝে আভাও দেখা যায়।

ক্ষুব্ধ শহীদ ক্লান্ত শহীদ

'ষাট দশকের লেখা গল্পগুলো'।

জীবদ্দশায় প্রকাশিত একমাত্র বই *বিড়াল*–এর সূচিপত্রের আগেই শহীদুর রহমান তাঁর লেখার রচনাকাল জানিয়ে দেন। শিরোনামহীন ভূমিকা পড়তে পড়তে শুনতে পাই, বস্তিচেল্লি ধরনের লম্বাটে মুখে শহীদ বিড়বিড় করে যেন কৈফিয়ত দিচ্ছেন, ঘরের কোনে পড়েই ছিল, উই, ইঁদুর তেলাপোকার খোরাক হচ্ছিল, তা আমার বৌ আবার এসব নিয়ে আস্ত একটা বই করে ফেলল।

নিজেই বই বার করতে লেখকের এত দ্বিধা। ষাট দশকের লেখকদের প্রথম সংগঠন *স্বাক্ষর* কবিতাপত্রে শহীদুর রহমান নামে একজন লেখকের *বিড়াল* নামে একটি বই প্রকাশের ঘোষণা বেরয় ১৯৬৩ সালে, সেই বই প্রকাশিত হল ১৯৮৮–তে। মাঝখানে কেটে গেছে একটি শতাব্দীর সিকিভাগ কাল। শহীদুর রহমানের সঙ্গে যারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নয়, সাল দুটো জানলে তারাও বুঝতে পারে নিজেকে গুটিয়ে রাখার জন্য রীতিমতো সক্রিয় না–হলে সময়ের ব্যবধানটা এত দীর্ঘ হতে পারে না। নিজেকে আড়ালে রাখার প্রবণতা তাঁর এতটাই প্রবল যে মাঝে মাঝে মনে হয়, তা হলে লেখার দরকারটা ছিল কেন? বইটি তিনি উৎসর্গ করে গেছেন 'যন্ত্রণাকাতরদের উদ্দেশে'। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লে নিজের কষ্ট জানাবার দম পাওয়াই কঠিন, কিন্তু শহীদুর রহমানের প্রকাশের ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ক্ষয় হয়নি ; লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শহীদ নিজের অনেক ভেতরে কুরে কুরে দেখতে দেখতে এক–একটি প্রতিবেদন পেশ করে গেছেন। এইসব প্রতিবেদনে অনুকূল কথা নেই, সব ব্যাপারেই তিনি অসন্তুষ্ট, মানুষের ভেতরটা যতই হাতড়ে দেখেন, তিনি ততই ক্ষুব্ধ হন। ক্ষোভ তাঁর কমে না, বরং দিনদিন আরও তীব্র হয়েছে। কিন্তু প্রকাশের স্বর উচ্চকণ্ঠ নয়, শেষ পর্যন্ত তা চড়া হয়নি। তাঁর ক্ষোভ ক্রোধের চেহারা পায় না।

শহীদ যখন লিখতে শুরু করেন সময়টা তাঁর যৌবনের প্রথম ও প্রবল কাল। যৌবনের তীব্র ধাক্কায় মানুষ যখন নিজেকে ডিঙোতে চায়, শরীর ও মনে উপচে ওঠে যৌবনের বেগ, সেটা হল তাঁর ঐ সময়।

আমরা একসঙ্গে কলেজে ভরতি হই, আর আমাদের মধ্যে তখন তৈরি হয়েছে চারিদিকের যাবতীয় বস্তুকে বাঁকা চোখে দেখার প্রবণতা। একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে এই প্রবণতা থেকেই মানুষ সবকিছুকে খতিয়ে দেখতে চায়, এর পরিণতি ঘটে যৌবনের বিস্ফোরণে। কিন্তু শুরু করতে–না–করতেই আমাদের ওপর চেপে বসল আইয়ুব খান। মিলিটারি এসে গোটা দেশের মুখে লাগাম পরিয়ে অ্যায়সা টাইট করে টেনে ধরল যে, দেশবাসী দেখল কী সামাজিক, কী রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। মিলিটারির কাছে রাজনীতি নিছক উপদ্রব। রাজনীতিবিদদের 'ডিসগ্রান্টলড পলিটিশিয়ানস' বলে খিস্তি করে শুধু রাজনীতিবিদদের নয়, বরং রাজনীতিকে, প্রতিবাদকে ও সামাজিক গতিশীলতাকে নিরর্থক উত্তেজনা বলে প্রমাণ করার জন্য আইয়ুব খানের ঘেউঘেউ মানুষকে কিছুদিনের জন্য হলেও ভোঁতা করে রেখেছিল। রাজনীতিবিদদের কামড়াকামড়ির দায় যে রাজনীতির নয়, বরং বুর্জোয়া কাঠামোর নড়বড়ে গড়নই রাষ্ট্রের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছিল এবং রাজনীতি ও আন্দোলন দিয়েই এর প্রতিকার সম্ভব—এটা ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে কয়েকটা দিন সময় নেয়। সাম্রাজ্যবাদের ফিট–করা–মাইক্রোফোনটা অফ করে দিলেই মিলিটারির ঘেউঘেউকে নেড়িকুত্তার কুঁইকুঁই বলে শনাক্ত করা যায়—এটা বুঝতে যে–সময়টা কাটে তা ছিল সদ্য কৈশোর পেরনো ও নতুন যৌবনে জ্বলে–ওঠা ছেলেমেয়েদের জন্য চরম দুঃসময়। প্রতিরোধের স্পৃহাকে প্রকাশ করা নিষেধ, ঘেউঘেউয়ের হর্ষধ্বনির ভেতরকার কুঁইকুঁই শুনতে পেলেও তা জানাবার উপায় নেই। মানুষের সঙ্গে কথা বলো, আপত্তি নেই। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবে না। নবাবপুরের রেস্টুরেন্টগুলোতে লেখা : 'রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ'। তার মানে অন্য আলাপও করতে হবে ওদের মর্জিমাফিক। তখন নতুন তরুণদের অবস্থা কী? আগুন ভেতরে থাকায় নিজে নিজেই পোড়ে, ছাইয়ের তলায় তা চাপা পড়ে, না–পারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে, না–পারে তা আলো হয়ে চারপাশকে ফুটিয়ে তুলতে। তখন ঐ তরুণদের নিজেদের গ্লানি ও অপমানকে, ছাইচাপা আগুনকে ছুঁয়ে দেখার মাধ্যম হিসাবে প্রকাশিত হয় *স্বাক্ষর*। ঐসব তরুণ নিজেদের নাড়ির স্পন্দন গুণে দেখার উদ্যোগ নিয়েছিল কবিতার গ্রাফে। উদ্যোগটি যতটা–না ছন্দ মেলাবার তাগাদায় তার চেয়ে অনেক বেশি রাষ্ট্রব্যবস্থার লোমশ হাত জোর করে পেছনে টানার, মানুষের পায়ের পাতা পেছনদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কসরতের শিকার তরুণদের অস্বস্তি জানাবার এবং নিজে জানবার তাগিদে। তাদের প্রধান লক্ষ্য তখনও পাঠক নয়, বরং নিজেরা ; নিজেদের ভালো করে বোঝাই তখন তাদের বড় প্রয়োজন। *স্বাক্ষর*–এর প্রথম সংখ্যায় অশোক সৈয়দ, রফিক আজাদ, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রশান্ত ঘোষাল এবং শহীদুর রহমানের প্রায়–স্বগতোক্তিতে নিজেদের অন্তর্লোকের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ ছিল সৎ ও তীক্ষ্ন ; তাই তা প্রলাপ না–হয়ে ফুটে উঠেছিল কবিতা হয়ে। অশোক সৈয়দ কিছুদিনের মধ্যে নামের বৈচিত্র্যমোহ ত্যাগ করে আবদুল মান্নান সৈয়দ হয়ে ওঠেন, সাহিত্যের সবগুলো মাধ্যমে আঙ্গিকের নানারকম পরীক্ষা করতে করতে ভাষার পরতে পরতে তাঁর অনুসন্ধান ব্যাপক হতে থাকে। আসাদুল ইসলাম চৌধুরী নাম থেকে মেদ ঝেড়ে স্রেফ আসাদ চৌধুরী হয়ে রাজ্যের যাবতীয় জিনিসকে কবিতার বিষয় করে দুই চোখ ভরে দুনিয়া দেখার কর্মে নিয়োজিত হন। রফিক আজাদের নাম রফিক আজাদই রয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কবিতায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হতে থাকে ; ব্যক্তি ও সমাজের, মানুষের ও রাষ্ট্রের, ধর্মের ও বিশ্বাসের,

ভাষার ও ভাবনার ভেতরকার অসঙ্গতি চোখে হাত দিয়ে দেখবার জন্য তিনি হন্যে হয়ে ওঠেন। আর শহীদুর রহমান কিন্তু ষাট দশকের প্রথম দিকের ক্ষোভটিকেই ঘুরেফিরে দেখতে থাকেন। তাঁর শিল্পকর্ম নতুন আবিষ্কারের, নতুন সমবেত উল্লাসের কিংবা সমবেত বেদনার কিংবা স্রেফ শব্দের অন্তর্গত বিস্ফোরণ–সম্ভাবনার খোঁজ করে না, নিজের ভেতরটাকেই আরও তন্নতন্ন করে দেখার কাজে একনিষ্ঠ হয়। দিনবদলের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু আরও ভেতরে লুকোয়, তাঁর নাছোরবান্দা চোখও আরও ভেতরে ঢোকে।

ষাটের দশকে গুণে গুণে বছর ঐ দশটিই, কিন্তু বছরগুলো চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে, এক এক বছরে এগিয়ে গেছে কয়েক দশক করে। ১৯৬২ সালেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা মিলিটারির গতর থেকে অ্যালসেশিয়ানের চামড়াটা ফেলে দেয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের নসিহত খয়রাত করতে এলে আক্ষরিক অর্থে থুতু দেওয়া হয় আইয়ুব খানের এক মন্ত্রী মনজুর কাদেরের মুখে। এবং এয়ারপোর্টে গিয়ে গালে থাপ্পড় খায় আইয়ুব খানের উঠতি চাকর মোনেম খান। কিন্তু এগুলো সবই অসন্তোষের প্রকাশ, প্রতিবাদ খুব স্পষ্ট, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা তখনও রয়ে গেছে ভেতরে, সমস্ত দেশবাসীর সংকল্পে পরিণত হয়ে জ্বলে উঠতে আরও কয়েকটা দিন প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। তবে ভেতরের তাপ বেশ বোঝা যাচ্ছিল। শহীদুর রহমানের কবিতায় তার ক্ষুব্ধ চেহারার ভেতরের আঁচটাও গায়ে লাগে।

স্বাক্ষর কবিতাপত্রের প্রথম সংখ্যায় শহীদুর রহমানে 'একটি শিয়ালের দুটি অধ্যায়' কবিতা পড়তে শুরু করলে এটির কবিতা হওয়া নিয়ে সন্দেহ জাগে, কিন্তু পড়তে পড়তে শিয়ালের লোভ, জিভ নেড়ে ঠোঁট দিয়ে দেখা, স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি করে জিভ বাড়িয়ে রক্তের স্বাদ চাখা—পড়তে পড়তে গা শিরশির করে ওঠে। শিরশির করে ; আবার ঘিনঘিনও করে। এই অস্বস্তি তৈরি করতে পারে কবিতা ছাড়া আর কী? পরের সংখ্যা স্বাক্ষর–এ 'রুগ্ণ আত্মার ভাষণ' কবিতার নাকরণের মধ্যেই রুগ্ণতাকে কবির বিলাস নয়, উদ্বেগ বলে টের পাওয়া যায়। নিজের ভেতরে থেকেও তিনি এখানে আরও অনেককে দেখতে পান, এখানে 'আমি' হয়ে ওঠে 'আমরা'। ১৯৬৫ সালে তৃতীয় সংখ্যা *স্বাক্ষর*–এ তাঁর একটি কবিতার নাম 'নৈঃসঙ্গ'। শহীদ এখানে ব্যক্তির ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাকে দেখতে চাইছেন 'খানিক আলো জ্বেলে'। এখানে 'ধূ–ধূ–ধূ মাঠ দিগন্তের এ ধারে তপ্ত মাটি মরীচিকাও যে নেই'। এই দেখায় নিরঙ্কুশ সততা নিঃসঙ্গতা তাঁর পুঁজি নয় এবং এখান থেকে মুক্তিলাভের স্বপ্ন অস্পষ্টভাবে ছায়া ফেলে।

স্বাক্ষর–এর সংখ্যা মাত্র কয়েকটি, এর প্রতিটিতে কেউ–কেউ ঝরে যান, নতুন আসেন কয়েকজন। শেষ সংখ্যা *স্বাক্ষরে* শহীদুর রহমান অনুপস্থিত। মৃত্যুর পর প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *শিল্পের ফলকে যন্ত্রণা*'য় বেশির ভাগ কবিতাই আমাদের কাছে নতুন। ষাটের দশকে লেখা কবিতা প্রায় সবকটাতেই *স্বাক্ষর*–এর চরিত্র স্পষ্ট। এর পরের দিকে লেখা কবিতায় শহীদ বাইরে তাকাবার উদ্যোগ নিয়েছেন, এতে তাঁর সততা ও নিষ্ঠার তিলমাত্র অভাব নেই ; আবেগের নানা স্তরের কম্পন শোনা যায়, বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাঁকে আকৃষ্ট করছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় যে–অস্থিরতা ও উদ্বেগ, ক্ষোভ ও বিরক্তি এবং গ্লানিবোধ পরিণত একটি রূপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, যাতে ক্রোধ ও সংকল্পের ভ্রূণ লুকিয়ে ছিল, পরের লেখাগুলোতে তা হারিয়ে গেল। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে কোটি কোটি মানুষের মতো শহীদুর রহমানও বিক্ষুব্ধ ; শুধু ক্ষুব্ধ নয়, বিক্ষুব্ধও। কবিতায়

তার চেহারাটি দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শহীদুর রহমান এই সময় বড় বেশি অস্থির, বড় উত্তেজিত। এখানে তিনি যতটা উদ্বুদ্ধ তার চেয়ে বেশি উত্তেজিত ; কাম, প্রেম, জাতীয়তাবোধ, রাজনীতি—সব জায়গায় পদচারণ কোনো কবির জন্য অনধিকারচর্চা নিশ্চয়ই নয়। প্রথম দিকের শিল্পীস্বভাবের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে যে-স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে নতুন ভাবনা কবিতার উপলব্ধি হয়ে উঠত তার অভাব কাঁটার মতো বেঁধে। কবিতায় যে-বিপুল সম্ভাবনা শহীদ দেখিয়েছিলেন, পরে তার সফল পরিণতি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রেম বা কাম বা দেশবোধ বা রাজনীতি এই পর্বের কবিতায় তাঁর ধাপগুলো টলোমলো। তিনি বেশিরকম উত্তেজিত, এই উত্তেজনা প্রেরণায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যে-মনোযোগ ও সময় দরকার তা দেওয়ার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না।

শহীদুর রহমানের গল্প এবং একজন সফল শিল্পীর ক্রমপরিণতিকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি। তাঁর প্রথম দিককার কবিতা ও সবগুলো গল্পের মধ্যে শিল্পীর স্বভাব অভিন্ন। কবিতায় নতুন অনুভূতিকে স্পর্শ করার চেষ্টাটি মনে হয় আকস্মিক, কোথাও কোথাও এমনকী উটকো। গল্পের প্রকাশ তাঁর খুবই ধারাবাহিক। কবিতায় যা ছিল কেবল সম্ভাবনা, গল্পে তা-ই পেয়েছে পরিণতি। প্রধান গল্পগুলোতে তিনি মানুষের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরার ব্যাপারটিকে তুলে ধরেন, এই চিড় কোথাও কোথাও ফাটলে পরিণত হয়েছে। তাঁর কবিতার শেয়াল গল্পে ঢোকে বিড়াল হয়ে, ঢুকে পড়ে মানুষের সংসারে এবং একটি পরিবার ভাঙার উপসংহার তৈরি করে ক্ষান্ত হয়। কবিতার নিঃসঙ্গ ব্যক্তির অসহায় দীর্ঘশ্বাস গল্পে এসে আর্তনাদের আওয়াজ পায়। গল্পের ব্যক্তি সাংসারিক ও সামাজিক গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে কিংবা বন্ধনের অভাবে তার মাথার রগ দপদপ করে জ্বলে ওঠে। শহীদুর রহমানের গল্পে আর্তনাদ হল এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়ার পথ, এর থেকে আরোগ্যের কোনো লক্ষণ নয়।

তাঁর সবগুলো গল্পের চরিত্র বলতে গেলে একটিই, এই লোকটি প্রায় সবসময় অসন্তুষ্ট, অস্বস্তির মধ্যে তার দিন কাটে, কিংবা দিন তার কাটেই না। তার সময় স্থির হয়ে থাকে একটি মুহূর্তে, সেটি ঘোরতর অন্ধকার ; এই মুহূর্তটিকেই নানারকম আলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করে গেছেন শহীদ। যন্ত্রণার প্রত্যেকটি ধরনকে তিনি আলাদা করে দেখতে চান। একটি গল্পে আবার কেবল একটিমাত্র ধরনকে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। এইভাবে দেখাটি কবিতার প্রকৃতিতে যতটা স্বচ্ছন্দ, গল্পের কাঠামোতে কিন্তু ততটা নয়। গত শতাব্দীতে ছোটগল্পের সূচনাপর্বে কিন্তু গল্পের জন্য এরকম শর্তই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তখন এরকম কথা বলা হত যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে টার্গেট করতে হবে একটিমাত্র ভাবনাকে। কিন্তু মনে রাখা চাই, ছোটগল্পের ঐ পর্বে ঘটনা ছিল একটি জরুরি ব্যাপার, সেটাও ঘুরেফিরে কিন্তু একটিই ঘটনা এবং তার রোগা ও ধারালো তনুর ভেতর দিয়ে লেখকের ভাবনা পৌঁছে যাবে গল্পের শেষ বাক্যে। বড়জোর একটি ছোট অনুচ্ছেদ তার জন্য বরাদ্দ করা যায়, সেখানে পা দিয়েই তা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়বে পাঠকের মাথায়। কিন্তু শহীদের গল্পে ঘটনা কোনো জরুরি মনোযোগ পায় না, যে-স্পষ্ট বা আবছা ঘটনা তাঁর বাহন তাকে তিনি প্রথমেই খুলে ধরেন পাঠকের সামনে, চরিত্রটির অবসেশন বরং সমস্ত ঘটনাকে নিজের ঘোরের মধ্যে দেখে। তো একদিকে ছোটগল্পের সনাতন আইন অনুসারে একমাত্র অনুভূতির তীরটিকে গল্পে বিঁধে ফেলার কর্তা এবং অন্যদিকে চরিত্রের অনেক ভেতরকার অস্বস্তি ও

নিঃসঙ্গতাকে বোঝার জন্য নানা মাত্রার অনুসন্ধান ও অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশের জন্য বিস্তারিত প্রেক্ষাপট ; প্রথমটিতে লেখকের নিয়মপালনের আনুগত্য এবং দ্বিতীয়টিতে শিল্পীর দায়িত্ববোধ, এই দুটিকে সামাল দিতে চেষ্টা করে শহীদ বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, গল্পের লাইনে লাইনে সেই রক্তক্ষরণের ছাপ।

'দূরে কাছে অনেকগুলো গল্প ঘুরছিল। কথা ঘুরছিল। এবং কথা উড়ছিল। তাদের পাখার ঝাপটানি আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। পাহাড়ী শুনতে পাচ্ছিলো'। (মেহড়ার উত্তর)। ঐ কথাগুলোকে উড়ন্ত অবস্থাতেই দেখার জন্য তিনি 'করুণতম' শব্দের 'অর্থের কুঁড়ি' ফুটিয়ে তুলতে চান পাহাড়ীর অনুভবের ভেতর দিয়ে। এই পর্যন্ত কেবল কবিতাই থেকে যায়, মিলি হাজির হলে দুজনের একরোখা সিনিসিজমে চিড় ধরে, গল্পে বহুবচনের আমদানি ঘটে। ফলে পাহাড়ী এবং ওর বন্ধুর ঐ একমাত্রিক সিনিক উড়াল ডানা গোটায়, গল্পটি ডাঙায় নামে এবং পা রাখার জন্য একটি সামাজিক ভিত্তি পায়। প্রথম থেকে এটি ডাঙার গল্প হলে ঝামেলা হত না, সনাতন রীতিকে একটি আধুনিক গল্পে রূপ পেতে এর বেগ পেতে হত না। কিন্তু ভেতরের রহস্যকে হাওয়ায় নিয়ে তাকে নানা রঙে দেখা এবং তারপর তাকে ডাঙায় নামানোর দুরূহ কাজটি তিনি করেন বড় শিল্পীর সাহস নিয়ে।

'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়' গল্পটিকে তিনটি উপশিরোনামে ভাগ করা হয়েছে। এতে হয়েছে কী ধাপে ধাপে গল্পটি বেগ লাভ করেছে এবং এই বেগ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দারুণরকম চাপ তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি আত্মহত্যা করে রেহাই পায়, কিন্তু পাঠককে রেহাই দেয় না। মনে হয়, মনোবিকারের একটি রোগী যেন হঠাৎই থেমে গেল। এই পর্যন্ত আসতে শহীদকে যে-অজস্র গলিঘুপচির ভেতর উঁকি দিতে হয়েছে সনাতন গল্পের আয়ত্তের তা বাইরে। ষাটের দশকের অনেক লেখকই নতুন রীতির খোঁজে বেরিয়ে, ঐসব কানাগলির এক-একটিতে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের অনেক গল্পই পর্যবসিত হয়েছে বিলাপে। শহীদের এই গল্পটিরও ঐ পরিণতি হওয়ার ভয় তো ছিলই। কিন্তু ছেলেটির আত্মহত্যার পর কবরগাহে গর্ভবতী নারীর পায়ের ছাপ এবং তাদের চোখ থেকে ঝরে-পড়া-অশ্রুবিন্দুগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শহীদ এমনকী স্বেচ্ছামৃত্যুর ভেতরেও মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার ইশারা দেন।

তাঁর লেখায় মানুষের এই সম্ভাবনা এসেছে এতটাই ভেতর থেকে, এতটাই স্বাভাবিকভাবে যে তিনি এ নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু ভেবেছিলেন কি না সন্দেহ। এই সম্ভাবনার প্রতি আস্থা তাঁর ইচ্ছানিরপেক্ষ। মানুষের ভেতরের গলিঘুপচিতে ঘুরে তার শব্দ ধ্বনি গন্ধকে গল্পের সনাতন নিয়মের রাজপথে টেনে আনাটা কম শক্তির, কম শ্রমের কিংবা কম রক্তক্ষরণের কাজ নয়।

তাই গল্পের নিয়মকে মেনে চলার শর্তে অনুগত থাকলে চাইলেও তাঁকে নতুন প্রকরণের খোঁজ করতে হয়। এটা ভঙ্গি জগৎজয়ের অভিযান নয়, নিজের অনুসন্ধান ও তদন্তকে নিয়মমাফিক তুলে ধরার স্বার্থেই তাঁকে নতুন প্রকরণের খোঁজ করতে হয়। এই সম্বন্ধে শহীদ সচেতন একেবারে শুরু থেকে। তাঁর লেখাতেই এটা স্পষ্ট। তবে এই ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগগ্রহণের খবর আমি কিছু-কিছু জানি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্রে।

সেই ১৬ বছর বয়সেই শহীদ চিঠি লিখেছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দীপেন্দ্রনাথ তখন আমাদের প্রিয় লেখক। *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় তাঁর তৃতীয় ভুবন পড়ে আমরা দুজনেই

মুগ্ধ। তা শহীদের ঐ চিঠিতে তৃতীয় ভুবন নিয়ে উচ্ছাসের চেয়ে অনেক জরুরি ছিল শহীদের কয়েকটি প্রশ্ন। একটি প্রশ্নের কথা বলি। শহীদ জানতে চেয়েছিল যে, গল্পে উপমা ব্যবহার করতে হলে চরিত্রের অপরিচিত কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আসা ঠিক কি না। এই প্রশ্ন আমারও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু শহীদের ছিল সচেতন ও পরিশ্রমী প্রস্তুতি। বলতে কী এখন মনে হয় যে তখন ওর জীবনযাপনই লেখক হিসাবে তৈরি হওয়ার আয়োজন, শিল্পী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার অনুশীলন। কলেজে তিনটে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষের দলটির প্রতি ওর সমর্থন ছিল সক্রিয়। যদ্দূর মনে পড়ে, কলেজ সংসদের নির্বাচনে ঐ দলের মনোনয়ন পেয়েছিল। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে চেপে বসল আইয়ুব খান। নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল ; কলেজের দলগুলো ভেঙে গেল। রাজনীতি বন্ধ হল, মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিদ্যাচর্চা, মননশীলতা—এসবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য মিলিটারির ডাণ্ডা ঘুরতে শুরু করল বোঁবোঁ করে। এই অবস্থাকে মেনে নেওয়া শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। অবরুদ্ধ ঘরে বসে ভেতরের দিকে দৃষ্টি না-দিয়ে তখন কারও আর উপায় থাকে না। ভেতরের রহস্যময় অন্ধকার বাইরের প্রেক্ষাপটে না-দেখলে সেখানকার আগুন জ্বলে-ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে, অবধারিত বিস্ফোরণটি ঘটে না। স্ফুলিঙ্গটি প্রতিভাবান শিল্পীর ভেতর নানা রঙে ঝিকমিক করে, কিন্তু দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে না। শহীদের ক্ষোভ তাই শেষ পর্যন্ত ক্রোধের মহিমা পায় না। অথচ, সেই সম্ভাবনা তো শহীদ প্রথম থেকেই দেখিয়েছে। গল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা, তা-ই নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে নিজেকে জড়ানো, এসবই তো শিল্পী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার উদ্যোগ। পরিবর্তিত, আরও ঠিক করে বললে, রুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই উদ্যোগ চাপা পড়ল। কোনো কোনো শিল্পীর জন্য এই রুদ্ধতাই বিস্ফোরণের আয়োজন তৈরি করে। শহীদের বেলায় তা হয়নি। তার জন্য দায়ী কবর কাকে? নিজেকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি সক্রিয় ছিল এর অন্তর্গত অগোছালো স্বভাব।

ম্যাট্রিকে খুব ভাল ফল করে ভরতি হয়েছিল আই.এস-সি. ক্লাসে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ও বাংলায় অসাধারণ দখল ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে দিতে ড্রপ করল। এরকম পরীক্ষায় ড্রপ-করা কয়েকজন মেধাবী ছেলের সঙ্গে কলেজের হোস্টেল ছেড়ে গিয়ে উঠল ঢাকা কলেজের উলটোদিকে, বাঁশের বেড়ার একটি ঘরে, নিজেই ঐ ঘরের নাম দিল 'নষ্টনীড়'। ঐ বয়সের ছেলেরা নীড় পছন্দ করে না, কিন্তু শহীদ শুধু ঐটুকুতেই ক্ষান্ত নয়, তার মেজাজ নীড় নষ্ট করার দিকে। বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ইউনির্ভার্সিটিতে ভরতি হল বাংলা নিয়ে ; পড়তে-পড়তেই চাকরি করতে হয়েছে ওকে। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয় সাংবাদিকতাকে, কিন্তু সদাক্ষুব্ধ যুবকের পক্ষে ঐ পেশায় খাপ খাওয়ানো কঠিন, তাও আবার সংবাদপত্রটি সরকারের। ওখান থেকে বেরিয়ে শিক্ষকতার পেশায় এসে মর্যাদা ও স্বস্তি দুটোই পেয়েছিল। গবেষণার দিকে ঝুঁকল, পি.এইচ-ডি. করতে গেল কলকাতায়। অ্যাকাডেমিক গবেষণার শৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়ে অসমাপ্ত থিসিস ফেলে রেখে চলে এল ঢাকায়। কী শিল্পচর্চা, কী পেশা, সবক্ষেত্রেই একটি জায়গায় পৌঁছে অবধারিত সাফল্যের কাছাকাছি এসে ছেড়ে দেওয়া, একদিকে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে প্রত্যাহার করা—শহীদের স্বভাব ও কর্ম বুঝতে হলে ওর এই প্রকৃতিটা মনে রাখা দরকার।

কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে বদলি হতে হল ঝিনেদায়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধব ও নিজের তৈরি পরিবেশ ছেড়ে ঝিনেদা যাওয়া। ঝিনেদা ওর জন্মের শহর, শৈশব বাল্য কৈশোর কেটেছে ঝিনেদায়। ও কবি হয়ে উঠেছে এই শহরেই, ওর সাধ ও স্বপ্ন গড়ে ওঠে এই শহরে। কলেজে এসে আমাদের সঙ্গে ঝিনেদার কথা যে খুব বলত তা নয়। আমাদের কলেজে ওর ঝিনেদার বন্ধু আরও কেউ–কেউ ছিল। এদের একজনকে তো ওর গল্পেই পেয়েছি। আর একজন লতাফত হোসেন জোয়ারদার—হাসিতে, উচ্ছ্বাসে, দুষ্টুমিতে চঞ্চল লতাফত পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়। শহীদের ভাবনায় নিশ্চয়ই ওর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল, ওর অলিখিত উপন্যাসে নিশ্চয়ই সে বেড়ে উঠেছিল নানাভাবে, উপন্যাসটি লেখা হলে লতাফত হয়তো ফের প্রাণ পেত।

তো একদিকে ঝিনেদা, ঝিনেদায় শহীদ তৈরি হয়েছে, শহরটি তাকে তৈরি করে তুলেছে। আর ঢাকায় এসে সে তৈরি করে নিয়েছে নিজেকে। তার শিল্পভাবনা পরিণত হয়েছে ঢাকায়, শিল্পস্বভাব বিকশিত হয়েছে নতুন মাত্রায়। ঢাকায় এসে শহীদ অর্জন করেছে শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই শহর তাকে দিয়েছে প্রেম, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নতুন বন্ধু, খ্যাতি, আরও খ্যাতির সম্ভাবনা, সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু শৈশবের আদুরে হাতছানি আর স্বনির্মিত, স্বোপার্জিত জীবনকে ধরে রাখার দায়িত্ব—এই দুটো তাকে ফেলে দেয় এক দোদুল্যমানতার ভেতর। পরিণত বয়সে ঝিনেদায় গিয়ে শহীদ নিশ্চয়ই ওর শৈশবের কোলে মুখ লুকোবার একটি সাধ গোপনে পোষণ করত। কিন্তু কোথায় সেই ঝিনেদা? নবগঙ্গা নদীর ওপর কচুরিপানা জমে শুধু নদীর পানি নয়, ওর শৈশবকেও ঢেকে ফেলেছে। সেই শহর এখন অন্য শহর, শহীদও এখন অন্য শহীদ। মানুষের মনোজগতের অন্ধকার কোণগুলোকে তদন্ত করে পাঠকের সামনে তাই আলোকিত করে তুলতে গিয়ে আলোর আগুনে নিজেই দগ্ধ হয়েছে। পরিণত বয়সে ঝিনেদা সেই ক্ষতস্থানে প্রলেপ বুলিয়ে দিতে অক্ষম। মানুষ বড় হয়, প্রকৃতির সঙ্গে মায়ের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা বাড়ে। ঝিনেদা শহীদকে কোল দেবে কী করে? এদিকে স্ত্রীপুত্রকন্যার শীতল ছায়াটিও নেই। এই অবস্থায় শহীদের স্থিতি নেই, কোথাও মন বসাতে পারে না। কবিতায় নানারকম বিষয় আসতে থাকে, কিন্তু সবই বড় অস্থির। এদিকে কর্মস্থলে মেলা ঝামেলা, ছোটবড় ক্লিক, ছোট শহরের নোংরা ঘোঁট—এসবের ভেতরে যাওয়া তার স্বভাবের বাইরে, কিন্তু ঝিনেদার অধিবাসী বলে এবং শহরটিকে তার সমস্ত সমাজ নিয়ে অনুভব করতে চায় বলে এসবকে এড়িয়ে চলাও তার পক্ষে অসম্ভব।

তার শিশুচরিত্র আঁকার মধ্যেও নিজের শৈশবকে উলটেপালটে দেখার ইচ্ছাটি স্পষ্ট। আবার মানুষের ভেতরকার ক্ষতবিক্ষত চেহারার ছাপও শিশুচরিত্রেও ফেলে যায় লেখকের নিজের অগোচরেই। একদিকে শিল্পচর্চার জন্য আশৈশব প্রস্তুতি নেওয়া, অন্যদিকে নিজের শিল্পকর্ম প্রকাশে শোচনীয় অনীহা, একদিকে জীবনে সুখ ও মহিমা অর্পণের তাগিদে প্রেম, স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্য গভীর ও তীব্র ভালোবাসা, অন্যদিকে প্রথম যৌবনের নষ্টনীড়–প্রবণতার গোপন ও প্রবল টান ; একদিকে মরীচিকাহীন মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ মানুষের নিশ্বাসে ঝলসানো বুক, অন্যদিকে গোরযাত্রীদের কাঁধে পুত্রবন্ধুর লাশ দেখে ছেলেকে টেনে নেওয়া মানুষের অনুসন্ধান—এইসব টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত শহীদ, চারদিকের ক্ষয়ে ক্ষুব্ধ শহীদ। ওর সারাজীবনের জীবনযাপন ও শিল্পচর্চা নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের দাগ। এই লড়াই শহীদকে ক্লান্ত করে তোলে। ক্ষোভকে ক্রোধে জ্বালিয়ে তুলতে পারলে এই শহীদই টাটকা

প্রাণে নতুন সৃষ্টিতে মগ্ন হতে পরত। তা তো হয়নি। তাই ক্ষুব্ধ ছেলেটি শেষ পর্যন্ত ক্লান্তপ্রাণ যুবক হয়ে কবিতার মধ্যে এলোমেলোভাবে নানা পথ খুঁজে বেড়ায়।

ক্লান্তিতে ঢুলে পড়লেও তাই পেছন হটে যায় না শহীদুর রহমান। ক্লান্ত শিল্পী যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে জেগে ওঠেন নতুন শক্তিতে। তাঁর যন্ত্রণা কোনোদিন দুঃখবিলাস ছিল না, তাকে তিনি পরিণত করতে চান কষ্ট-পাওয়া-মানুষের ঐক্যের সূত্রে। তাঁর একমাত্র বই তিনি উৎসর্গ করেন 'যন্ত্রণাকাতরদের উদ্দেশে'। এইভাবে তাঁর লেখায় তিনি অনেক মানুষের জন্য একটি ঠাঁই করে দেন।

শহীদুর রহমানের এই যে একবার প্রকাশ, আরেকবার প্রত্যাহার—এর মধ্যেও বেজে ওঠে তার পরম সাধ। সেটা হল সবার সঙ্গে যোগযোগ-স্থাপনের ইচ্ছা।

এসো আমরা কথোপকথন করি
এসো আমরা সোনার মতোন সন্ধ্যায় কথা বলি
আদিগন্ত মাঠকে সাক্ষী রেখে কথা বলি
খঞ্জনার প্রান্তর উজাড় ফসলী ক্ষেতকে সাক্ষী রেখে
কথা বলি— 'কথা বলি'।

কথা বলার সময় শহীদ সাক্ষী রাখেন নদীকে, রাখাল বালককে, গর্ভবতী গাভীকে, পাখিকে, মাছকে, ফুলকে। প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষকে এক জায়গায় এনে, সবার সঙ্গে সবার যোগযোগ-সাধনের ইচ্ছা জানিয়ে শহীদ বিদায় নেন। 'নক্ষত্রলোকে কথা বলি'—এই বাক্যটি বলে শহীদ চুপ করল। এখন তাঁর সঙ্গে আমরা যোগযোগ করি কী করে? তাঁর ডাকে সাড়া পায়নি বলে কি সবাইকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে শহীদ একবারে চুপ হয়ে গেল?

আসহাবউদ্দীন আহমদের ক্রোধ ও কৌতুক

সীমাহীন রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে বাঁশ সমাচার লিখেছি। লেখাটি যদি তোমাদের কাছে হিউমারাস বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের মনের ঘর থেকে বের হবার সময় আমার রাগ রঙীন শাড়ী পরে রাগিনী সেজে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছে আর তোমাদের চিত্তবিনোদন করেছে।

শানে নজুল : বাঁশ সমাচার। আসহাবউদ্দীন আহমদ।

আসহাবউদ্দীন আহমদের যাবতীয় রচনার উদ্দেশ্য একটিই—তা হল আমাদের সমাজব্যবস্থার ওপর তাঁর সীমাহীন অনাস্থা ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটানো। এই সমাজ-কাঠামো যে-রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, যে-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের অবাধে লুটপাট করার অধিকারকে গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করে কেবল অস্ত্রের খেলা দেখিয়ে বিদেশি মুরুব্বিদের জোরে দেশবাসীকে পায়ের নিচে রাখার ইন্ধন জোগায়, এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে যা ছেলেমেয়েদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের রক্তের আত্মীয়তা অস্বীকার করতে শেখায়, সম্পদের ঘোরতর অন্যায় ও ঘৃণ্য বিভাজনব্যবস্থার তৈরি করে—কোনোকিছুই তাঁর রাগী চোখের লাল সংকেত এড়াতে পারে না। তাঁর লক্ষ্য সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করা, এজন্য তিনি সমাজবাস্তবতা তুলে ধরার দায়িত্বে নিয়োজিত।

তাই মরিচ, পেঁয়াজ, তেল, নুন, শুঁটকি মাছ এবং কাঠ, খড়, বাঁশ থেকে কালি, কলম, কাগজের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি এবং এর পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদের দংশন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে লুটেরা বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি, ধর্মের নিশান উড়িয়ে ব্যাপক নরহত্যা ও নারীধর্ষণ—যা-কিছু মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে—সবই তাঁর লেখার উপাদান। উপাদান না-বলে প্রসঙ্গ বলাই ঠিক, এর কোনোটি তাঁর রচনায় একাগ্র মনোযোগ পায় না, এর কোনোটিকেই বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ তিনি দেন না বললেই চলে, বক্তব্যপ্রকাশের জন্য যখন যেটা দরকার তা-ই নিয়ে কথা বলতে তিনি ভালোবাসেন। তিনি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যান ; একটি প্রসঙ্গের নিটোল পরিসমাপ্তি ঘটাবার আগেই নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করার অস্থির তাগিদে যত তাড়াতাড়ি পারেন আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটানো তাঁর

রচনার প্রধান লক্ষণ বলে শনাক্ত করা যায়। সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করার এই পদ্ধতি লেখক হিসাবে তাঁকে বৈশিষ্ট্য অর্পণ করেছে।

যে-কোনো শিল্পীর কাজেই কোনো-না-কোনোভাবে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। যে-কলাকৈবল্যবাদী কবি সমাজবিমুখ বলে পরিচিত হওয়ার উৎসাহে কেবল প্রকরণ নিয়েও কালোয়াতি করেন, তাঁর ছন্দোবদ্ধ চরণসমূহে একটু খোঁড়াখুঁড়ি করলেই সমকালীন মানুষের অস্থিরতা, হতাশা ও আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন অনুভব করা যাবে। মানুষকে বাদ দিয়ে যিনি কেবল প্রকৃতির রূপ দেখতে মগ্ন, তিনিও মানুষের দীর্ঘদিনের যৌথ সৌন্দর্যচর্চার সামান্য একটুখানি প্রকাশ করে থাকেন। প্রকৃতি নিজে নিজে তেমন সুন্দর নয়, মানুষই তাকে তিলে তিলে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে কাজটি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করা, নির্লিপ্ত প্রকৃতিতে নিজের সুবিধায় ব্যবহার করা এবং এর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে বার করা কোনো বিচ্ছিন্ন কাণ্ড নয়। তবে আধুনিককালে শিল্পের মাধ্যমগুলোতে যাতায়াত অনেক প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট, তাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনাপন সেখানে ইচ্ছাপূরণের কোনো কেচ্ছা না-হয়ে সমাজবাস্তবতার ছবি হয়ে প্রকাশিত হয়।

কথাসাহিত্য ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের ভেতরের অবস্থাটিকে, সামানে নিয়ে এসে পাঠককে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। উপন্যাস কী গল্পে কী নাটকে এই বাস্তবতা প্রতিফলনের আধার হল চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা, স্বপ্ন এবং সর্বোপরি কাহিনীর বিন্যাস। নিটোল কাহিনী নিশ্চয়ই খুব জরুরি নয় : ছিমছাম গল্প বরং জীবনের প্রকৃত চেহারাটি খুলে ধরার চেয়ে তাকে আড়াল করে রাখার কাজেই লিপ্ত থাকে বেশি। তবে কাহিনীর একটি ধারাবাহিক বিন্যাস ছাড়া কোনোরকম বাস্তবতাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মানে দাঁড়াবার কাঠামো পায় না। এই বিন্যাস যে কালানুক্রমিক হতে হবে কিংবা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা থাকবে এর কোনো মানে নেই, কিন্তু যতই একাল-ওকাল বা এদেশ-ওদেশ করুক, মোটা একটি দাগের ভেতর লেখককে থাকতেই হয়, ঘরের ভেতর হাঁসফাঁস করলে লেখক মাঠে আসতে পারেন, কিন্তু মাঠের মাটি শক্ত হওয়া চাই, চোরাবালিতে পা ডুবে গেলে পাঠক দাঁড়াবে কোথায়? চোখে দেখা না-গেলেও বাস্তবতার হাজার উপাদান থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত হয় অদৃশ্য শূন্যতায় উড়াল দেয়, নইলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

আসহাবউদ্দীন আহমদ তাঁর বক্তব্যপ্রকাশের জন্য কথাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কোনো মাধ্যমের কাছে হাত পাতেননি। টুকরো টুকরো ঘটনাকে কাহিনীর বিন্যাসে তিনি গাঁথেন না, সিকোয়েন্সের আড়ালে থেকে কোনো ছবিকে সামনে ঠেলে দিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, কোনো চরিত্রকে নিজের মুখপাত্র হিসাবে নিয়োগের অভ্যাসও তাঁর নেই, তিনি নিজেই নিজের কথা বলেন। বর্তমান সমাজকাঠামোর ওপর তিনি কেবল ক্রুদ্ধ নন, এই কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ—এই লক্ষ্যে দীর্ঘকাল ধরে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর সংকল্প-বাস্তবায়নের পথ হল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই সত্যটি বিশ্বাস করে একই সঙ্গে রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন, সাংগঠনিক কাজ করতে করতে এবং লিখতে লিখতে এই বিশ্বাস তাঁর গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনি, দলের ভাঙচুর তাঁর বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। তাঁর অনেক সহকর্মীর মতো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের দিকে তিনি আসক্ত হননি, স্ট্র্যাটেজির ছদ্মবেশে রংবেরঙের আপোসের তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। লেখক হিসাবেও

অনেকের মতো নিজের বিশ্বাসকে শিথিল করে পাঠকের তরল মনোরঞ্জনে লিপ্ত হবার পথ তিনি পরিহার করে এসেছেন। বরং, রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাহিত্যচর্চার ফলে সমাজের প্রকৃত চিত্রটি তাঁর কাছে দিনদিন স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সমাজব্যবস্থার ভেতরের ফাঁকি ও শয়তানি, নৈরাজ্য ও অসামঞ্জস্য, শোষণ ও নির্যাতন এবং প্রতারণা ও বঞ্চনা তাঁর ক্রোধকে বরং আরও উসকে দিয়েছে, তিনি আরও তৎপর হয়ে উঠেছেন। ক্রোধ তাঁকে অস্থির করে তুলেছে, এতটাই অস্থির যে তা প্রকাশের লক্ষ্যে কাহিনীবিন্যাসের কোনো প্রক্রিয়া–অনুশীলন কিংবা নির্মাণের ধৈর্য তাঁর নেই। মনে হয়, এজন্যই কোনো প্রকরণের ভেতর খাপ খাওয়াবার চেষ্টা থেকে তিনি সবসময়েই বিরত ছিলেন।

আসহাবউদ্দীন আহমদ গল্প লেখেন না, বলা যায়, গল্প করেন। সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই তিনি পাঠককে শ্রোতা হিসাবে গণ্য করে আসছেন। শ্রোতাদের সবাই তাঁর চেনাজানা, বলতে গেলে, পাড়ার–লোক, কোনো নির্ধারিত সাহিত্যিক মাধ্যমের আড়ালে না–গিয়ে তাদের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেন। মূল লক্ষ্যটি ঠিক থাকে, যে–কোনো প্রসঙ্গ আসতে পারে, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ঝামেলা, অসুবিধা, দুর্ঘটনা থেকে বিপদ, সমস্যা ও সংকট সবকিছু নিয়েই তিনি অবিরাম কথা বলে চলেন।

আসহাবউদ্দীন আহমদ রম্যরচনা লেখেন না। রম্যরচনা যাঁরা লেখেন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ভালো কথা বলা এবং কায়দা করে কথা বলা। সোজা ও সাদামাটা কথাও তাঁরা এমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ করে বলেন যে, তার যে–কোনো জায়গা কোনো আসরে জুত করে চালিয়ে দেওয়ার আশায় কেউ–কেউ মুখস্থ করে রাখে। আসহাবউদ্দীন চাল–মারা–কথা বলেন না, কিংবা মিষ্টি মিষ্টি করে বানোয়াটি কথা লিখে জনপ্রিয়তা কামাই করা তাঁর কাজ নয়। তাঁর স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে, তাঁর যাবতীয় রচনাই এই বক্তব্য–প্রকাশের জন্যই রচিত। কথার ভঙ্গিও তাঁর অনেকটা রাজনৈতিক কর্মীর মতো, উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এবং লেখায় সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও দর্শনপাঠের গভীর অভিজ্ঞতার ছাপ থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যা কোথাও কাঁটার মতো বেঁধে না। মনে হয়, তিনি লোকালয় থেকে লোকালয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মজুর কলোনির মাথার বেঞ্চে চায়ের পেয়ালা হাতে, কোর্টের পেছনে ঝুলকালিধোঁয়ায় অন্ধকার খাবার দোকানে, মাঠের পাশে আইলে হাঁটু ভেঙে বসে, বিকালবেলা ভাঙাচোরা প্রাইমারি স্কুলের সামনে একচিলতে মাঠে হা–ডু–ডু খেলা দেখতে দেখতে, রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে পানির দামে জমি বিক্রি করতে আসা বন্যা বা খরাপীড়িত চাষাভুষাদের জটলায়, যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন কথা বলে চলেছেন, মুখে যেভাবে আসে সেভাবেই বলে যান, প্রকরণের আশ্রয় নেওয়ার দিকে পরোয়া করেন না। শুধু একটি বিষয়ে তিনি স্থির ও অবিচল, একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে তিনি সচেতন, তা হল কথার মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরা।

কোনো পরিচিত কাঠামোর ভেতর না–গিয়েও আসহাবউদ্দীন পাঠককে যে আকৃষ্ট করতে পারেন তার প্রধান কারণ তাঁর কৌতুক ও ব্যঙ্গ এবং হাস্যরস। তাঁর রচনা আগাগোড়া কৌতুক ও ব্যঙ্গরসে পূর্ণ। তাঁর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যেই হাস্যরস, প্রায় যাবতীয় কথাই তিনি হাসতে হাসতে বলতে পারেন, পাঠকও তাঁর সব কথা শোনে হাসতে হাসতে। যে–কোনো প্রসঙ্গই তাঁর ঠাট্টা এড়াতে পারে না, যা তাঁর অনুমোদন পায় না তা নিয়ে তিনি ঠাট্টা করেন, যা তাঁর কাছে বিরক্তিকর তাও ঠাট্টার বিষয়, আবার যে–ব্যবস্থা তাঁকে ক্রুদ্ধ

করে তোলে সেই ক্রোধপ্রকাশের উপায়ও তাঁর হাস্যরস। খুব নামকরা জনপ্রিয় রাজনীতিবিদের আচরণ তিনি এমন কৌতুকের সঙ্গে তুলে ধরেন যে, নেতার সমস্ত মাহাত্ম্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাঁদের নাম বা উপাধি বা বংশগত পদবির সঙ্গে তাঁদের আচরণের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নিয়ে শব্দের পান তৈরি করে বা বিশেষ বাক্যের বিন্যাস ঘটিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যে, কেবল তাঁদের নিজেদের আচরণ এবং উক্তির অসারতা প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। ক্ষমতাহীন হোক আর ক্ষমতার বাইরে হোক—দেশের রাজনীতি যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন—সেইসব নেতার উক্তি যেগুলো বাণী বলে প্রচারিত, আসহাবউদ্দীনের ঠাট্টার তোড়ে সেগুলো বাচালতা বলে প্রমাণিত হয়। এইসব নেতার ব্যক্তিগত দোষত্রুটি ও দুর্বলতাও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না, এই আক্রমণের মাধ্যম কিন্তু কৌতুক। রাষ্ট্র, সরকার, প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থা, পদ্ধতি এসব তো আছেই, এমনকী প্রসঙ্গ এলে, নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন না। এই ঠাট্টা কখনো কখনো উপহাসের ধার ঘেঁষে চলে। এটা কম কথা নয়; এটা বড় শিল্পীরই লক্ষণ, নিজেকে আর-একজন লোক হিসাবে দেখতে পারলেই নিজেকে এরকম উপহাস করা যায়। নিজেকে দেখার সময় লেখক পরিণত হন আর একটি মানুষে, তা হলেই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার শক্তি জোটে। বিজ্ঞানমনস্ক নিরাসক্ত দৃষ্টি শিল্পীকে এই বিরল স্বভাব অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

আসাহাবউদ্দীনের লেখায় কিন্তু এই নির্লিপ্ত স্বভাব ও নিরাসক্ত দৃষ্টি অনুপস্থিত। এই স্বভাব ও এই দৃষ্টি অর্জন করা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না, নিজের আবেগ ও প্রবণতাকে সরাসরি সামনে নিয়ে আসার অভ্যাস তিনি কখনোই বর্জন করেননি। তাঁর লেখা পড়লে রাজনৈতিক জীবন তো বটেই, তাঁর দৈনন্দিন তৎপরতা, প্রতিদিনের খুঁটিনাটি, আত্মীয়স্বজন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবই বেশ খোলাখুলি জানা যায়। স্থির ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ থাকায় এইসব প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই তাঁর তত্ত্ব বা পর্যবেক্ষণকে প্রমাণের অস্ত্র হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু যে-বিন্যাসের বলে এগুলো একটি অভিন্ন পটভূমি ও প্রেক্ষিত তৈরি করতে পারে তার অভাবে পাঠকের মধ্যে সামগ্রিক কোনো আবেদন সৃষ্টি না-করে কেবল একটুখানি সাড়া তুলেই হারিয়ে যায়। এটা শিল্পসৃষ্টির জন্য অনুকূল নয়। সমাজবাস্তবতার টুকরো টুকরো ছবি পাঠককে যদি বাস্তবের বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে না-পারে তো লেখকের পক্ষে লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব। আসহাবউদ্দীন আহমদের লেখায় এমনসব প্রসঙ্গ হঠাৎই এসে একটুখানি নাড়া দিয়ে উধাও হয়ে যায় যে, আফশোস হয় আরেকটু মনোযোগ এর প্রাপ্য ছিল, আরেকটু মনোযোগ পেলে তাঁর তত্ত্ব বা পর্যবেক্ষণের পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত হয়েই এর অবসান ঘটত না, বরং পাঠকের অনেক গভীর ভেতরে আবেদন সৃষ্টি করে লেখকের বক্তব্য উপলব্ধি করতে তাঁকে সাহায্য করত। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। লেখার অনেক জায়গায় আসহাবউদ্দীন আহমদ তাঁর আত্মগোপন করে থাকার কথা বলেছেন। যে-আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতি করেন তা কোনো সরকারের অনুমোদন পায়নি। এই বয়সে দেশত্যাগ না-করেও তাঁকে তিন-তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়েছে, এই তিন রাষ্ট্রে মেলা সরকারের উত্থানপতন ঘটেছে, রাষ্ট্রবদল ও সরকার-পরিবর্তনে কখনো কখনো রক্তপাতও কম হয়নি, কিন্তু লেখক ও তাঁর দলের রাজনীতি, প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি সরকারের অবাধ শোষণ ও নির্যাতনের পথে অন্তরায় বিবেচিত হওয়ায় তা সমূলে বিনাশের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম প্রায় অভিন্ন। তাই, যে-সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, লেখকের নামে হুলিয়া থাকতই। আত্মগোপন করে থাকার কোনো একসময়ে এক-একটি বাড়িতে বসে তিনি সন্ধ্যা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সারাদিন তাঁকে লুকিয়ে

থাকতে হয়, বেরুলে পুলিশ বা দালালজাতীয় কেউ শনাক্ত করে ফেলতে পারে। এদিকে বাইরে না-বেরুলে কাজ করবেন কী করে? অন্ধকার গাঢ় না-হলে বেরুতে পারেন না, ঘরে বসে অধীর আগ্রহে তিনি অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করেন। 'অন্ধকারের জন্য এই প্রতীক্ষা' একটি তাৎপর্যময় শিল্পকর্মের অংশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি আকস্মিকভাবে ছেঁটে ফেলেন। মানুষের জীবনে অন্ধকার ঘোচবার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন বলেই একজন রাজনৈতিক কর্মীকে একলা ঘরে বসে অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে—'এই আঁধার আলোর অধিক' পাঠককে এই উপলব্ধি পাইয়ে দেওয়ার কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেন না বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

আসহাবউদ্দীনের লেখায় প্রায়ই এই অস্থিরচিত্ত বিক্ষিপ্ত বিচরণ লক্ষ করা যায়। কোনো প্রসঙ্গই তাঁর লেখায় বেশি মনোযোগ পায় না। তাই শক্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংখ্যায়িত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ প্রসঙ্গকে সংক্ষিপ্ত স্কেচের আকারে তিনি পরিবেশন করেন, যথোচিত রক্তমাংস পাওয়ার আগেই সেগুলোকে তিনি ত্যাগ করেন। ফলে তাঁর শিল্পচর্চার উৎস সমাজব্যবস্থার ওপর প্রবলরকম ক্রোধ শিখা হয়ে জ্বলে ওঠবার সুযোগ পায় না। তাঁর ক্রোধের প্রকাশ কৌতুক ও ঠাট্টায়, কিন্তু হাসির গল্প লেখা তো তাঁর লক্ষ্য নয়, পাঠককে হাসতে হাসতে তার জন্য অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত অবস্থানের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করা আসহাবউদ্দীনের দার্শনিক ভাবনা ও রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার আদায় করা কোনোদিন সম্ভব নয়। তিনি জানেন, বিপ্লব কোনো শৌখিন এমব্রয়ডারি করা নয় কিংবা এসো ভাই একটুখানি বিপ্লব করি এই গান ধরে স্ফীতকায় বুর্জোয়া দলের পায়াভারি করা মানে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখার কারসাজি। তিনি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে যে-রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে জড়িত তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিপ্লবের পক্ষে মানুষের অসন্তোষ ও ক্ষোভকে ক্রোধে প্রজ্বলিত করা। লেখাতেও তিনি সবকিছু নিয়ে কৌতুক করেন নিজের ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যই।

কিন্তু, এই কৌতুক আসহাবউদ্দীনের লেখায় প্রায় এতটা তরল হয়ে পড়ে যে ক্রোধের চেহারা চেনা প্রায় কঠিন। হাসতে হাসতে পাঠক যদি এলিয়ে পড়ে তো তাকে সোজা করে দাঁড় করানোটা কি সহজ কাজ? কিংবা কোনো রাজনীতির অসার বা প্রতিক্রিয়াশীল বা লুটপাটের পদ্ধতি প্রতিপন্ন করার কাজ যদি কয়েকজন অসৎ, কপট ও দালাল নেতাদের ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তো পাঠক ঐসব নেতাকে ধিক্কার দিয়েই ক্ষান্ত হবে, ঐ রাজনীতিকে প্রতিহত করতে রুদ্র হয়ে উঠবেন না। এই কারণে তাঁর ক্রোধ খুব দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং ব্যঙ্গ কৌতুক তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করলেও আসহাবউদ্দীনের শিল্পচর্চার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে এ নিয়ে সন্দেহ থাকে বইকী।

আসহাবউদ্দীন আমাদের চিরতরুণ লেখকদের অন্যতম। সত্তর পেরিয়েও তিনি স্মৃতিচারণ করতে শুরু করেননি, এখনও তাঁর চোখ সামনের দিকে। সমকালীন সংকটে তিনি উদ্বিগ্ন, ভবিষ্যৎকে সংকটমুক্ত করার পথ-অনুসন্ধানে তাঁর মনোযোগ নিরঙ্কুশ। ব্যঙ্গ কৌতুক তাঁর বক্তব্য প্রকাশের হাতিয়ার, তাঁর বল ও উদ্যম থেকে নিঃসন্দেহ হতে পারি : এই হাতিয়ারে কোনোদিন মরচে পড়বে না। তাই তাঁর কাছে সঙ্গতভাবেই এই দাবি করা যায় : কেবল হাস্যরসে আপ্লুত না-করে তাঁর এই হাতিয়ার মানুষের ক্ষোভকে ক্রোধে প্রজ্বলিত করে তুলুক।

কৌতুকে ক্রোধের শক্তি

একটি চিঠিকে ধরে ১৪টি শিরোনামে ১৫টি লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আসহাবউদ্দীন আহমদের *দাম শাসন দেশ শাসন*। মোট ৮০ পৃষ্ঠার বই, এর মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছে কত বিচিত্র ব্যাপার। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঘোরতর অসঙ্গতি, আমাদের দেশে শিক্ষিত পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া সমাজে সামন্ত মনোভাবের দাপট, বিত্ত ও ভোগের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতরকার মস্ত ফারাক, বিদ্যাচর্চায় অনুরাগের ক্রমবর্ধমান অভাব, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের নামে সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে পা দেওয়া, পুলিশের হাতের ভেতর থেকে রাজনৈতিক কর্মীর পালিয়ে যাওয়া, বড় রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার আঁচল ধরে পাতি-নেতাদের সিংহাসনে আরোহণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দাঙ্গা রোখার সংকল্প—সবই ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে রোগা বইটার দুই মলাটের মধ্যে। এত সব ব্যাপার, পড়তে কিন্তু, হাঁসফাঁস লাগে না, সদালাপী লেখক গল্প করতে করতে সবাইকে ধরে রাখেন। এই কাজটি তিনি এমনভাবে করেন যে, পাঠকের মনে হয় সে শুধু কথা শুনছে না, বরং সমান মর্যাদার সঙ্গে আলাপে যোগ দিচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য যতই মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে যেতে থাকে, দেশের সরকারের ব্যর্থতা ততই প্রকট হতে থাকে। দামের বাড়াবাড়ি হলে সরকার মুখ থুবড়ে পড়েও যায়। ব্যাপারটা জানে না কে? এরকম ঘটনা আমরা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। কিন্তু, বিষয়টি তাৎপর্য পায় যখন আসহাবউদ্দীন আহমদ একজন নিরক্ষর মুচির পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরেন তাঁর নিজের ভাষায়। আসহাবউদ্দীন আহমদ বরাবরই শেকসপিয়রের ভক্ত, যে-কোনো প্রসঙ্গে শেকসপিয়রের যথাযথ ব্যবহারে তাঁর জুড়ি নেই। বইয়ের নাম-রচনাটিতে *জুলিয়াস সিজারে* মুচির সংলাপ এবং তাঁর নিজের পরিচিত বাঙালি মুচির প্যাচাল-পাড়াকে একটি অভিন্ন মাত্রায় এনে তাঁর বক্তব্যকে এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন যে, পাঠক লেখকসুদ্ধ প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেন। নিরক্ষর নিম্নবিত্ত মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম থেকে যে-উপলব্ধি অর্জন করেন তার অকপট ও সরল প্রকাশের ভেতর লেখক দার্শনিকের প্রজ্ঞা লক্ষ করেন। আসহাবউদ্দীন আহমদ একজন বিদ্বান লোক, দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু বিদ্যা তাঁর রচনায় কাঁটার মতো বেঁধে না, পাণ্ডিত্য তাঁর

কাণ্ডজ্ঞানকে এতটুকু পণ্ড করতে পারেনি। বই-পড়া-চোখ দিয়ে তিনি মানুষকে দেখেন না, বরং চোখের সামনে যা ঘটে বইয়ের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে তবে ঐ পড়া বইয়ের যথার্থতা বিবেচনা করেন। তাই, তত্ত্ব তাঁর লেখায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে উপচে ওঠে না, বরং প্রতিদিনকার জীবনযাপনের ভেতর যা দেখেন তা-ই এমন শাদাসিধাভাবে বলেন যে, পাঠক টেরই পায় না যে, তত্ত্বটি কীভাবে তাঁর ভেতরে একেবারে গেঁথে গিয়েছে। যেমন 'ফুটপাত ইজ নট হেডপাত' লেখাটিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘোরতর অসঙ্গতি এমন ঘটনার ভেতর দিয়ে দেখেন যে সারথ্রাইজের গল্পের মতো পাঠক চমকে ওঠে না; কিন্তু লেখকের সঙ্গে একই ভাবে অনুভব করে যে, এটা কেমন দেশ যেখানে কাউকে তার ভিটেমাটিসুদ্ধ উচ্ছেদ করাটা কোনো অন্যায় কাজ নয়, আর পথচারীদের জন্য তৈরি ফুটপাথে মাথা পেতে শোয়াটা হল ঘোরতর বেআইনি কাজ?

পুঁজিবাদের খোঁড়া বিকাশের সঙ্গে উদ্ভুত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের স্বভাবে সামন্ত মনোভাব কী রকম দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে আসহাবউদ্দীন আহমদ আমাদের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন ঐ শ্রেণীর লোকদের সময়জ্ঞানশূন্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার কথা বলে। লেখাটি পড়তে পড়তে এর শিরোনামে 'হাতঘড়ি খুলে ফেলুন' বলে যে ধমক দেওয়া হয়েছে তা খুবই উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। এর পরের লেখাটি 'তওবা তওবা'। এখানে একজন পরহেজগার ও গোঁড়া বৃদ্ধ মুসলমানের কথা বলা হয়েছে যিনি অসুস্থ হয়ে শহরের একটি হাসপাতালে আসতে বাধ্য হয়েছেন। রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাস থেকে মহিলা-নার্সের সেবা তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন এবং এমনকী তাদের সঙ্গে—এইসব বেগানা আওরতের সঙ্গে একই ছাদের নিচে থাকাটাও গুনার কাজ বিবেচনা করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান। লেখক এখানে সামন্ত মানসিকতার সঙ্গে পুঁজিবাদের সংঘাতের কথা সরাসরিভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই লেখাটির একটি ছোটগল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ছোটগল্পের কাঠামোর ভেতর থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি ভালোবাসেন গল্প করতে। গল্প করার এই ভঙ্গিটিকে ছোটগল্পে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকে গল্পকাররা একটু মনোযোগ দিতে পারেন।

এরকম আরেকটি লেখার নাম 'জমিহীনের জমির ক্ষুধা'। এখানেও ছোটগল্পের ছায়া হঠাৎ ঠাহর করা যায়। নিজের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভিখারি-বনে-যাওয়া একজন সর্বহারাকে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি অনেক চেষ্টা তদবির করে হয়তো সরকারি ব্যবস্থায় খানিকটা চিকিৎসার সুযোগ করে দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জমিহীনকে খাস জমি বরাদ্দ করা? কক্ষনো নয়। সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনকী, প্রাদেশিক পরিষদের মাননীয় সদস্য মনেপ্রাণে চাইলেও তা হওয়ার জো নেই। আসহাবউদ্দীন আহমদ স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেন, চলতি সমাজব্যবস্থায় সূর্য পূর্বদিকে না-উঠে পশ্চিম দিকে উঠতে পারে, শিলা জলে ভাসতে পারে, মাদার গাছে কাঁঠাল ধরতে পারে, কিন্তু ভূমিহীন কোনোদিন জমি পেতে পারে না। এর জন্য দরকার বিপ্লবী নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টি থেকে আসবে না। আসবে শোষিত শ্রেণীর পার্টি থেকে। এই শেষ কয়েকটি বাক্য পাঠক না-পড়লেও লেখকের গল্প করার ভঙ্গিতেই কিন্তু তাঁর ক্ষোভ ও সংকল্প গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন।

সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক আপাত-বিপর্যয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল—এই সত্যটিকে যথাযথ অনুভব করে আসহাবউদ্দীন আহমদ চীনের বর্তমান নেতাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের গণতন্ত্রের নামে তথাকথিত জানালা খোলার নীতির ফল শুভ হতে পারে না। এই জানালা দিয়ে মুক্ত বাতাস আসবে না, যা আসবে তা হল পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের দূষিত নিশ্বাস। মৌলবাদের বিশ্বব্যাপী অভ্যুত্থান যে কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং সমাজতন্ত্রবিরোধী এই চক্রান্তেরই একটি অংশ এই বিষয়েও তাঁর সন্দেহ নেই তা জানিয়ে দিয়েছেন একটি চিঠিতে। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ধিক্কার জানান 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন' নামে লেখাটিতে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আসন ঠিক রাখার জন্য কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার শরণাপন্ন হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু শিরোনামটি বিভ্রান্তিকর। এই 'অধম তুমি'টা কে? তাদের সঙ্গে তিনি উত্তম হবেন কেন? ধর্মের উন্মাদনায় যারা নরবলিযজ্ঞে মত্ত হয়, বানোয়াট দেবতার বানোয়াটতর জন্মস্থান আবিষ্কার করে যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতায় উন্মাদ করতে চায় কোটি কোটি মানুষকে তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করে এদেশের কোন অপশক্তি? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঐসব তৎপরতায় এখানে উৎসাহিত হয় তারাই যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নরহত্যাযজ্ঞের সহায়ক চাকরবাকর, নারীধর্ষণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পিম্প এবং লক্ষ লক্ষ গৃহে অগ্নিসংযোগের মচ্ছবে ঐ সেনাবাহিনীর আগুনবরদার। ভারতীয় মৌলবাদী ও বর্ণবাদী চক্রান্ত এবং বাঙালি মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ চক্রান্ত হল সাম্রাজ্যবাদের দুই জারজ সন্তান। ইতর এই জানোয়ারদের কারও সঙ্গেই উত্তম ব্যবহার করার কোনো কারণ নেই। নিজ নিজ দেশে এরা কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ের বিপক্ষ শক্তি নয়, এরা গোটা দেশবাসীর এক নম্বর শত্রু। এদের যে-কাউকে ক্ষমা করা মানে সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্ত করা। আসহাবউদ্দীন আহমদের আলোচ্য লেখায় দুই দেশের মৌলবাদী ধর্মান্ধ ইতরগোষ্ঠী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা না-থাকার জন্যই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট রয়ে যায়।

বইটিতে সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি খুব প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে 'এঁটো' নামে লেখাটিতে। সমাজচেতনার সঙ্গে শিল্পক্ষমতার সামঞ্জস্য ঘটায় এখানে লেখকের অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নিয়ম হল মানুষ খাবে গোশত। কুকুর খাবে হাড্ডি। প্রকৃতি কুকুরের দাঁতগুলোকে সেভাবে তৈরি করেছে'। কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে যে, মানুষেরই একটি অংশ 'ভোজ উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ফেলে-দেয়া হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে'। এই কুৎসিত দৃশ্য দেখে লেখকের বমি-বমি ভাব হয়। পড়ে প্রবল বিবমিষা হয় পাঠকেরও। যে-শক্তি কাউকে কাউকে গোশত খাওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং অনেককে সেই গোশতের এঁটোহাড্ডি চিবুতে বাধ্য করে সেই সমাজব্যবস্থাকে সজোরে উগরে দেওয়ার বিবমিষায় পাঠক দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। ঠাট্টা ও বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আসহাবউদ্দীন আহমদ একটু নিচু স্বরেই যে-ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তার ধাক্কা কিন্তু প্রবল। বেশ শক্ত।

জতুগৃহে দিনযাপন

মাস কয়েক পর রাবেয়া একটি সন্তান জন্ম দেবে। সে যেমন ছেলে—বা মেয়ে—আমার পরিচয় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, বড়ো হবে, বেঁচে থাকবে, আমিও তেমনি ভুল পরিচয় নিয়ে হাজার মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবো, ভুল পরিচয় নিয়ে একদিন মরে যাবো।

নায়কের এই তেতো উপলব্ধি দিয়ে শেষ হয় কায়েস আহমেদের প্রথম উপন্যাস *নির্বাসিত একজন*।

কাহিনী নায়কের বাল্যকাল থেকে শুরু, সে একটি ব্যক্তিতে পরিণত হতে হতে নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত একটি ধারণায় পৌছলে উপন্যাস থামে। একটি লোকের বড় হওয়ার গল্প, তা ভদ্রলোকের আদুরে ছেলের নুটুপুটু করে গড়িয়ে চলার কেচ্ছা নয়, চারপাশের প্রায় কিছুই তার পক্ষে নেই, সময়টা তার ওপর চটা। হাতাহাতি করতে করতে তাকে চলতে হয় ; কখনো খুঁড়িয়ে, কখনো দৌড়ে, কখনো লাফিয়ে চলার রক্তাক্ত পায়ের ছাপ বইটির পাতায়-পাতায়।

দাঙ্গার খবর নিয়ে গল্পের শুরু। এই অশুভ সংবাদটি উপন্যাসের বেশি জায়গা জুড়ে নেই, কিন্তু একজন অল্পবয়েসি তরুণের চোখে পাড়া-প্রতিবেশীর হাতে মায়ের নিহত হওয়া এবং ছোট বোনের সম্ভ্রমহানি সংক্ষেপে এতটাই উৎকট হয়ে উঠেছে যে দাঙ্গার উৎস স্বাধীনতা ও দেশভাগকে অর্থহীন করে তোলার জন্য তা-ই যথেষ্ট। স্বাধীনতার কল্যাণে খোকা নিজদেশে পরবাসী হয়ে যায়, তখন তার কাছে স্বাধীনতার চেয়ে অবাঞ্ছিত ঘটনা আর কী হতে পারে?

দাঙ্গা এই উপন্যাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দাঙ্গাই প্রধান চরিত্রকে প্রথমে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, এই প্ররোচনা পরিণত হয় তারই পরিচিত অন্য সম্প্রদায়ের এক মানুষের হত্যাকাণ্ডে। দাঙ্গার ধাক্কা তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়ে সে চলে যেতে বাধ্য হয় পাশের নতুন দেশে, তার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাপন করুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

প্রধান চরিত্র নিজেই তার পদেপদে কাঁটাখচিত জীবনের কাহিনী বর্ণনা করে।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়—অতীত, বর্তমান, সেদিন ও এদিনকার সব ছবি ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে দোলে। এক মুহূর্তে সে চলে যায় শৈশবে, বাল্যকালে, কৈশোরে ; আবার দুলতে দুলতে চলে আসে নিকট–অতীত ও বর্তমানে।

না, সুখে সে কোনোদিনই কাটায়নি, কেবল বাল্যকালের একটি সংক্ষিপ্ত সময় ছাড়া। যখন তার বড়ভাই একটি মিলে কাজ পাওয়ার পর তাদের ঘরে একটুখানি সচ্ছলতা দেখা দিয়েছিল। 'অক্ষম বাপের শুয়ে শুয়ে খিস্তি খেউর, মার কাটা কাটা জবাব নোংরা লাগতো'। কিন্তু তবু 'বাপ শুয়ে শুয়েই ছোট নুরীকে পাশে বসিয়ে নরম গলায় কথা বলছে, নুরী এন্তার বকর বকর করছে, মালসায় কুড়ো ছেনে মা উঠোনে দাঁড়িয়ে মুরগিদের ডাকছে, আ তি তি তি–ই, আমি রকে পাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হোমটাস্ক করছি, বড়োভাই ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজার করে ফিরলো'। নিম্নমধ্যবিত্তের সুখের খুব স্টিরিওটাইপ ছবি, একটু ক্লিশে মনে হতে পারে। কিন্তু গরিব লোকজনের সুখের বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে কোথায়? এই সুখ যথারীতি হাওয়া হয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই সুখের উৎস সেই বড়ভাই বাড়ির সঙ্গে যোগযোগ বন্ধ করে দেয়। তার বদলে তাকে ধরতে আসে পুলিশ। বড়ভাই যোগ দিয়েছিল শ্রমিকদের দাবি–আদায়ের আন্দোলনে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে চাকরি তো চাকরি, বড়ভাইকে প্রাণটি পর্যন্ত হারাতে হয় মিল–মালিকের লেলিয়ে–দেওয়া–গুণ্ডার হাতে।

বড়ভাইয়ের এই মৃত্যুকে গৌরব দেওয়ার জন্য নায়ক বা লেখক—কারও তেমন সক্রিয় উদ্যোগ নেই। তার আন্দোলনকে এরা সমর্থন করে কি না সে–তথ্যটিও অলিখিত রয়েছে। কিন্তু তার হত্যাকাণ্ডের শাদামাটা মন্তব্যহীন বর্ণনাতেও তার গৌরব জ্বলে উঠেছে। তবে উপন্যাসের কাহিনী জুড়ে তা আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

এর কারণ দুর্বলচিত্ত নায়কের অব্যাহত গ্লানিবোধ। সে কোনো কাপুরুষ চরিত্র নয় ; তবে নিজের ইচ্ছা বা কামনাকে তৃপ্ত করার জন্য তার অনীহা। এই অনীহা কোনো সক্রিয় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নয়, তার ভয় থেকেও এটা আসেনি, এসেছে অহরহ মার–খাওয়া–জীবনের ম্যাচিওরিটি থেকে। তার ধারণা, জীবনের যাবতীয় সুখ ও আনন্দ তার নাগালের বাইরে, সেসব ঠিক তার জন্য নয়। বিপিন নাহার মেয়ে তাপসীর সাঁওতালি ছাঁদের তাগড়া গতর তাকে যতই আকর্ষণ করুক, ছেলেটি ধরেই নিয়েছে যে এসব ঝামেলায় যাওয়া তার পোষাবে না।

এরকম একটি ছেলে হয়তো একদিন বিয়ে থা করে সংসার করত, মায়ের পছন্দ–করা কোনো মামাতো বোন কী ফুপাতো বোনকে বিয়ে করে, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, বোনের বিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য ও কষ্টে, সুখে দুঃখে জীবনযাপন করতে তাকে বারণ করত কে?

কিন্তু, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার সঙ্গী দাঙ্গা তাকে ওলটপালট করে দেয়। গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করার স্পৃহা তার ছিল না, মায়ের প্রাণ, বোনের ইজ্জতরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার ক্ষমতার নিদারুণ অভাব তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানসিক প্রতিক্রিয়া এড়ানোও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। দাঙ্গার প্রবল প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলতে সে ছুটে যায় রেললাইনের ধারে। সেখানকার প্রধান স্মৃতি, 'ওখানে নীলমণি ডাক্তারের ছেলে রেলে জান দিয়েছিলো'। নীলমণি ডাক্তারের ছেলেই তখন তার নিরাময়ের ওষুধ, একমাত্র ঐ ওষুধই তাকে বাঁচাতে পারে মায়ের হত্যা ও বোনের অপহরণের ধাক্কা থেকে।

শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা তার আর করা হয় না। একটি নাটকীয় ঘটনায় সে অজিতকে খুন করে। ঘটনাটি নাটকীয়, কিন্তু উটকো নয়, বরং এই খুন করে সে নিজে যেমন বাঁচে, উপন্যাসটিও বাঁচে একটি ঘটনার ঘনঘটা থেকে। এটা একটা হত্যা, নিখাদ হত্যা, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হত্যা নয়, বরং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ বলে একে সমর্থন করা চলে। এখানে কায়েস আহমেদ প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, হৈচৈ বা বাড়াবাড়ি না-করে ঘটনাটির তাৎপর্য নিয়ে পাঠককে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন।

এই সংযম কিন্তু পরে আর রক্ষা করা যায়নি। নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি থেকে তাকে চলে যেতে হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু কথাটিতে তার আপত্তি। উদ্বাস্তু বলে পরিচিত হতে সে প্রত্যাখ্যান করে, তার স্বভাবের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া মেলে না। তার মনে হয়, এর নামই কি স্বাধীনতা? রিফ্যুজি হবার স্বাধীনতা? এত বছর পরেও মানুষকে রিফ্যুজি বানাবার জন্য এপারে ওপারে কারা কলকাঠি নাড়ে? লোকটির এই মনেমনে বক্তৃতা ঝাড়া তার স্বভাব উপচে উঠেছে। যেভাবে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে তাতে এই ধরনের সাজানো গোছানো বুদ্ধিজীবী-মার্কা বানোয়াট ডায়লগ তার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। মিল-মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে বড়ভাইয়ের হত্যা, দাঙ্গায় মায়ের মৃত্যু, বোনের অপহরণ, দগ্ধ বাড়িঘর---এসব কোনো জায়গাতেই তার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ এরকম বেসামাল ও স্যাঁতসেঁতে হয়নি। ফলে তার স্বভাব যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমনি তাঁর বেদনা ও শোকও গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে কায়েস আহমেদ চরিত্রটির বুকের বিট বড় বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতটাই বাড়িয়েছেন যতটা বাড়লে মানুষ হার্টফেল না-করলেও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারে।

এখানে এসে উপন্যাসটি পক্ষাঘাতের রোগীর মতো এলিয়ে পড়ে। যে-ঋজু ও মেদহীন নির্বিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত কাহিনী ছুটে ছুটে এগুচ্ছিল তা হাঁটতে থাকে পা টেনে টেনে। হঠাৎই লেখক তার চরিত্রের ওপর একগাদা বোঝা চাপিয়ে দেন, কিন্তু তা জাস্টিফাই করার চেষ্টা না-করে দুর্বল করে ফেলেন।

যুক্তি একটা দাঁড় করানো যায়, তা হল এই যে নতুন দেশে এসে লোকটি থিতু হয়ে নিশ্বাসই ফেলতে পারল না। কিন্তু তা মেনে নিই কীভাবে? তার যৌবন পরিণতি পায় এই নতুন দেশেই। নানারকম পেশা এবং বৈরী পরিবেশ কি তাকে আরও পরিণত মানুষে রূপান্তরিত করবে না?

কায়েস আহমেদ তাকে সেই অধিকারটি দেননি। অথচ আমরা তো তাঁর কাছ থেকে শুনেছি যে, বাঁচার তাগিদে মানুষের সংগ্রামে সে এক কাতারে চলে এসেছিল। না-হলে 'মিছিলে স্লোগানে ডগোমগো হয়ে রাস্তায়' নামবে কেন? 'কার্ফ্যু, গুলি আর রক্তের ভেতর দিয়ে' 'হাজার মানুষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে' গেল। কিন্তু তার ঐ টিকে যাওয়াটি পাঠকের মধ্যে টিকিয়ে রাখার জন্য যে-যৌক্তিকতা দরকার তা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। ঘটনা না-বাড়ালেও চলত, কিন্তু বিশ্লেষণ এবং চরিত্রের বিকাশে লেখকের আরেকটু পর্যবেক্ষণের দরকার ছিল।

গল্পের শেষে প্রধান চরিত্র জানতে পারে যে তার নববিবাহিত স্ত্রী বিয়ের আগে থেকেই অন্তঃসত্ত্বা, তখন তার সঙ্গে এই মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার সহকর্মীর উৎসাহের কারণও স্পষ্ট হয়। সহকর্মীর অভিভাবকসুলভ ভালোবাসার আড়ালে সহানুভূতিহীন ও কপট

পরিচয় পেয়ে তার নিজের যথার্থ ও সঠিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও লোকটি গভীরভাবে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এই সংকটের মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি।

সংকট মানুষকে অসহায় করে ফেলে কিংবা নতুন করে জীবন শুরু করতে প্রেরণা জোগায়। এখানে তা হয়নি। সংকটটি নায়ককে একটি উপলব্ধি দান করে যা তার জীবনযাপনের পদ্ধতি বা স্বভাবের সঙ্গে বেমানান। লোকটি একটি পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, ফলে তার পরবর্তী সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠকের আগ্রহ ওখানেই শেষ হয়। পাঠকের আর কোনো জিজ্ঞাসা বা অস্বস্তি থাকে না, গল্প সম্বন্ধে সব জেনে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। একটি নিটোল কাহিনী রচনা করার দিকে কায়েস আহমেদের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে এবং এদিক থেকে তিনি গড়পড়তা উপন্যাসের রীতিই অনুসরণ করেছেন। এই ফর্মুলা অনুসারে কাহিনীর একটি চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে, বোঝাই যায় যে চরিত্র এখন থেকে এই নিয়ম অনুসারে চলবে। রূপকথার এই ফর্মুলাই বাঙলা উপন্যাসের একটি বিরাট অংশ জুড়ে দাপট চালাচ্ছে আজ একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে। *নির্বাসিত একজন* পড়ে মনে হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক মোটামুটি ছকে-বাঁধা-কাহিনী বর্ণনার প্রবণতা কায়েস আহমেদের পরবর্তী লেখায় অব্যাহত থাকবে, এই ব্যাপারে তিনি চতুর দক্ষতা অর্জন করবেন এবং একজন জনপ্রিয় লেখক হিসাবে পাঠককে আঠার মতো ধরে রাখবেন এবং তাঁর উপন্যাস পাঠ শেষ করে পাঠক স্বস্তিতে তৃপ্তিতে পা এলিয়ে দেবেন। তাঁর পরিণতি তা হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় এবং এখন পর্যন্ত শেষ উপন্যাস *দিনযাপন* পড়তে গেলে কায়েস আহমেদের বিকাশ দেখে পাঠককে বেশ বিস্মিত হতে হয়। এখানে তাঁর প্রায় আয়ত্তাধীন গল্প বলার নিরাপদ রীতিটি তিনি বর্জন করেছেন। প্রকরণের নতুনত্ব এখানে বড় কথা নয়, প্রকরণের নতুনত্ব এসেছে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের তীব্র স্পৃহা থেকে।

দিনযাপন কিন্তু কায়েস আহমেদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, দুই উপন্যাসের মাঝখানে লেখা একটি গল্প 'জগদ্দল' তার সাক্ষী। একই মলাটের ভেতর নির্বাসিত একজন ও 'জগদ্দল'-এর সহ-অবস্থানের কারণ রোগা বইটির শরীরে মাংস যোগ করা ছাড়া আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, একটি মিল গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পরে বইকী! উপন্যাসটিতে আমাদের দেশের ১ নম্বর স্বাধীনতা এবং তার সঙ্গী দাঙ্গার দক্ষযজ্ঞের বিবরণ দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে—এবং 'জগদ্দলে' ২ নম্বর স্বাধীনতার তুমুল নৈরাজ্যের ছবি। কিন্তু কী গল্প বলার রীতি, কী দৃষ্টিভঙ্গি, কী চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক—সব ব্যাপারেই দুটি লেখায় লেখকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেহারা পাওয়া যায়।

'জগদ্দল' গল্পে কায়েস আহমেদের স্যাঁতসেঁতে প্রকাশ অনেকটা ঝরে পড়েছে। কোনো চরিত্রের প্রতি তরল ভালোবাসা লেখাটিকে কোথাও এলিয়ে পড়তে দেয় না। গল্পের জায়গা হল শ্মশানঘাট, সময় কালীপূজার রাত্রি। পোস্তাগোলা শ্মশানটি ঐ রাত্রের মদে, মাংসে, পূজায়, নাচে, আরতিতে, পুলিশে, মাতালে, বাখোয়াজিতে, স্মৃতিচারণে এক বর্ণাঢ্য ও ভয়ংকর জায়গায় পরিণত হয়েছে। এখানে অল্প পরিসরেই বেশ কয়েকটি চরিত্র দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু এর ফলে কারও শরীরের কোনো অংশের অনুচিত ছাঁটাই হয়নি। অনেকের হয়তো মনে আছে যে ধর্মনিরপেক্ষতার ডঙ্কা পেটানো স্বাধীনতার পর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি শহরে প্রায় ঘড়ি ধরে একই সঙ্গে পূজামণ্ডপে প্রতিমা ভাঙা হয়। 'জগদ্দল' গল্পে দেখি, ঐ ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে একজন

বুড়োমানুষ উদ্ভট রাজনৈতিক তত্ত্ব ঝাড়ছে। এইসব রাজনীতিহীন রাজনৈতিক গালগল্পে সবচেয়ে উগ্র ছিল বায়বীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব। সেই সময়কে শনাক্ত করার জন্য ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে কায়েস আহমেদ সফল হয়েছেন। এই বাখোয়াজির পাশাপাশি আরেকটি দৃশ্য রয়েছে চিতায় এক বুড়োহাবড়ার মড়া পোড়ানো হচ্ছে, পাশে মদের গ্লাস হাতে জুত করে বসেছে মাঝবয়েসি একজন লোক। এদের সম্বন্ধে তথ্য যা দেওয়া হয়েছে তাতে বুঝতে পারি যে পরচর্চা করে, সন্ধেবেলা চপ কাটলেট ও একটু রাত হলে মদ খেয়ে এদের সময় কাটে। এদের এই নিয়মিত ও আপাত-নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন আসলে এদের নিজেদের ও গল্পের অন্তঃশীল তরঙ্গকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ঢাকের প্রকট আওয়াজ, মাতালদের চাপাবাজি এবং সর্বোপরি শ্রী শ্রী কালীমাতা ও মায়ের দুলে দুলে ওঠা খাঁড়া পরিবেশটিকে বীভৎস করে তোলার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই নিয়ে কায়েস আহমেদ কোনোকিছু সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেননি। এই লোভ সামলানো কিন্তু শক্ত। কেবল শিল্পীর পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব। রহস্যময়তা না-থাকায় চরিত্রগুলোর চেহারা স্পষ্ট আকার পায় এবং বুঝতে পারি যে তাদের কেউই আমাদের অপরিচিত নয়। এদের দৌড় যে কতদূর তাও ধরতে বেগ পেতে হয় না। এরা শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা কোনো ব্যক্তি থাকে না, তাদের সামাজিক আদলটিই ফুটে ওঠে।

যে-যুবসম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ নিজেদের জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি নরখাদক সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছে, স্বাধীনতার পর লুম্পেন চরিত্রের মানুষের হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভার পড়লে সেই যুবকদের মধ্যে যে-প্রবলরকম অস্থিরতা, ক্ষোভ এবং এর পরিণামে চরম হতাশার সৃষ্টি হয় তাকে তেতো করে দেখানো হয়েছে এই গল্পে। ঐ সময়ের বাস্তবতা কিন্তু এখনও অব্যাহত রয়েছে। এর ওপরকার দৃশ্যটি হল লুটপাট ছিনতাই, একবার উগ্র জাতীয়তাবাদী হুঙ্কার, আরেকবার ধর্মান্ধদের ঘেউঘেউ। কিন্তু ভেতরকার সত্যটি হল এই, সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে যাদের রুখে দাঁড়াবার কথা তারা নিদারুণভাবে পঙ্গু ও নপুংসক। তাদের মাতলামি, মস্তানি ছাপিয়ে উঠেছে এই অক্ষমতা কয়েকজন যুবকের সংলাপে :

—আমরা গাড়ি হাইজ্যাক করুম।
—পারবি না।
—ব্যাংক লুট করুম।
—পারবি না।
—মাইয়া হাইজ্যাক করুম।
—পারবি না।
দীপকের গলা চড়ে যায় : চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ুম।
—পারবি না।
ভূপেন ঢুলতে ঢুলতেই হাসে, বলে, হাত মারুম।
—পারবি, কিন্তু এইখানে না, লোকজনে দেখবে।

এখানে বলা দরকার যে, এরা যে ব্যাংক লুট কিংবা গাড়ি বা মেয়েমানুষ হাইজ্যাক করে না তা নয় কিন্তু। এরাই গাড়ি হাইজ্যাক করে, মেয়েমানুষ হাইজ্যাক করে, ব্যাংক লুট করে, পিস্তলের মুখে চাঁদা আদায় করে। কিন্তু বন্ধ ঘরে হস্তমৈথুন করার মতো ঐ

কাজগুলোও কোনো সকর্মক ক্রিয়া নয়, ঐসবের মধ্যে পৌরুষ তো নেইই, কোনো উদ্যোগও নেই। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ঐসব কাজ করে না ; স্বপ্নহীন, ভবিষ্যৎ-বঞ্চিত যুবকের শরীরের স্বাভাবিক তেজ আর কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে?

নদীর ওপার থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দে বোঝা যায়, কেউ-না-কেউ কারোর হাতে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু এ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো ন্যূনতম শক্তিও কারও নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় এই যে তারা কিছুই করতে পারে না। এখানে এক সুযোগে লেখক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বেশ একটু শ্লেষ করেন। ব্যাপারটা হঠাৎ বললেও গল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক। কারণ, নপুংসক যুবকদের সঙ্গে তাদের অনেকের চরিত্র ও কার্যকলাপের চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে।

গল্পের শেষ দৃশ্যে কালীমূর্তির সামনে পার্থ নামে ছেলেটির নাচ গল্পটিকে একটি সংহত বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছে। পার্থর সামনে শ্রী শ্রী কালীমাতা প্রাণলাভ করে, তার হাতে বাবার ছিন্নমুণ্ড দেখে পার্থ কিন্তু ভয় পায় না। বীভৎস, নৃশংস ও অবাঞ্ছিত এই রূপটিকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়ে এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার সামনে পুরোহিতের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃশ্যটি সামাজিক অক্ষমতা ও পরাজয়কে প্রকট করে তুলেছে। কিন্তু গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন পুরোহিত মশায়ের জন্য বরাদ্দ করা হলেও কায়েস আহমেদের হাতে অনেক বেশি তাৎপর্য পেয়েছে পার্থর বিদ্রোহ। পার্থ শেষ পর্যন্ত পড়ে গেছে, তার ঠোঁটের কষে ফেনা জমেছে—তাতে কিছু এসে যায় না। বলা যায় না, সে হয়তো মরেও যেতে পারে, কিন্তু পুরোহিতের মতো পরাজিত হয়নি। মুমূর্ষু ও অক্ষম সমাজের অনেক ভেতরকার, গভীর ভেতরকার শক্তি হয়তো তার নাচের মুদ্রায় একটুখানি ঝিলিক দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিয়ে গেল।

এই ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত হল *দিনযাপন* উপন্যাসের নায়ক। ঢাকা শহরের পুরনো এলাকার একটি পুরনো নড়বড়ে বাড়িই আসলে এর প্রধান চরিত্র। বাড়িটিতে অনেকগুলো পরিবারের বাস। নিবারণ উত্তরাধিকারসূত্রে এই বাড়ির মালিক, তার ঠাকুরদাদা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সম্পদশালী হয়েছিল। পূর্বপুরুষের উপার্জিত বাড়ির ভাড়া থেকে নিবারণ সংসার চালায় এবং বেশ নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ধর্মচর্চা করে। ঠাকুরকে পাওয়ার জন্য লোকটি একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের চরিত্র অনেকগুলো, তাদের সমস্যা ঠিক একই না-হলেও প্রায় একই রকমের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সবাই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণে একধরনের হীনম্মন্যতার শিকার। উপন্যাসের নায়ক হিসাবে কাউকেই শনাক্ত করা যায় না, কোনো একক মানুষ কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা তো দূরের কথা, আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো ক্ষমতাও অর্জন করে না। বাড়ির মালিক নিবারণ বড়লোকের নির্বিরোধ ও নির্বোধ সন্তান হিসাবে প্রধান চরিত্র হতে পারত, কিন্তু মধ্যবিত্তসমাজ তো নয়ই, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরও কোনো সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা তার সাধ্যের বাইরে।

নিশিকান্ত নামে যে-লোকটি সাধনা ঔষধালয়ের একটি ব্রাঞ্চে কাজ করে রাজনীতির আলোচনায় উৎসাহী হয়েও রাজনীতির ওপর তার এতটুকু আস্থা নেই। এ-লোকটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তকেই প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনীতি নিয়ে কথা বলা এবং

বর্তমান রাজনীতি নিয়ে হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করা এখনকার মধ্যবিত্তের একটি বড় প্রবণতা। কিন্তু এ-লোকটির তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ভূমিকা নেই। কায়েস আহমেদ এর জন্য একটু বেশি জায়গা বরাদ্দ করেছেন, এমনকী অন্য আরও কয়েকটি চরিত্রের প্রাপ্য জায়গা ছেঁটে অনাবশ্যকভাবে একে বেশি সময় দিয়েছেন। এতে কিন্তু তার গুরুত্ব বাড়েনি, বরং লোকটি একটি টাইপ-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের একটি মানুষের সঙ্গে কায়েস আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 'জগদ্দল' গল্পে। তার নাম ছিল বিষ্ণুপদ। তাই যৌবনকালের ডাকসাঁইটে রাজনীতিবিদদের নিয়ে তার গর্বের আর শেষ ছিল না, একধরনের কাঁচা আঞ্চলিকতাবাদকে জাতীয়তাবাদের মর্যাদা দিয়ে সে উপমহাদেশের যাবতীয় ঘটনা বিশ্লেষণ করত। প্রায় সবসময় এইসব নিয়ে কথা বলার জন্য বিষ্ণুপদ ঐ গল্পের কয়েকটি যুবকের কাছে বিরক্তিকর চরিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনকার মধ্যবিত্তের প্রবীণ অংশের বায়বীয় জাতীয়তাবাদটিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে লোকটিকে কায়েস প্রয়োজনীয় পরিসর দিয়েছিলেন। কিন্তু *দিনযাপন* উপন্যাসে নিশিকান্ত নাম দিয়ে সে হাজির হল এবং কেবল একই রকম কথা বলতে বলতে তার কোনো সহ-চরিত্রের বিরক্তি উৎপাদন না-করলেও পাঠক তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

চিন্তাহরণ মেডিক্যাল স্টোরের সেলসম্যান কালীনাথের স্বল্পকালীন উপস্থিতি এবং প্রায় অস্তিত্বহীনতা কিন্তু কাহিনীর গতিতে কোনো বাধা নয়। তার স্বভাব, তার প্রতি স্ত্রীপুত্রের নীরব ও সরব অবহেলা ও ঘৃণা মধ্যবিত্ত মানুষের একটি খণ্ডাংশকে তুলে ধরে—যা কিনা তার সামগ্রিক শরীরনির্মাণে অপরিহার্য।

দিনযাপন-এ আলাদা ধরনের মানুষ হল শামসু মিয়া। মদের দোকানের মালিক নরহরির স্কুলজীবনের বন্ধু সে, শুঁড়িখানায় ঢুকেই খিস্তি ঝাড়ে, সবাইকে নিয়ে জমিয়ে মদ খায়, হল্লোড় করে, ছেলেবুড়োর বাছবিচার করে না—এই লোকটি *দিনযাপন*-এর দম-বন্ধ-হওয়া ভ্যাপসা বাড়ির খোলা হাওয়া। না, নির্মল হাওয়া নয়, তবু নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ একটা পাওয়া যায়। লোকটি নিশ্চয়ই অসৎ—হয়তো কালোবাজারি, হয়তো মাল গুদামজাত করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়, হয়তো সরকারি দলে গুণ্ডা সাপ্লাই করে। কিন্তু বিত্তের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পোশাক, রুচি, কথাবার্তা থেকে তার যে-সাংস্কৃতিক স্তরের পরিচয় পাই তাতে তাকে মধ্যবিত্তের পর্যায়ে ফেলা যায় না। মধ্যবিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত ব্যক্তি এই বইয়ের নায়ক বলে অমধ্যবিত্ত শামসু মিয়াকে একটি জরুরি চরিত্র বলে বিবেচনা করি। লোকটির রুচিতে যে স্থূলতা ও অশ্লীলতা তা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। ফলে অন্যদের রক্তহীন পানসে ও অসহায় রুগ্ণতা আরও বেশি করে চোখে পড়ে।

হ্যাঁ, আরও কয়েকজন আছে যাদের কেউ-কেউ ঐ নড়বড়ে বাড়ির বাসিন্দা নয় বা বাসিন্দা হলেও একটু আলাদা ধরনের। স্ত্রীর ভাষায় 'মোচিবিলাই' স্বল্পবাক কালীনাথের বাচাল ছেলে সুকুমার, তার বন্ধু শম্ভু, শাজাহান এবং ওস্তাদ মস্তান নান্টু—এরা হল যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের বেতমিজ চেহারা। বেতমিজ কিন্তু বিদ্রোহী নয়। বিদ্রোহী কী, বেয়াদব বললেও এদের আস্কারা দেওয়া হয়। মেয়েদের নিয়ে খিস্তি আউড়ে, মদের দোকানে কারও সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুত্বের সুযোগ নিয়ে তার ওপর হাম্বিতাম্বি করে, অন্ধকার রাস্তায় নিরীহ লোকদের ছুরি দেখিয়ে সর্বস্ব লুট করে, নিরস্ত্র মানুষের সামনে কায়দা করে কোমরে-গোঁজা-পিস্তল দেখিয়ে এরা *দিনযাপন* উপন্যাসে যা করেছে এবং

এখন আরও বেশি ডোজে করছে তা হিজড়েদের পাছাদোলানো যুদ্ধের নাচ দেখানোর থেকে আলাদা কিছু নয়। এদের উচ্চাভিলাষী ও সংগঠিত অংশের নাম সেনাবাহিনী।

দিনযাপন-এর যে-চরিত্রটি লেখকের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ অর্জন করে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হল মনোতোষ। মনোতোষ স্কুলের শিক্ষক এবং রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তার আস্থা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে এবং সে বিশ্বাস করে যে আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে ঐ আদর্শ অনুসারে। এই নরক-মার্কা বাড়ির অধিবাসী হয়েও তার জগৎ অনেকটা বড় ও প্রসারিত। মনোতোষের সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে দেশের উপযুক্ত ও যথার্থ ভবিষ্যৎ। পার্টির জন্য সে অনেকটা সময় দেয়, সুযোগ পেলেই নিজের রাজনৈতিক আদর্শের কথা একে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

মনোতোষ কিন্তু তাই বলে সেইসব নাবালক উপন্যাসের আদর্শবাদী নায়ক নয়, তার ওপর স্যাঁতসেঁতে কথাবার্তা কী বীরত্বব্যঞ্জক কাজকর্ম চাপিয়ে লেখক তাকে মস্ত বড় একটা কাঠের পুতুল গড়েননি। মধ্যবিত্তমূলক দুর্বলতাকে সে কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে এবং স্ত্রীর মধ্যবিত্ত সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করাও তার পক্ষে অসম্ভব। ঐ বাড়ির কালীনাথ, নৃপেন, হারাধন, বাসুদেব ও নিশিকান্তের মতো এক কামরাতেই তার বসবাস। তবু জয়ার রুচি এদের থেকে আলাদা। তার ঘরে অল্প কয়েকটি শৌখিন আসবাব, ছিমছাম গৃহিণী জয়ার চেয়ার-টেবিলে সূচিকর্ম করা শাদা কাপড়ের ঢাকনা। তো সমাজতন্ত্রের বিপ্লব তো ঠিক সূচিকর্ম নয়, মনোতোষের রাজনীতিও শেষ পর্যন্ত কোনো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। বৌয়ের সাধ-আহ্লাদ শুধু নয়, নিজেও আরেকটু আয়েস চায় বলেই মনোতোষ মেলা পরিশ্রম করে একটা ইনকাম করে। রাজনীতিতে নিজের অজ্ঞাতেই তাকে আপোস করতে হয়। রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির নামে দলের নির্দেশে একসঙ্গে চলতে হয় তাদের সঙ্গে রাজনীতিতে যারা একেবারেই মধ্যবিত্ত, যাদের হাতিয়ারের নাম জাতীয়তাবাদ। ঘরে জয়ার আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর স্বভাব, আর বাইরে কী? যাদের সঙ্গে মনোতোষের দল গাঁটছড়া বাঁধার লোভে ছুটছে তারাও আলাদা-আলাদাভাবে, কেবলি নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে ওপরে ওঠার দৌড়ে নেমেছে। এই দৌড়ে নামবার পর চক্ষুলজ্জা বলে কোনো বস্তু বাকি থাকে না, নিজে বা বড়জোর নিজের বৌস্বামীছেলেমেয়ে ছাড়া সবাই অবলুপ্ত হয়। তখন ছিমছাম রুচির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে লোভ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ফুঁড়ে মাথাচাড়া দেয় মালপানি কবজা করার দুর্দান্ত লালসা।

ঘরে ও বাইরে, সংসারে ও রাজনীতিতে আপোস করে চলতে চলতে মনোতোষ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটায়, গ্রামের অভিজ্ঞতা এই অস্বস্তিকে পরিণত করে রীতিমতো যন্ত্রণায়। এই ব্যাপারটি হঠাৎ হয়নি, হঠাৎ কোনো ঘটনা বা দৃশ্যে মনোতোষ রাতারাতি অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ল না। ঘরে আপোস করা তাকে বরাবরই অস্বস্তির মধ্যে রেখেছিল, জয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মানসিক টানাপোড়েন তার ছিলই। রাজনীতিতে উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও এটা চাপা থাকেনি।

এই ব্যাপারটি মনোতোষের জন্য একটুও সুখের নয়, কিন্তু তার অস্বস্তির খবর দিয়ে কায়েস আহমেদ একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছেন। ঘরে-বাইরে, সংসারে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাজার আপোস করতে হলেও এটা মনোতোষের স্বভাবে পরিণত হয়নি, এ নিয়ে তার ক্ষোভ রয়েছে। এই ক্ষোভ কি একদিন তাকে আপোসমূলক মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য করতে পারবে না?

এতসব সত্ত্বেও মনোতোষ কিন্তু *দিনযাপন* উপন্যাসের নায়ক নয়। গোটা মধ্যবিত্তের একটি স্বভাব তার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আলাদাভাবে সে কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে না, লেখক তাকে সেরকম গুরুত্বও দিতে চাননি। বইয়ের সর্বশেষ দৃশ্য তার প্রমাণ।

শেষ দৃশ্যটি ভয়াবহ ও কুৎসিত। এটা হল স্ত্রী সর্বাণীর সঙ্গে মাতাল বাসুদেবের যৌনসঙ্গমের আয়োজন। শুধু বাসুদেব বা সর্বাণী নয়, ঐ বাড়ির সমস্ত মানুষ কায়েস আহমেদের হাতের হ্যাঁচকা টানে ইতরশ্রেণীর জীবে পরিণত হয়েছে, তাদের আর মানুষ বলে চেনাবার উপায় নেই। পড়তে পড়তে পাঠক গ্লানিবোধ করতে পারেন, কিন্তু এখানেই কায়েসের সাফল্য। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত যে মানুষ নামধারণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে—এই পরম সত্যটিকে ঘোষণা করে কায়েস যে-সততার পরিচয় দেন তাতেই তিনি শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

তবে, এই সত্যটি কায়েস আহমেদ নিজেও উপভোগ করেন না, সত্যটি উপলব্ধি করে তিনি একেবারেই সুখ পান না। তাই গোটা উপন্যাসে তাঁর অস্থিরতা বড় প্রকট, মাঝে মাঝে আপত্তিকর। কোনো চরিত্রের প্রতি তিনি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেন না, যে-পরিমাণ রক্তমাংস তাদের দেহের জন্য দরকার তা সরবরাহ করতে লেখকের আপত্তি বা অনীহা উপন্যাসের সংহতিতে বিঘ্নিত করেছে। নিজের উপলব্ধিকে জানাবার জন্য তাঁর একটি তাড়াহুড়ো ভাব রয়েছে, ফলে এক্কেকটি চরিত্রের স্কেচ এঁকেই তিনি ক্ষান্ত হন, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ দেখাবার জন্য ধৈর্য ধরার মতো অবসর তিনি পান না।

অথচ, তাঁর সততা সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। এই সততার বলেই কায়েস আহমেদ কাহিনীর নামে কেচ্ছা বয়ান করার লোভ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম উপন্যাসের গল্প বলার যে-প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে, কাঁচা হলেও তা অব্যাহত থাকলে এখানে এসে পরিণতি লাভ করতে পারত। এই বইতে যে-শক্তির পরিচয় পাই, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ঐ প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করলে মসৃণ ও গতানুগতিক কাহিনী কেঁদে তিনি বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হতেন। গড়পড়তা সাফল্যের ঐ নিরাপদ ও সুনিশ্চিত পথ পরিহার করতে পারাটা তাঁর সততা ও শক্তিরই পরিচয়। অনেক দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও কায়েস আহমেদ নায়ক-বর্জিত, ছিমছাম গল্পোমুক্ত একটি ভাষাচলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সততা ও শক্তির অধিকারী বলেই জীবনের জয়গান করার জন্য ইচ্ছাপূরণের নাবালক বাণী ছাড়ার পথ তিনি অনায়াসে পরিহার করতে পেরেছেন। অথচ, বইয়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে ক্ষয়িষ্ণু বাড়িটির আসন্ন মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে খুব স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের সাহায্যে।

এই পরিচ্ছেদে বালিহাঁসের একট দল, একটি ছুঁচো, অসুস্থ নিশিকান্ত এবং একটি প্যাঁচার চার রকম কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই চার ধরনের জীবজন্তুর ভেতরে নিশিকান্ত ছাড়া আর সবাই এই বাড়িতে এবং এই উপন্যাসে কেবল নতুন আগন্তুক নয়, রীতিমতো অবাঞ্ছিত। অবাঞ্ছিত জীবজন্তুর কার্যকলাপ, যথাক্রমে মালার মতো উড়ে যাওয়া, উঠানের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া এবং মাথা ঘুরিয়ে একটি শব্দের উৎস সন্ধান করা—সবগুলোই আপত্তিকর। এই ঘটনাগুলো উটকো, উপন্যাসের শরীরে মিশে যেতে পারেনি।

মারিবার হ'লো তার সাধ

কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লে তার সাধ ...

আটবছর আগে একদিন (।)

জীবনানন্দ দাশ

না, ফাল্গুনের এখন ঢের দেরি। বসন্তকালের রাত্রি অন্ধকার নয়, তখন ঘোরতর বিকাল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ দিন যতক্ষণ পারে চড়া রোদ ঝেড়েছে আকাশ জুড়ে। পবিত্র ঈদের একদিন পর কোরবানির পবিত্রতর গোরুখাসির রক্ত দীননাথ সেন রোডের এখানে ওখানে শুকিয়ে কালচে হয়ে এসেছে, নিহত জীবজন্তুর বর্জ্য ছড়ানো রয়েছে সতীশ সরকার রোডের আগাগোড়া, তার গন্ধে চারদিকে দম-বন্ধ-করা গরম বাতাস। এরই মধ্যে তিনতলা বাড়ির ছোট ফ্ল্যাটে লোহার দরজা ও কাচের জানালা আটকে দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে নিজের গলাটা টাইট করে বেঁধে সটান ঝুলে পড়লেন কায়েস আহমেদ। বাইরে তখন অন্ধকারে শেষ নিশ্বাসটা টেনে নেওয়ার সুযোগ কায়েস নিলেন না।

কায়েস আহমেদের আত্মহত্যার খবর এতদিনে সারা দেশে প্রচারিত হয়ে গেছে। তবে কায়েস জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না, তাঁর পরিচিতিও কম, তাঁকে নিয়ে চারদিকে খুব একটা উচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কায়েস আহমেদের আগ্রহী পাঠকদের বেশির ভাগই সব নতুন লেখক। নিজেরা লেখেন, কষ্টেসৃষ্টে পয়সা জোগাড় করে পত্রিকা বার করেন এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উপেক্ষা গ্রাহ্য না-করে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন, কায়েসের এই আকস্মিক মৃত্যুতে একটু শূন্যতা বোধ করবেন তাঁরা। তাঁর মতো উদ্বেগ ও অস্বস্তি নিয়ে, যন্ত্রণা ও সততা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন কেবল নতুন লেখকরা। প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ লেখকের কাছে লেখাটা হল অভ্যাস মাত্র—চাকরিবাকরি আর ব্যবসাবাণিজ্য আর দেশপ্রেমের ঠেলা সামলাতে এনজিও বানিয়ে মালপানি কামাবার সঙ্গে তখন এর কোনো ফারাক থাকে না। তখন লেখায় নিজের সুখ আর বেদনা জানান দেওয়াটা হয়ে দাঁড়ায় তেল মারা আর পরচর্চার শামিল। লেখক হিসাবে সেই সামাজিক দাপট

কায়েসের শেষ পর্যন্ত জোটেনি। তাই, কেবল মানুষের খুঁত ধরে আর দুর্বলতা চটকে সাহিত্যসৃষ্টির নামে পরচর্চা করার কাজটি তাঁর স্বভাবের বাইরেই রয়ে গেল। আবার 'এই দুনিয়ার সকল ভালো/আসল ভালো নকল ভালো ...' এই ভেজাল সুখে গদগদ হয়ে ঘরবাড়ি, পাড়া, গ্রাম, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইহকাল ও পরকাল সবকিছুতেই তৃপ্তির উদ্গার শুনিয়ে মধ্যবিত্ত পাঠকদের তেল মারার কাজেও তিনি নিয়োজিত হননি।

কায়েস আহমেদ সবসময় ছিলেন নতুন লেখক। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন নতুন লেখকের প্রেরণা ও কষ্ট এবং নতুন লেখকের আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প নিয়ে। যা দেখতেন তা-ই তাঁর কাছে নতুন। চারপাশের সবকিছুই তাঁর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা চাই। তাঁর দেখা তো স্রেফ অবলোকন নয়, এই দেখার প্রতিশব্দ হল পর্যবেক্ষণ। তাও হল না, অভিধান যা-ই বলুক, তাঁর দেখা মানে অনুসন্ধান। তাঁর জিজ্ঞাসার আর শেষ ছিল না, যতবার দেখেছেন ততবারই শুরু করেছেন ফের শুরু থেকে। তাই মেধা ও শক্তির অমিত সম্ভাবনা তিনি যা দেখিয়ে গেছেন তার বিকাশ ঘটিয়ে যাননি। অথচ কায়েস তো অল্পদিন লেখেননি, রোগা রোগা ৪টে বই বেরিয়েছে, কিন্তু হলে কী হবে সবগুলো বই থেকেও নিটোল একটি কায়েস আহমেদকে শনাক্ত করা কঠিন। তাঁর লেখা কেবলি কাঁপছে, কোথাও তাঁকে থামতে দেখি না। থিতু হয়ে নিজের অনুসন্ধানকে ধীরেসুস্থে বলবেন—সেই সময় তাঁর কই? প্রথম বইতেই দেখি, গল্প বলার, জমিয়ে গল্প বলার একটি রীতি তিনি প্রায় রপ্ত করে ফেলেছেন। আভাস পাওয়া যায় এই রীতিটিই দাঁড়িয়ে যাবে একটি পরিণত ভঙ্গিতে, পাঠককে সেঁটে রাখার জাদু তিনি ঠিক আয়ত্ত করে ফেলবেন। কিন্তু না, একটি রীতিতে মকশো করার লেখক তিনি নন। পরের বইতেই নিজের রীতিকে, রপ্ত কিংবা প্রায়-রপ্ত রীতিকে, অবলীলায় ঠেলে কায়েস পা বাড়িয়েছেন নতুন রাস্তার দিকে। তাঁর এইসব কাণ্ড কিন্তু আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের গভীর ভেতরটাকে খুঁড়ে দেখার তাগিদেই একটির পর একটি রাস্তায় তাঁর ক্লান্তিহীন পদসঞ্চার। তাঁর পায়ের নিচে অবিরাম ভূমিকম্প, এই পথেই তাঁর ছুটে চলা। একটি পথ পাড়ি দিয়ে তিনি আর পেছনে ফিরে তাকান না। আবার শান্ত, সন্তুষ্ট ও নিস্তরঙ্গ সমতলও তাঁকে কখনো কাছে টানে না। যা সাধারণ, যা নিরাপদ, যা আয়ত্তের ভেতর তার দিকে কায়েসের ঝোঁক নেই। চারটি বই তাই তাঁর নতুন, একটির থেকে আরেকটি যত-না উত্তরণ তার চেয়ে অনেক বেশি আলাদা।

কোনো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত থাকা কায়েস আহমেদের ধাতে ছিল না, নিশ্চিত জীবনযাপনের সম্ভাবনাকে পর্যন্ত বিনাশ করতে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যাপার জানি—বাংলায় অনার্স নিয়ে ভরতি হবার পর খুব ভালো ফল করার সব লক্ষণই তিনি দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কিংবা বলা যায় ঐ কারণেই বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিলেন। দেশভাগের পর বাবামায়ের কোলে করে এখানে চলে আসেন, তিনি একটু বড় হতে বাবামাভাই গ্রামে ফিরে গেলেন। তিনি কিন্তু গেলেন না, জুবিলি স্কুলে পড়তেন, রয়ে গেলেন মামার সঙ্গে। ঐটুকু ছেলে, বাবামায়ের সঙ্গে থাকার নিরাপত্তা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করলেন। মামার সঙ্গে একটি পারিবারিক পরিবেশে বাস করার ছেলেও তিনি নন, স্কুলের দরজা পেরিয়েই থাকতে লাগলেন একা, সম্পূর্ণ একা, চললেন নিজের রোজগারে। সকাল সন্ধ্যা প্রাইভেট টুইশনি করে নিজের খাওয়া-পরা ও লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন, কারও কাছে কখনো হাত পাতেননি। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর

থেকে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছিলেন, স্বাধীনতার পরও একটি দৈনিকে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কাগজেই তাঁর ভালো লাগেনি। কোনো জায়গাতেই আপোস করার মানুষ তিনি নন। পেশা হিসাবে কায়েসের প্রিয় ছিল শিক্ষকতা। ১৯৮০ সালে ঢাকার একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুল তাঁকে যেচে চাকরি দেয়। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন, ছেলেমেয়েরাও তাঁকে খুব ভালবাসত, সহকর্মীদের সম্মানও পেয়েছিলেন। ডিগ্রির অভাবে সেখানে কর্মচ্যুত হওয়ার ভয় ছিল বইকী! বন্ধুদের অনুরোধেও ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে বসলেন না। অনিশ্চিত অবস্থাই তাঁর কাম্য, একটু উদ্বেগ না-থাকলে তিনি বাঁচবেন কী করে? শেষ কয়েক বছর আর্থিক অনটন ছিল নিদারুণ। কিন্তু স্কুলে কাজ নেওয়ার পর হাজার চাপ সত্ত্বেও প্রাইভেট টুইশানি করলেন না।

১৯৬৯ সালে কায়েসের বাবার মৃত্যু হল তাঁদের গ্রামে। ঐ সময় বাড়ি যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু পার্সপোর্ট করতে গিয়ে দেখা গেল তিনি যে পাকিস্তানের নাগরিক তার কোনো প্রমাণ নেই—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার দশা। যেতে পারলেন না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গেলেন, ঐ বছর বেশ অনেকটা সময় কাটিয়েছেন নিজের গ্রামে মায়ের সঙ্গে। মনে হয়, একটু বড় হওয়ার পর থেকে ঐ কয়েকটা দিন তিনি শীতল ছায়ায় কাটিয়েছেন। কিন্তু মায়ের ভালোবাসার ছায়ায় থাকা তাঁর কি পোষায়? যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই কায়েস ঢাকায় ফিরে এলেন, নিজের গ্রামে আর কোনোদিন যাননি। বড়তাজপুর গ্রামে তাঁদের পুরনো নোনাধরা বাড়ির খিড়কির দুয়ারে শেফালি গাছের নিচে মোড়া পেতে বসে ছেলের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের চোখে ছানি পড়ে গেল। এই দৃশ্যটা মনে হলেই কায়েস বড্ড অস্থির হয়ে পড়তেন। কিন্তু এই অস্থিরতা ও উদ্বেগ তিনি বরং মেনে নেবেন, কিন্তু গ্রামে গিয়ে কটা দিন মায়ের আঁচলের নিচে থেকে চোখজোড়া ভরে ঘুমিয়ে আসার চিন্তাও তাঁর স্বভাবের বাইরে।

কায়েসের বাড়ি পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রামে, তিনি ঐ গ্রামের বিখ্যাত শেখ পরিবারের ছেলে। বিশিষ্ট লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আত্মীয়দের মধ্যে ঢাকায় যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, নানা ক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না। একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা কায়েসের একটি লেখায় কয়েকটি চরিত্রে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের আভাস পেয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, এর লেখক তাঁদের বড়তাজপুর গ্রামের এমনকী তাঁদের পরিবারেরই কেউ না-হয়ে যায় না। অভিভূত হয়ে তিনি লেখকের খোঁজ করেছিলেন। কী করে কী করে কায়েস তা জানতেও পারেন। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। কেন? কাউকে এড়িয়ে চলার মানুষ তো তিনি নন! তবে? নিজের গ্রামে, পরিত্যক্ত গ্রামে, ছেলেবেলাকে নস্টালজিয়ার ভেতর সমীচীন মনে করেছেন। তাকে হাতের নাগালে এনে সেখানে আশ্রয় নেওয়া মানেই তো সব বেদনার অবসান। সেইসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রক্তাক্ত হওয়ার শিহরন বরং তাঁকে নতুন নতুন অনুভূতির সন্ধান দিতে পারে। নিজের এখনকার সত্তার মতো নিজের একালে ও নিজের সেকালে খোঁড়াখুঁড়ি করা হল তাঁর অনুসন্ধানের পদ্ধতি। মানুষ নিয়ে যে-জিজ্ঞাসা তাঁকে এক লেখা থেকে আরেক লেখায়, এক রীতি থেকে আরেক রীতিতে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল তার জবাব খোঁজার জন্য নিজেকে উলটেপালটে দেখলেও তিনি পেছপা হননি। কায়েসের বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিলই না, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের

কথাতেও কর্ণপাত করলেন না। এখানে জিজ্ঞাসা এসেছে বিশ্বাসের চেহারা নিয়ে, তা হল এই : প্রেম দিয়ে স্ত্রীর দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি নিরাময় করতে পারবে না কেন? প্রায় দশটি বছর ধরে স্ত্রীর সেবা করলেন, ভালোবেসে গেলেন কিশোর প্রেমিকের মতো, যত্ন করলেন মায়ের হাত দিয়ে, আগলে রাখলেন বাপের চোখ দিয়ে। কিন্তু স্ত্রীর ঝাপসা, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ও সুখ তিনি শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারলেন না, হৃদয় ও বিজ্ঞানের শোচনীয় ব্যর্থতার একটু দমে গিয়েছিলেন বইকী! কিন্তু এই ভয়ংকর ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যেও কায়েস তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেই গেছেন।

কারও কাছে কায়েস কোনো অভিযোগ করেননি, করুণা নিতে তাঁর ঘৃণা হত, সহানুভূতি তাঁর কাছে করুণারই ছদ্মবেশমাত্র। জীবনকে বোঝার জন্য, মানুষের রহস্য জানার জন্য যে-অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া চালান তার প্রধান মিডিয়াম ছিলেন তিনি নিজে। এজন্য চড়া দামও দিতে হয়েছে তাঁকে। আর্থিক অনটন, উত্তেজনা ও উদ্বেগ—সবই বহন করতে হয়েছে একা একা। শেষ মুহূর্তে যা করলেন তারও প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজে। আত্মহত্যার মধ্যে কায়েস কী জানতে চাইলেন? মানুষের জীবনের রহস্য খুঁজতে খুঁজতে নিজের জীবনভর অনুসন্ধানের চরম জবাবটি পাওয়ার জন্যই কি মরিবার হল তাঁর সাধ? মানুষের রহস্যময়তা ভেদ করতে না-পেরে, তিনি কি পরম জিজ্ঞাসাটি ছুড়ে দিলেন প্রকৃতির দিকে? কায়েসের কোনো সাধ আর সাধ থাকে না, তাঁর সব সাধই রূপ নেয় সংকল্পে। তাঁর সংকল্প আর জিজ্ঞাসা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। কায়েস আহমেদের আত্মহত্যা কি তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা অব্যাহত রাখার শেষ সংকল্প?

প্রসঙ্গ : সূর্য দীঘল বাড়ী

সূর্য দীঘল বাড়ী আমাদের চলচ্চিত্রে একচ্ছত্র দাপটে প্রতিষ্ঠিত ন্যাকা, ছ্যাবলা ও নকলবাজে গিজগিজ করা বাড়িঘর কাঁপাবার জন্য প্রথম প্রকৃত আঘাত। এর আগে ভালো ছবি তৈরির চেষ্টা আরও কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু এরকম একনিষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীণ সৎ প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি। এখানে দেখা গেল, ছবির নির্মাতাগণ দর্শকদের কেবল প্রথমরিপুতাড়িত মাংসপিণ্ড জ্ঞান করেন না। কিংবা তাঁদের নিচুমানের বুদ্ধিবৃত্তির লঘুস্বভাব মানুষ বলেও গণ্য করা হয়নি। তাই সংক্ষিপ্ত বেশবাস সত্ত্বেও গ্রামের দরিদ্র তরুণীর প্রতি দর্শকদের স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ নষ্ট হয় না। অথবা এই ছবি দেখতে দেখতে সৃজনক্ষমতাশূন্য মহাপণ্ডিতের ইন্টেলেকচুয়াল জ্যাঠামো সহ্য করার দরকার নেই। আমাদের স্বাভাবিক মানববৃত্তির ওপর এরকম আস্থাবান কোনো ভদ্রলোক আমাদের দেশে এর আগে কখনো ছবি তৈরি করেননি। আমাদের ওপর এই আস্থাস্থাপনের জন্য দর্শকদের পক্ষ থেকে তাঁদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

এই ছবি বাংলাদেশের গরিব ও শোষিত গ্রামবাসীর জীনযাপনের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে গরিব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তাঁদের প্রতি সংশ্লিষ্ট মাধ্যমসমূহের উদার পক্ষপাতিত্বও খুব চোখে পড়ে। তাঁদের শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছোটখাটো বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু রাজনীতিতে এইসব লোক যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন, শিল্পক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কমই দেখা যায়। গ্রামের গরিব লোকদের জন্য কপট ভালোবাসা দেখিয়ে রাজনীতিবিদদের মতো এইসব শিল্পমাধ্যমের মহারথীগণ নিজেদের শহরবাসকেই বিলাসময়, সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ করে তুলেছেন। এঁদের নিয়ে লেখা অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের মতো চলচ্চিত্রও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাপূরণের কাহিনী দিয়ে পঙ্গু শিল্পপ্রয়াস ছাড়া আরকিছুই হয় না। মানুষের বেদনাকে নিজের অভিজ্ঞতা বা চেতনায় অনুভব করতে না–পারলে তাদের সমস্যা আসে কেবল থিওরির দৃষ্টান্ত হিসাবে। থিওরি দিয়ে মানুষকে দেখলে বানানো মানুষের বানোয়াট লম্ফঝম্পই দেখানো যায়, মানুষের জীবনযাপন শিল্পে স্পন্দিত হয়ে ওঠে না। আবার কখনো কখনো তরল ও শিথিল বাষ্পীয় তুলুতুলু ভালোবাসায় ফেঁপে উঠে কাঁদলে এবং কাঁদতে

কাঁদতে মানুষের পিঠ চাপড়ালে তাতেও যথার্থ মানুষের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া দায়। মানুষের বেদনাকে গভীরভাবে অনুভব করতে পারলেই থিওরি ও বাগ্মীয় অসারতাকে ছাড়িয়ে ওঠা সম্ভব। মানুষের জন্য বেদনাবোধ, বেদনার জন্য বেদনাবোধ তখন শিল্পবোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলে এবং এই দুটোকে তখন আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না, তার দরকারও পড়ে না। তখন আসে শিল্পীর বহুপ্রার্থিত সংযম। বেদনার গভীর উপলব্ধি তাঁকে পরিণত করে ঋজু ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবে, বেদনায় তখন আর এলিয়ে পড়েন না। কাঁচা, তরল ও শিথিল আবেগ এবং লঘু সংস্কৃতিবোধের বিকার থেকে মুক্ত করে শক্ত হাতে ছেঁটে ফেলতে পারেন বানোয়াট অনুভবের মেদ ও ফেনা।

এই কঠিন হাতের সম্ভাবনা দেখা গেল সূর্য দীঘল বাড়ী চলচ্চিত্রে। মানুষের বেদনা, ক্ষোভ ও অপমানকে নিজেদের সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করার প্রবল ও গভীর ব্যগ্রতা এই চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষ সম্বন্ধে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হতে। ফলে বানোয়াট ভাবনায় ফেঁপে ওঠেননি তাঁরা, তরল ও শিথিল আবেগে নুয়ে পড়েননি একেবারে। কাঁচা স্যাঁতসেঁতে মানুষ এই ছবির কোথাও ঠাঁই পায়নি। সত্যি তো, এইসব গরিব ও মার-খাওয়া-মানুষের জীবনে ভিজে ভিজে, রংবেরঙের শখের আবেগ কি পোষায়? শখের ভালোবাসা দিয়ে ফাঁপা শিক্ষিত ভদ্রলোকরা তাদের নিয়ে ছবি করার সময় কী লেখার সময় নিজেদের ভিত্তিহীন চটচটে অনুভূতি তাদের মধ্যে নিঃশেষে দান করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন, এই ছবিতে দেখলাম কী অসাধারণ সংযমের সঙ্গে পরিচালক দুজন নিজেদের মধ্যবিত্ত আবেগ-বিতরণের লোভ জয় করেছেন।

সূর্য দীঘল বাড়ীর সাফল্যের একটি প্রধান কারণই হল পরিচালকদের মাত্রাবোধ। চরিত্রসমূহের যার যা ভূমিকা তাকে তার বেশি চাপ দেওয়া হয়নি, দুঃখকষ্ট তাদের যা থাকার কথা, পর্দায় তা-ই দেখতে পাই। গরিব গ্রামবাসীর ভালোবাসা কী কষ্ট কী অপমান দেখাবার সময় এরকম মাত্রা বজায় রাখা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। গ্রামের গরিব লোকজন কিন্তু এভাবেই প্রেম করে। বাড়ির পেছনে নিকানো বাঁশঝাড় বা রেললাইনের ধারে জুতসই জায়গা খুঁজে নেওয়া তাদের জন্য খুব দুরূহ কাজ। কালোকিষ্ঠি গতর ও ফাটা হাত-পা ছড়িয়ে বসে কলেজ-ইউনির্ভার্সিটির ছেলেমেয়েদের মতো গদগদ হওয়া কি তাদের সাধ্যে কুলায়? না, নাটক নভেল পড়ে অত প্যানপ্যাননি তারা রপ্ত করেছে? ন্যাকা ও হ্যাবলা চলচ্চিত্রের কথা ছেড়েই দিলাম, এখানকার গল্পে উপন্যাসেও চাষাভুষাদের প্রেমের দৃশ্যে ঝিরঝিরে ভালোমন্দ দুটো হাওয়া ছাড়ার লোভ সামলাতে পারেন কজন? এই লোভ জয় করেছেন এই দুজন—মসিহউদ্দিন শাকের ও নিয়ামত আলী। অনুতপ্ত স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার জন্য উদগ্রীব, তার প্রেমে সে একেবারে অস্থির। কিন্তু তার মধ্যে ভদ্দরলোকের ছিঁচকাঁদুনে দশা কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর এই জেদি লোকটিকে চিনতে তো কোনো অসুবিধাও হয়নি। অসুস্থ ছেলের সেবায় ব্যস্ত স্ত্রীর কাছে তামাক সাজার অজুহাতে আগুন চাইতে গেলে জ্বলন্ত কয়লায় তার হাতে ছ্যাঁকা লাগে, তখন প্রেম ও অনুতাপ তাকে কতটা যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে দর্শক তা একেবারে মর্ম দিয়ে বোধ করতে পারেন। আবার প্রাক্তন স্বামী ছিনিয়ে নিয়েছে একটি ছেলেকে, সেই ছেলের জন্য মায়ের তীব্র ও প্রবল ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্য তরুণী মাকে একবারও নেতিয়ে পড়তে হয়নি। ছেলেটি অসুস্থ হলে তাকে যেভাবে সে সেবাযত্ন করে তাতেই তার বাৎসল্যের চরম

প্রকাশ দেখা গেল। এইভাবে সংযমের মধ্যে, মাত্রাবোধের সাহায্যে মানুষের বেদনা, ক্ষোভ ও অপমান রূপায়িত হয়েছে সূর্যদীঘল বাড়ীতে।

এই ছবিতে ক্যামেরা কাজ করে জীবন্ত শিল্পীর মতো। মনে হতে পারে, ক্যামেরাকে অগাধ স্বাধীনতা দিয়ে পরিচালকগণ বসে ছিলেন অনেক পেছনে। একটির পর একটি দৃশ্য সাজানো হয়েছে, পরিচালকদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। পেছনে বসে খুব শক্ত ও পরিশ্রমী এবং সর্বোপরি সৃজনশীল হাতে নিয়ন্ত্রণ না-করলে ক্যামেরার এই স্বতঃস্ফূর্ততা এভাবে অনুভব করা যেত না।

এই সংযমবোধ থেকে পরিচালকদের মধ্যে এসেছে একধরনের অতিরিক্ত সতর্কতা, এই সতর্কতাটি প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। অভিনয়েও সবাই খুব সচেতন, সচেতনতার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের অবধারিত আতিশয্য এড়ানো গেছে। কিন্তু এর ফলে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে আড়ষ্টতা। ক্যামেরা কখনো কখনো কেবল দৃশ্যগুলো এনেই ক্ষান্ত হয়, ফলে বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা হলেও এই ছবি কোথাও কোথাও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে না। এখানে চিত্রিত বাংলার গ্রামের মানুষের একটি প্রধান দিক হল কুসংস্কারের প্রতি তাদের অযৌক্তিক আনুগত্য। বিশেষরকম অবস্থান একটি বাড়িকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তোলে, সেই বাড়িটি হয়ে ওঠে অপয়া, সেখানে থাকলেই মানুষের অপঘাতে মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি এবং অবশেষে ফের গৃহত্যাগ অবধারিত—এইরকম একটি সংস্কার গ্রামবাসীর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার ঘটনাপ্রবাহও এই সংস্কারকে মানুষের মনে শক্তভাবে গেঁথে দেয়। কিন্তু এই ছবিতে মানুষের অভিব্যক্তি, বিভিন্ন ভৌতিক কাণ্ডে তাদের প্রতিক্রিয়ার এই সংস্কার ও ভয়কে ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। গোটা গ্রামবাসী যে সংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, যার সুযোগ নিয়ে গ্রামের অল্প কয়েকজন টাকাপয়সাওয়ালা শয়তান অবাধে হারামিপনা করে চলে এমনকী নরহত্যার মতো কাজ করতেও পেছপা হয় না—তা যেটুকু এসেছে তা কেবল বিবৃতির মধ্যে, অভিনয় বা অভিব্যক্তিতে তা অনুপস্থিত। পরিচালকগণ অন্যান্য অনেক চলচ্চিত্রকার কী লেখকের মতো গ্রামবাসীদের পিঠ চাপড়াতে আসেননি যে মনে করব গ্রামবাসীদের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁরা তাঁদের অযৌক্তিক সংস্কারাচ্ছন্নতা দেখানোটা এড়িয়ে গেছেন। না, তা হতেই পারে না। মানুষের বেদনা ও অপমানকে যাঁরা নিজেদের বোধ দিয়ে অনুভব করেন তাঁদের মধ্যে এরকম পৃষ্ঠপোষকসুলভ মনোভাব আসতেই পারে না। বরং মনে হয়, শিল্পী দুজন অতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন এই ভেবে যে, সংস্কারটিকে বেশি নিয়ে এলে তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যেতে পারে এবং তাতে ছবির শিল্পমান নেমে আসতে পারে। কিন্তু তা হবে কেন? গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষ অনাদিকাল থেকে বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা, রাষ্ট্রের দ্বারা, সামাজিক কাঠামোর দ্বারা শোষিত ও অপমানিত হয়ে আসছেন, এই শোষণেরই একটি বড় হাতিয়ার হল তাঁদের ধর্মবোধ এবং ধর্মবোধের বাবা কুসংস্কার। এই দেখাতে গেলে ছবির গাঁথুনি শিথিল হবে কেন? শিথিল নয়, একটু বেপরোয়া হলে এই শতাব্দীতেও তাদের আদিম ধরনের জীবনযাপনের ছবি সম্পূর্ণ হতে পারত।

ছবির শেষভাগে দগ্ধগৃহ পেছনে ফেলে বাস্তুহারা মানুষের গৃহত্যাগের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। নতুন বাড়ির খোঁজে তাঁদের এই যাত্রা বাঁচার জন্য মানুষের অব্যাহত জীবন-সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। ছবিতে এই কথাটি বোঝা যায় বইকী। কিন্তু বোধটিকে দর্শকের

চিত্রে ভালোভাবে গেঁথে দেওয়ার জন্য আরেকটু সময়, আরেকটু স্পেসের দরকার ছিল। এই দৃশ্য বড় সংক্ষিপ্ত, ফলে অস্পষ্ট। গোটা ছবিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের যে-সংগ্রাম, অপমান, পরাজয় দেখি, আকস্মিকভাবে তার সমাপ্তি ঘটে যার বলে বিষয়টি দর্শকদের চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে পারে না। চিরকালের একটি মহৎ শিল্পকর্ম ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম ছবিতে দেখি নদীর বুক রুদ্ধ হওয়ায় একটি গোটা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেও মানুষের অব্যাহত জীবনযাত্রার সংগ্রামমুখরতার কথা ঘোষিত হয় একটি নারীর বাঁশি-বাজানো-শিশুকে স্বপ্নে দেখার মধ্যে। দৃশ্যটি দর্শকের চেতনাকে ব্যথায়, বেদনায়, ক্ষোভে এবং একই সঙ্গে আশায় পরিপূর্ণ করে তোলে, তাঁর সমস্ত অগোছালো উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে একটি সংহত আবেগে এবং দর্শক আগের চেয়ে পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হন। কিন্তু সূর্য দীঘল বাড়ী ছবিটি দর্শকের মধ্যে এরকম আবেগসঞ্চার করতে পারে না কেন? মনে হয় পরিচালক দুজন বেশি সতর্ক ছিলেন। আর-একটু বললেই যদি বাড়াবাড়ি হয়—এই ভয়ে তাঁরা পা টিপে টিপে এগিয়েছেন। হতে পারে, আমাদের এখানকার ন্যাকা ন্যাকা ছবি দেখতে দেখতে এবং ছিচকাঁদুনে গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই আড়ষ্ট হওয়ার মধ্যে। কিন্তু এটা তাঁদের দরকার ছিল না। যে-শক্তির বলে সচেতনতা ও সংযম শিল্পীস্বভাবের অন্তর্গত হয়, যার বলে শিল্পী বিনা দ্বিধায় নিজেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন, গোটা ছবির মধ্যে তার পরিচয় নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এই দ্বিধা কেন?

অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ

কোরক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আমাকে একজন অগ্রজ লেখক বিবেচনা করে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যকীর্তির ওপর লিখতে বলায় আমি গর্ব বোধ করি, তার চেয়ে বিব্রত হই অনেক বেশি। অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত সবগুলো বই পড়েছি, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক পশ্চিম বাংলার অন্যান্য লেখকের, ঠিক করে বললে, 'অন্য' ধারার লেখকদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এখানে কম। ঢাকার বইয়ের দোকানগুলোর সারি সারি শেলফ যাঁদের বই দিয়ে ঝকমক করে তাঁরা পশ্চিম বাংলার সব জাঁদরেল লেখক। অভিজিৎ সেন কিংবা ঐ বিরল প্রজাতির লেখক পাঠকের মনোরঞ্জন করা যাঁদের কায়মনোবাক্যের সাধনা নয়— তাঁদের বই এখানে পাওয়া মুশকিল। আবার গত শতাব্দীর কোম্পানির কাগজের মতোই দামি কলকাতার সব বড় বড় 'হৌস'-এর রংবেরঙের ঢাউস পত্রিকার তোড়ে এখানে শাহবাগ, মতিঝিল, স্টেডিয়ামের ফুটপাথে পা রাখা দায়, সেখানে কী পশ্চিম বাংলা কী বাংলাদেশের ঐসব লিটল ম্যাগাজিনের ঠাঁই কোথায়, যেখানে ব্যক্তিতে সমাজে ও ইতিহাসে ব্যাপক ও গভীর খোঁড়াখুঁড়ির কাজে নিয়োজিত লেখকদের রক্তাক্ত চেহারা দেখতে পাওয়া যায়? কলকাতার কথা জানি না, তবে ঢাকায় পশ্চিম বাংলার এসব লেখক ঘোরতরভাবে অনুপস্থিত। তো এঁদের অধিকাংশের লেখার সঙ্গে পরিচিত না-হয়ে কেবল দুটো বছর আগে লিখতে শুরু করেছি বলে এঁদের বড়দার মেকআপ নেওয়ার মতো বুকের পাটা আমার নেই।

না, অগ্রজ লেখক হিসাবে কিছুতেই নয়, অভিজিৎ সেনের লেখা নিয়ে কথা বলার ভরসা করি অন্য বিবেচনা থেকে। প্রিয় লেখকের বই পড়ে প্রতিক্রিয়া জানাবার এখতিয়ার নিশ্চয়ই যে-কোনো পাঠকের আছে।

অভিজিৎ সেনের রহু চণ্ডালের হাড় অপ্রত্যাশিতভাবে পাই ১৯৮৭ সালে, কলকাতা থেকে আমার বন্ধু দিলীপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। পড়তে শুরু করেই বইটি দারুণ মনোযোগ দাবি করল, পড়তে হয়েছিল আস্তে আস্তে। একটানা পড়বার মতো বই নয়, পাঠককে গ্রাহক ঠাউরে নিয়ে সেঁটে রাখার ফন্দি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। পড়তে পড়তে কাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া এখানে অসম্ভব, বরং বইটিকে যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। এদিকে প্রধান চরিত্রের নামও বারবার ভুলে যাচ্ছিলাম, তাকে খুঁজতে একটু কষ্টই হচ্ছিল।

পরে বুঝতে পারি প্রধান চরিত্র বলতে যা বোঝায় সেরকম একজন পুরুষ বা একজন মহিলা এখানে খোঁজা নিরর্থক। না, নায়ক খুঁজিনি। উপন্যাস থেকে নায়ককে বহিষ্কার করা হয়েছে সে তো আজ অনেকদিন আগে। লেখকের লাই পেয়ে ধাড়ি সাইজের ছিঁচকাদুনে একটি শিশু সারা বই জুড়ে প্যানপ্যান করলে তাকে জলজ্যান্ত নায়ক বলে শনাক্ত করা সাহিত্যের গোয়েন্দাবিভাগে কর্মরত সমালোচক ডেজিগনেশনধারী কর্মকর্তা ছাড়া আর কারও সাধ্যি নয়। কিন্তু এই রহু চণ্ডালের হাড় বইতে নায়ক পাওয়া গেল, চোখের জলে নাকের জলে গলে–যাওয়া–মাংসপিণ্ডের প্রধান চরিত্র নয়, খটখটে হাড্ডির নায়ককে এখানে বেশ হাড়ে–হাড়ে ঠাহর করা যায়। কিন্তু এই নায়ক কোনো একজন ব্যক্তি নয়, সে ব্যক্তি নয়, একবচন নয়। সে হল বহুবচন। তার নাম কী?

— নাম বাজিকর। বাজিকর একটা গোষ্ঠী।

— নিবাস?

— তামাম দুনিয়া।

ঘর নেই বলে দুনিয়া জুড়ে তার নিবাস। ঘর হারাবার পর থেকে তারা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে দিনের পর দিন। কোনো এককালে তারা ছিল গোরখপুরে। ভূমিকম্পে সেখান থেকে উৎখাত হয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছিল রাজমহল। সেখান থেকে মণিহারিহাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামাসি হয়ে মালদা। পূর্বের দিকে তাদের যাত্রা। পূর্বদিকে সূর্য ওঠে, তাদের পূর্বপুরুষ বলেছিল পূর্বেই যেন থিতু হয় তারা। তাই মালদা হয়ে রাজশাহী, তারপর পাঁচবিবি। সেখানে মার খেয়ে ফের যেতে হয় পশ্চিমের দিকে। তা ঘর তো আরও কারও কারও থাকে না। কিন্তু তাদের গন্তব্য থাকে। ইহুদিরা হাজার হাজার বছর ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য ছিল প্রতিশ্রুত দেশ, ঈশ্বর তাদের পছন্দ করেন, পছন্দের বান্দাদের জন্য তিনি খাস জায়গা রেখে দিয়েছিরেন। তাদের পয়গম্বররা সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, পয়গম্বররা জানত ইহুদিদের ঘর একদিন–না–একদিন মিলবেই। কিন্তু এই বাজিকরদের কোনো দেশ তাদের জন্য অপেক্ষা করে না, নিজেদের দেশ তাদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে।

—বেশ তো, নিবাস ঠিকানাহীন। তবে তাদের ধর্ম কী? কী জাতি?

বাজিকর এবার লা–জওয়াব। নিজেদের ধর্ম যে কী তা তাদের জানা নেই। প্রচলিত ধর্মগুলোর কোনোটিকেই তারা সচেতনভাবে গ্রহণ করেনি, আবার ধর্মও তাদের রেহাই দিয়েছে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেনি। তারা ধার্মিক নয়, আবার এই কারণেই বকধার্মিক হওয়াও তাদের সাধ্যের বাইরে। এতে বাজিকর যে আরামে দিন কাটায় তা নয়, তার কাছে আল্লা ভগবান নামে এমন কোনো পাত্র নেই যার ভেতর তার বিবেচনা, অভিজ্ঞতা সব ঢেলে দিয়ে সে নিশ্চিত হতে পারে।

—তা হলে তার ভাষা কী?

এরকম একটি মূলোৎপাটিত গোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় দেওয়া কি সোজা? তার যা আছে তাকে বড়জোর বুলি বলা যায়। তার যেখানে রাত সেখানে কাত, তেমনি যেখানে যায়, কিছুদিন থাকতে থাকতেই সেখানকার বুলি সে জিভে তুলে নেয়। পায়ের মতো জিভও তার বড় পিচ্ছিল, কোনো জায়গার বুলিই তার মুখে ভাষা হওয়ার সময় পায় না, দেখতে–না–দেখতে বাজিকর চলে যায় অন্য কোথাও, সেখানে গিয়ে সে নতুন বুলি রপ্ত করে।

রহু চণ্ডালের হাড়–এর এই গৃহহীন, ভূমিবঞ্চিত, ধর্মমুক্ত বাজিকর গোষ্ঠী একটি স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এক শতাব্দী পেরিয়ে আরেক শতাব্দী জুড়ে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, এক নদী পেরিয়ে অন্য নদীর তীরে, পাহাড় পাড়ি দিয়ে আরেক পাহাড়ের উপত্যকায় তাঁবু গাড়ে, জমি পেলে লাঙল চষে, মাঠের জানোয়ার পোষ মানায়, গৃহস্থের পশু হাতাতেও তাদের জুড়ি নেই, সেখানকার বুলি তুলে নেয় মুখে। কিন্তু আসন পেতে বসা তাদের কপালে নেই, অভিশপ্ত পূর্বপুরুষের পাপে (?) তারা ঠিকানাবিহীন মানুষ।

কিন্তু এই পরম অনিশ্চিত বেপরোয়া জীবনযাপন সত্ত্বেও এদের বেঁচে থাকবার সাধে এতটুকু চিড় ধরে না। এদের সংগঠিত রাখার জন্য টিলেঢালা আয়োজন করত এদেরই কোনো সরদার, তাদের চেহারা ও ব্যক্তিত্ব অনেকটা সেমেটিক পয়গম্বরদের মতো। দনু, পীতেম, জামির—নিজেদের লোকজন সম্বন্ধে এদের ভাবনা ও উদ্বেগ, দায়িত্ববোধ ও মনোযোগ পয়গম্বরদের চেয়ে কম কী? মাঝে মাঝে এদের মধ্যে যে-হিংস্র আচরণ দেখি কিংবা যেভাবে প্রবল হিংসার শিকার হয় তাতেও বাইবেলের কথাই মনে পড়ে বইকী! এরা বারবার মনে করে : রহু এদের সহায়, কিন্তু রহু একেবারেই মানুষ। জেহোভা কী ট্রিনিটি কী আল্লার মহামহিম অলৌকিক শক্তি এদের কোথায়? সর্বশক্তিমান কোনো দেবদেবী এদের নেই। সমাজের মূলধারায় ধর্মবোধ–নিয়ন্ত্রিত নৈতিকতা কী অনৈতিকতা কিংবা রাষ্ট্র পরিচালিত শৃঙ্খলা কী বিন্যস্ত বিশৃঙ্খলা এদের গোষ্ঠীজীবনে অনুপস্থিত। দেবদেবী কী আল্লারসুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার কী সঁপে দেওয়ার সুযোগ নেই বলে নিজেদের ভালোমন্দ এদের ঠিক করতে হয় নিজেদেরই। একদিকে তাই অবাধ স্বাধীনতা, অন্যদিকে কঠিন দায়িত্ববোধ। স্থায়ী ঠিকানা পেতে হলে কঠিন কাঠামোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, স্বাধীনতা তখন বিসর্জন না–দিয়ে উপায় থাকে না। সমাজের মূলধারার মানুষের মতোই থিতু হবার বাসনা এদের প্রবল, অথচ গোরখপুরের ভূমিকম্পে উৎখাত হওয়ার অনেক আগেই অস্পষ্ট অতীতকালেও কিন্তু এরা ছিল কোন মরু এলাকার মানুষ, সেখানেও তো যাযাবর হয়েই জীবনযাপন করেছে। এই এত দীর্ঘকালের পদযাত্রার লক্ষ্য স্থায়ী ঠিকানা। তারা চেয়েছে গৃহস্থ হতে : মোষ থাকবে, হাল লাঙল থাকবে, আর থাকবে জমি। পথে পথে দেবদেবী জোগাড় করলেও কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। সম্মানিত ও দাপটের দেবদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেও এরা অচ্ছুৎই রয়ে যায়। এদের একটি অংশ কলেমা পড়ে ঠাঁই মাগে আল্লারসুলের দরবারে। আখেরাতে রহমানুর রহিম তাদের জন্য কী বরাদ্দ করেছে অতদূর ভাববার শক্তি তাদের নেই, তাই নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু কলেমা পড়লেও ভদ্দরলোক মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আগের মতোই রয়ে যায়। বৃহত্তর সমাজে মিশে যাওয়ার এই প্রচণ্ড ইচ্ছা থেকেই একদিন–না–একদিন তারা মূলধারায় বিলীন হবে, এজন্য দাম দিতে হয় খুব চড়া। নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু মর্যাদা পায় না। বাজিকরের ব্যক্তির অভিমান ও গোষ্ঠীর গর্ব বাঁধা থাকে একই তারে, যেখানে যায় সেখান থেকেই উচ্ছেদ হবার গ্লানি এবং ঠিকানা জোগাড় করার সংকল্প প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও এই গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবে প্রবাহিত যে ব্যক্তি ও সমষ্টির আলাদা পরিচয় পাওয়া মুশকিল। প্রেম, কাম, ক্রোধ, হিংসা, বাৎসল্য, ঈর্ষা, ক্ষোভ, লোভ এবং সাধ এই উপন্যাসে এসেছে এক–একজন মানুষের ভেতর দিয়েই, কিন্তু তা কখনোই আলাদা হয়ে থাকে না, একই সঙ্গে

পরিণত হয় বাজিকরের গোষ্ঠীর সাধারণ অনুভূতিতে। কিন্তু মূলধারায় লীন হলে কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে বিলীন হলে এই চেহারা ধ্বংস হয়ে যায়, ব্যক্তি ও সমাজের একাত্মতা সেখানে নষ্ট হতে বাধ্য।

মূলধারার মানুষ বিচ্ছিন্ন মানুষ। ব্যক্তিস্বাধীনতার ডঙ্কা পিটিয়ে বুর্জোয়াসমাজের উদ্ভব, অন্যের শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির এই বহুঘোষিত স্বাধীনতা রূপ নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং পুঁজির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়ে আজ এর পরিণতি ঘটেছে আত্মসর্বস্বতায়, এখন ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নাম করা যায় ব্যক্তিসর্বস্বতা। ব্যক্তিসর্বস্বতা দিয়ে চিহ্নিত সমাজও যে-শিল্প সৃষ্টি করে তা দিনদিন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আসছে রুগ্‌ণ ও রোগা এক ব্যক্তির কাতরানিতে। এই রুগ্‌ণ লোকটির ভেতরটা ফাঁকা ও ফাঁপা। অভিজিৎ সেন এই ফাঁকা ও ফাঁপা লোকের গল্প ফাঁদতে বসেননি। তিনি যে-শক্তির ইঙ্গিত দেন তা কোনো ব্যক্তির নয়, কেবল একটি গোষ্ঠীর নয়, বরং তা হল মানুষের শক্তি। মূলধারার সঙ্গে বিলীন হতে উদ্গ্রীব গোষ্ঠী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হতে শক্তি হারায়, তার স্বাধীনতা লোপ পায়। আগেই বলেছি, বাজিরকদের দীর্ঘ পদযাত্রা তাদের ঘর দিলেও দিতে পারে, কিন্তু সেই ঘরে মর্যাদা নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানদের কবজার ভেতর নিষ্পিষ্ট হওয়াই এদের পরিণতি। এই সমাজের যারা মালিক মানবিক বিকাশের সমস্ত পথ কিন্তু তাদের জন্যও বন্ধ, একটি মস্ত চাকার কাঁটা হয়ে তারা সমাজকে বিঁধতে থাকে, কিন্তু চাকা ঘোরে তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, চাকা এগিয়ে নেওয়ার সৃজনক্ষমতা থেকে তারা বঞ্চিত অথবা সে-অধিকারও তাদের থাকে না।

রহু চণ্ডালের হাড়-এর কাহিনী এসে ঠেকেছে এই শতাব্দীর ষাটের দশকে। দেশ তখন স্বাধীন ও বিভক্ত। প্রশাসনকে নতুনভাবে সাজাবার উদ্যোগ চলছে। কিন্তু সমাজকাঠামোর বদল না-ঘটিয়ে প্রশাসনের সংস্কার শোষণব্যবস্থায় ভাঙন তো দূরের কথা, এতটুকু চিড়ও ধরাতে পারে না। কোনো ব্যক্তি কী কয়েকজন ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সংকল্প থাকা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থেকে শোষণব্যবস্থার ওপর কোনো আঘাত হানতে পারে না, প্রোথিত প্রতিষ্ঠানকে টলানো তার কিংবা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এমনকী প্রশাসনের একটি অংশ হলেও পারবে না। অন্ধকারের নদী উপন্যাসে অশোক হল প্রশাসনের একটি খুঁটি, স্তম্ভ নয়, নিচের দিকের একটি খুঁটি। তবু রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তার একটি ভূমিকা রয়েছে।

অশোক একজন সৎ মানুষ এবং নিষ্ঠাবান প্রশাসক। রাষ্ট্রের সংবিধানের নিয়মকানুন ব্যবহার করেই সামাজিক প্রতারণা ও শঠতা থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার জন্য সে উদ্যোগ নেয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন প্রয়োগে সে বেশ শক্ত হয়। কিন্তু এই শক্তি তো রাষ্ট্রের শক্তি। রাষ্ট্রের কাজ সামাজিক শোষণকে সুসংগঠিত পদ্ধতির ভেতর রেখে পরিচালনা করা। পদ্ধতির ভেতরে মাঝে মাঝে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল শিকারকে একটু বিচরণ করতে দিয়ে তাকে নিয়ে খেলা যাতে হঠাৎ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে দড়ি ছেঁড়ার কাজে না-মাতে। রহুর উত্তরপুরুষরা যে-মূলধারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সমাজের স্থিতিশীলতাকে ঠিক রাখা অর্থাৎ শোষণব্যবস্থার শরীরটিকে হৃষ্টপুষ্ট রাখার জন্য প্রণীত আয়োজনকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেওয়াই হল অশোকের সরকারি দায়িত্ব। এই বিশাল আয়োজনকে পণ্ড করার জন্য তো আর অশোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি ছোট নাটবল্টু হল আমাদের অশোক

সাহেব। নাটবল্টু থাকবে নাটবল্টুর মতো, তার নড়াচড়া রাষ্ট্র সহ্য করবে কেন? করেওনি। রাষ্ট্রের কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে পদেপদে বাধা পায় এবং রাষ্ট্রেরই আরও সূক্ষ্ম নিয়মে তাকে শাস্তিপ্রদানের আয়োজন চলে।

প্রশাসনে তৎপর না-হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকলে রাষ্ট্রের গায়ে ঝড়ঝাপটা লাগার সম্ভাবনা কম। তৎপর হতে গিয়ে অশোক ভুল করে। তৎপর মানুষের প্রতিক্রিয়াও চাপা থাকে না, বরং তা প্রকাশ করাও তৎপরতার প্রধান অংশ। যে যারা রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কবজা করেছে তার পাণ্ডারা ঘটনা ঘটায়, আবার এর প্রতিকার চায় যারা, তাদের হাতেও একই ঝাণ্ডা। অশোক এই ধাপ্পাবাজির শিকার। এই ধাপ্পাবাজিতে ক্রুদ্ধ হন অভিজিৎ সেন নিজেও।

আমার বন্ধু মাহবুবুল আলম অন্ধকারের নদীতে পড়ে একটি মন্তব্য করে ; মাহবুব লেখার ব্যাপারে অলস বলে ওর কথাটা আমিই লিখি : অন্ধকারের নদীতে উনিশ শতকের বাংলা নকশাজাতীয় রচনার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের কাহিনী-রচনার চেয়ে লেখক অনেক বেশি মনোযোগী সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরার কাজে। তবে প্যারীচাঁদ মিত্র কী কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেদের সময়কে তুলে ধরেন অতিরঞ্জন ও হাস্যবিদ্রূপ দিয়ে, অভিজিৎ সেখানে সামাজিক অন্যায়কে প্রকাশের সময় নিজের প্রবল ক্রোধ প্রকাশ না-করে পারেন না। এই ক্রোধ তাঁর পূর্বসূরিদের শ্লেষের চেয়ে অনেক তীব্র। তবে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে লেখকের কান্না লুকোবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

আমার কাছে কিন্তু অন্ধকারের নদী উপন্যাস। এর কোথাও অসামঞ্জস্য নেই, টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে কাহিনী সাজাবার চেষ্টাও অভিজিৎ করেননি। তবে হ্যাঁ, বইটির আগাগোড়া ক্রোধ বড় স্পষ্ট। তাঁকে রাগ কমাতে বলা মানে নিরপেক্ষ হতে বলা। না, অভিজিৎ সেনকে নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য মিনতি করা হচ্ছে না। এখন কোনো সৎ মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। এখন নিরপেক্ষ লেখক জন্মান না, জন্মিয়া কাজ নাই। কিন্তু অভিজিতের ক্রোধ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল, ফলে ওই উপন্যাসের অনেক জায়গায় তিনি অস্থির। বাজিকরদের দেড়শো বছরের দীর্ঘ পর্যটন তিনি অনুসরণ করেছেন পরম ধৈর্য নিয়ে। অভিশপ্ত রহু পয়গম্বরের বংশধরদের জীবনকে তিনি এমনভাবে দেখেন যে তাদের প্রকাশ করার জন্য তারাই যথেষ্ট, অভিজিৎকে সেখানে গায়ে পড়ে আসতে হয় না। কিন্তু অন্ধকারের নদীতে উত্তেজিত অভিজিৎ এসে পড়েন নিজেই। তাই অশোককে উপচে ওঠে তার উপস্থিতি। ফলে জ্যান্ত মানুষের রক্তমাংস থেকে অশোক মাঝে মাঝে বঞ্চিত হয় বইকী! অভিজিৎ তাঁর সৃষ্ট মানুষকে স্বাধীনভাবে চলতে দেবেন তো! অশোকের চিন্তাভাবনা, তার সংকট ও সংশয়, তার সংকল্প ও তৎপরতা প্রকাশের কাজ অভিজিৎ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এতে অশোকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি যতটা উদ্ভাসিত হয়, একজন আস্ত মানুষ সৃষ্টিতে মনোযোগ সেভাবে প্রকাশিত হয় না।

তার উনপঞ্চাশ নৌকার সাঁইয়ের প্রতি হাঁক বরং ধামানের নিজস্ব। উপন্যাস পড়া শেষ হলেও এই ডাক কানে গমগম করে বাজে। বইটির প্রচ্ছদে গণেশ পাইনের দি কল ছবিটি উপন্যাসের শেষভাগে এসে এমন অস্থির ও সর্বগ্রাসী আহ্বানে পরিণত হয়েছে যে, অশোকের দুর্বল চেহারা আর মনে থাকে না। একই বইতে দুজন মানুষকে দুইভাবে নির্মাণের পেছনে কি অভিজিতের এই বোধ কাজ করেছে যে প্রশাসন-ব্যাপারটির মধ্যে একটি ত্বরিতগমনের ভাব থাকে এবং মানুষের মুক্তির আহ্বান সবসময় দীর্ঘ ও অচঞ্চল? কিন্তু, বিষয় যা-ই হোক

কিংবা চরিত্র যে-স্বভাবের হোক, মানুষকে স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠতে না-দিলে সন্দেহ হয় যে তার সমস্যাটিকে লেখক উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন না।

বালুরঘাটের বিবর্ণ মুখোস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ইন্টারভিউতে অভিজিৎ সেন তাঁর লেখার ব্যাপারে একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন। সোচ্চারভাবে মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না সে-সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁর রচনার ঐসব অংশ বাদ দিয়ে পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যে-কোনো লেখা পাঠকের হাতে পড়লে তার প্রতিটি বর্ণই পাঠের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। অভিজিতের রচনার কোনো অংশ বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং, পাঠক তাঁর কাছে যা দাবি করেন তা হল এই : ঐসব জায়গায় উপযুক্ত রক্তমাংস প্রয়োগের সুযোগ তাঁর করে নেওয়া উচিত। তা হলে চরিত্র গড়ে ওঠার স্বাধীনতা পাবে আরও বেশি। শক্তিশালী চরিত্র উপন্যাসের শরীরে রক্ত চলাচলের প্রধান ইন্ধন। ...

যেমন দেখি দেবাংশী উপন্যাসে লোহার সারবান। সে কিন্তু আগাগোড়া নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য লেখককে এগিয়ে আসতে হয়নি। লোকটি দৈবী ক্ষমতা পেয়ে সত্যি দেবতা হয়ে উঠেছিল, লেখক একবারও তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তাকে দেবতা হতে কোথাও কিছুমাত্র বাধা দেননি। তারপর দিন যায়, অল্প কয়েক পৃষ্ঠাতেই দিন যায়, কিন্তু লেখক সময়কে ঠেলে দ্রুত পার করিয়ে দেন না, লোকটি খেরা খেলার কলাগাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে, শরীরের কাঁপুনি তার আস্তে আস্তে কমে, কমতে কমতে লোপ পায়, নিজের দৈবী ক্ষমতায় তার সন্দেহ হয়, রাতে তার ঘুম হয় না। তাকে জাগিয়ে রাখার জন্য কী জাগিয়ে তোলার জন্য অভিজিৎকে গান গাইতে হয় না। ফের দেবাংশীর ঐ আসন বর্জন করার বল সে জোগাড় করে নিজে নিজেই। এই গল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় সংস্কার আর শ্লোক আর প্রবাদ যেন হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে দেবাংশীকে নির্মাণ করে তুলেছে। মনে হয় গল্পটি কালনিরপেক্ষ। এই গল্প হাজার বছর আগেরও হতে পারত। হিউ-এন-সাঙ যখন এসেছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধন আর সোমপুরের বিহার নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে আশেপাশের গ্রামগুলোতে উঁকি দিলে তিনি এই দৃশ্য দেখতে পেতেন। কাহ্নু পা, লুইপার আমলেও দেবাংশী ছিল। কবিকঙ্কন, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, আলাওল, ভারতচন্দ্রের সময় দেবাংশী সশরীরে উপস্থিত। কৈবর্ত বিদ্রোহে দেবাংশীরা কী করেছিল? বল্লাল সেন এদের মানুষ বলে গণ্য করেনি, নইলে এমন বিধান একটা ছাড়ত মশামাছি-পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়ে ওদের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিতে হত। কিন্তু তখন ওরা ছিল। তারপর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রে, তিস্তায়, করতোয়ায় কত জল গড়াল, বখতিয়ার খিলজি, হোসেন শাহ, শায়েস্তা খাঁ, আলিবর্দি, সিরাজদৌল্লা মাটির সঙ্গে মিশে গেল, দেবাংশীরা মাটির ওপরেই বিচরণ করে। সমুদ্রের ওপার থেকে সায়েবরা এল, সায়েবরা গেল, নতুন সায়েবরা চেপে বসল, দেবাংশীদের বিনাশ নেই। বাংলা জুড়ে কতকালের শয়তানি, জোচ্চুরি আর হারামিপনা চলে আসছে, প্রতিবাদও হচ্ছে আবহমানকাল ধরে। এসবের এই সর্বকালীন চেহারাটি অভিজিৎ নিয়ে এসেছেন অসাধারণ শক্তির সাহায্যে। কাহিনীর শেষে দেখি থিকথিক করছে ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী মানুষের ভিড়। শয়তান এসে তাড়া-খাওয়া-কুত্তার মতো আশ্রয় নিয়েছে খেরা থানের গণ্ডিতে। ঐ জায়গাটা তখন পর্যন্ত ফাঁকা। এখনও ওটা ফাঁকাই রয়েছে। ঐটা দখল করার জন্য অভিজিৎ কোনো উপদেশ দেন না, জায়গাটা কেবল দেখিয়ে দিলেন।

এর বেশি ইঙ্গিত কি কোনো শিল্পী দিতে পারেন? এরকম লেখায় অভিজিৎ যে-সংযম দেখাতে পারেন তা কিন্তু কোনো অলৌকিক শক্তি থেকে নয়, বরং দেশের, সমাজের ও ইতিহাসের ভেতরকার স্রোতটি বুঝতে পারেন বলেই এখানে বড় মাপের শিল্পী হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

এই হাজার বছরের শোষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত রাষ্ট্র এই কাজে ব্যবহার করে চলেছে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি। কিন্তু তাতেই কি শেষরক্ষা হয়? দেবাংশীর মতো শাশ্বত রঙ আইনশৃঙ্খলা গল্পে নেই, রাষ্ট্র এখানে সশরীরে বিদ্যমান, সাম্প্রতিক পশ্চিম বাংলায় শোষণের জন্য ব্যবহৃত আধুনিক কায়দাকানুন এই গল্পে উপস্থিত। ব্যুরোক্র্যাট-টেকনোক্র্যাটের মনকষাকষি, মন্ত্রীদের এর ওর পেছনে লাগা, এসবে গুরুত্ব যা-ই হোক, এ থেকে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও নিয়মকানুনের পোজ-মারা-প্রশাসনের ভেতরটা একটু দেখা যায়। এই প্রশাসনকে কবজা করার কাজে সতত সক্রিয় রাজনীতিকেও অভিজিৎ ঠিকঠাক শনাক্ত করেন। সমাজতন্ত্রের নাম করে যে-কমরেডরা ভোটের সুড়ঙ্গপথে ক্ষমতায় আসীন হয় তাদের পূর্বসূরিদের মতো তাদেরও একমাত্র লক্ষ্য সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার পর কংগ্রেসের ষণ্ডা-পাণ্ডাদের সঙ্গে এই কমরেডদের আর পার্থক্য থাকে না। প্রশাসনের উন্নয়নের একটি ভূমিকা ইদানীং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এই উন্নয়নের পথে শোষণব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কীভাবে আসছে তার ইঙ্গিত রয়েছে আইনশৃঙ্খলা গল্পে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণস্পৃহা ও চালিয়াত রাজনীতির বাস্তবায়নের হাতিয়ার প্রশাসন, কিন্তু স্থির ও অচঞ্চল কোনো অমোঘ শক্তি নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শোষণের শিকার নিহত টুইনার বিধবা স্ত্রী কুশলী খোদ হাকিম সাহেবের ঘরে প্রসব বেদনায় কাঁপে। কুশলী তার শিশুকে জন্ম দেবে বলে হাকিম সাহেব তাঁর সমস্ত লোকলস্কর নিয়ে তাঁর এজলাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রকে বাইরে ঠেলে দিয়ে কুশলী তার নিহত স্বামীর জ্যান্ত রক্তপিণ্ডকে পৃথিবীতে অবতরণের উদ্যোগ নেয়। নবজাতকের চিৎকারে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা চালাবার ঘরের দেওয়াল ও কাচ থরথর করে কাঁপে। আমরা সবাই টের পাই যে কুশলীর ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙে পড়েছে। এবার চরম আঘাতের জন্য প্রতীক্ষা। চরম আঘাতে অভিজিৎ সেনের বিশ্বাস অবিচল। সত্তরের দশকে ভারতে যে-আন্দোলন সবকিছুর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তার ভেতর তিনি মানুষ। মহাবৃক্ষের আড়াল গল্পের অনুপমও একদিন অভিজিতের সহযাত্রী ছিল। বিস্ফোরণ ঘটানো সেই আন্দোলন এখন আড়ালে পড়ে গেছে, অনুপম চাকরি করে সেইসব প্রতিষ্ঠানের একটিতে যাদের বিরুদ্ধে একদিন তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল সমস্ত পিছুটান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। সত্তরের দশক একেবারে নিভে যায়নি। ভিয়েতনাম থেকে চালান হয়ে আসা বিশাল বৃক্ষের ভেতর থেকে বেরুনো বুলেটের সিসে হাতে নিয়ে অনুপম তার ধমনীতে আবার রক্তচলাচলের সাড়া পায়। মৃত বুলেট লুপ্ত বারুদের গন্ধে তাকে ফের চঞ্চল করে তুলতেও তো পারে। পতন হওয়ার পরেও এই বৃক্ষ দুটো করাত ভেঙে ফেলেছে। এর সম্ভাবনা তা হলে বিনাশ করবে কে?

...

বাজিকরদের দীর্ঘ পদযাত্রায়, ধামান সাঁইয়ের ডাকে, দেবাংশীর আহ্বানে, কুশলীর নবজাতক সন্তানের প্রবল চিৎকারে, করাতের কাছে মহাবৃক্ষের নত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে

অভিজিৎ সেন হাজার বছরের বন্দি মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে ঘোষণা করেন। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনায় এই স্পৃহা সুপ্ত রয়েছে, এই মানুষের ভাষায় এর খোঁজ পাওয়া যায়, তার গানে, তার শ্লোকে, তার প্রবাদে এরই প্রকাশ। তার সংস্কার ও সংস্কার ভাঙা, তার বিশ্বাসে ও বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলা—এসবের ভেতর যে-দ্বন্দ্ব তার মূলে মানুষের মুক্তির কামনা। অতীত থেকে, বর্তমান থেকে, ভাষা থেকে, গান থেকে, শ্লোক থেকে ও পুরাণ থেকে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ অবিরাম শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে। এই শক্তি-অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত শিল্পী অভিজিৎ সেন। এই অনুসন্ধানের কাজটি সুখের নয়, পাঠককে স্বস্তি দেওয়ার পুণ্যও এখান থেকে অর্জন করা অসম্ভব। রহর যে-হার বাজিকররা হাতে তুলে নিয়েছিল তারা তা-ই বাজিয়ে সবাইকে ডাক দিয়ে চলেছে। তাদের বহুকাল আগেকার দেশের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া পবিত্র নদী ঘর্ঘরার উত্তাল ঢেউ এই বাজনার সঙ্গে সংঘাত করলেও এর আওয়াজ মিঠে নয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা, মেঘনা যমুনার মতো ঘর্ঘরাও বিশাল ও প্রাচীন সব তীরভূমি ভেঙে একাকার করে ফেলে। হাড়ের বাজনায় যে-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাতে ভাঙনের নিশ্চিত আওয়াজ শোনা যায়।

লেখকের দায়

সাহিত্যে পুরস্কার দেওয়ার সময় লেখককে একটি অলিখিত শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, তা হল এই যে : তোমার লেখা অব্যাহত রাখতে হবে, এবং লেখার মান বাড়ুক কি নাই বাড়ুক অর্জিত মান যেন পড়ে না-যায় সে দিকে লক্ষ রাখবে। এই শর্ত যে-কোনো লেখককে সবসময় তটস্থ রাখার পক্ষে যথেষ্ট। একথা, আমার মনে হয়, উপন্যাস-লেখকের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য।

উপন্যাসের সৃষ্টি ঔপনিবেশিক যুগে, অথচ এর অবস্থান ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিপক্ষেই। উপন্যাসে সব স্তরের মানুষের যে-বিপুল সমাবেশ ঘটে, শ্রেণী গোষ্ঠী সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে-বিচিত্র জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি হয়, মানুষের সৃজনশীল কল্পনার যে-বাঁধভাঙা প্রকাশ ঘটে তা ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থার প্রতি তো রীতিমতো হুমকি। এজন্যই কি *দন কিহোতে*-র মতো শিল্পকর্মকে দুশো বছর লাতিন আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশগুলোয় নিষিদ্ধ করা হয়? কিন্তু উপন্যাসের খোলামাঠে বিপুল লোকসমাগম ও মানুষের স্ফূর্ত কল্পনার উড়াল ঠেকায় কে? স্পেনের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতের কাহিনী তাই মদের পিপেয় চালান হয়ে দিব্যি ঢুকে পড়ে বলিভিয়ায়, পেরুতে, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। প্রায় চারশো বছর আগে সের্ভান্তেস সাহেব তাঁর নাইটকে যে রুগ্‌ণ ঘোড়ায় চাপিয়েছিলেন তা এখন দাপিয়ে বেড়ায় দুনিয়া জুড়ে। ওই রুগ্‌ণ ঘোড়ার দাপটে সত্যিই অভিভূত না-হয়ে পারা যায় না।

উপন্যাস বড় হয়েছে ব্যক্তির বিকাশ ঘটতে ঘটতে। আবার ব্যক্তির বিকাশ ঘটাতেও উপন্যাসের ভূমিকা কম নয়। ওদিকে পাশ্চাত্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মেষ না-ঘটতেই তা রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে। এখন দেখি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পর্যবসিত হয়েছে ব্যক্তিসর্বস্বতায়। উপন্যাসে ব্যক্তি আসছে নানান রঙে, নানান ঢঙে।

আমাদের এই উপমহাদেশে ব্যক্তির বিকাশ প্রথম থেকেই বাধা পেয়ে এসেছে। এখানে ব্যক্তিপ্রবরটি জন্ম থেকেই পঙ্গু ও দুর্বল। পাশ্চাত্যের সর্বত্রই যেহেতু ব্যক্তিসর্বস্বতায় জয়গান, আমাদের এখানেও তাই জন্মরোগা ব্যক্তিটির দিকেই আমাদের লেখকদের অকুণ্ঠ মনোযোগ। বাংলা উপন্যাসে প্রথমে এই রুগ্‌ণ ব্যক্তির শরীরে একটু তেজ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নকল তেজ তাকে শক্তি জোগাতে পারেনি। কেবল তা-ই নয়,

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল উপন্যাসগুলোয় বরং দেশের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মর্যাদাই দেওয়া হয়। অথচ, অন্যান্য সাহিত্যের উপন্যাসে তখন প্রচলিত সংস্কার, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অবিরাম আঘাত করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শক্তির উপহার এই খঞ্জ ব্যক্তিটিই হয়ে ওঠে লেখকদের আদরের ধন। তাকে নানাভাবে তোয়াজ করাই হল আমাদের ঔপন্যাসিকদের প্রধান কাজ। দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, এবং আবার স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তি আমাদের চোখে পড়ে না। এজন্য শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে যখন লিখি তখনও পাকেপ্রকারে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই মধ্যবিত্তকে এবং শক্তসমর্থ, জীবন্ত মানুষগুলোকে পানসে ও রক্তশূন্য করে তৈরি করি। বাংলাদেশে এখন চলছে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়া। ফলে আমাদের সংস্কৃতির বনিয়াদ চলে যাচ্ছে আমাদের চোখের আড়ালে। আমাদের গান, আমাদের ছবি, আমাদের কবিতার উৎস যে-জীবন ও সংস্কৃতি তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়, সংখ্যার দিক দিয়ে বিস্ফোরণ হলেও, আমাদের উপন্যাস দিনদিন রক্তহীন হয়ে পড়ছে। একই কাহিনী নানান বয়ানে শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত। তবে ক্লান্তিও লেখকরা লুফে নেন এবং জীবনে একেই একমাত্র সত্য বলে জাহির করার সুযোগ খোঁজেন।

বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে দেরিতে। বাঙালি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমাজে উপন্যাসের চর্চা শুরু হয়েছে বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাসরচনার অনেক পরে। বাংলাদেশের প্রধান ঔপন্যাসিক প্রয়াত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ধর্মীয় কিংবা সামাজিক কুসংস্কারকে গৌরব দেওয়ার কাজে লিপ্ত হননি। বরং, এই সমাজের ধর্মান্ধতাকেই তিনি প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছেন। নিজ সম্প্রদায়ের শেকড়সন্ধানের প্রয়াস এবং পশ্চাৎপদ সংস্কারকে আঘাত করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন একই সঙ্গে। তাঁর শেষ উপন্যাসে তাই তাঁকে একটি স্বকীয় ভাষারীতিও তৈরি করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না-করে আমরা বরং পাঠকের মনোরঞ্জনের কাজেই নিয়োজিত রয়েছি। আমরা কৃশকায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখবেদনার পাঁচালি গাই, কিন্তু এতে উপন্যাসে কি ব্যক্তির যথাযথ সামাজিক অবস্থানটি কোনোভাবেই প্রকাশিত হয়? এতে শেষে যে-ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করি সে কিন্তু রেনেসাঁসের সেই শক্তসমর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নয়, বরং দায়িত্ববোধহীন, ফাঁপা এক প্রাণীমাত্র।

আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি অনুসন্ধান করলে সেখানে বাঙালি জাতির একটি অভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিচয় খোঁজা তো দূরের কথা, আমরা শিক্ষিত মানুষেরা, আমাদের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলো, আমাদের স্ফীতোদর রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিন থেকে সম্প্রদায়গুলোকে নানাভাবে উসকানি দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিই। সমগ্র জাতির বিকাশে এমন আচরণ কখনোই সহায়ক হতে পারে না। নিঃসন্দেহে, সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'—এটুকু জেদ না-থাকলে কারও শিল্পচর্চায় হাত দেওয়ার দরকার কী?

আজ এই পুরস্কার নিতে আনন্দের সঙ্গে আমার একটু সংকোচও হয় বইকী। দেশের কী জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না-গিয়ে যদি নিজের আর বন্ধুদের আর আত্মীয়স্বজনের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকেই লালন করি তো তাতে হয়তো মধ্যবিত্ত কী উচ্চবিত্তের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা থেকে তারা নিজেদের জীবনযাপনে যেমন কোনো অস্বস্তিও বোধ করবে না, তেমনই পাবে না কোনো প্রেরণাও। তা হলে আমার যাবতীয় সাহিত্যকর্ম ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে মনে হবে নেহাতই তোতলা বাখোয়াজি।

সায়েবদের গান্ধি

১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে বিজ্ঞাপিত স্যার অ্যাটেনবরো পরিচালিত *গান্ধি* নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র সমালোকদের বিচারে ১৯৮২ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বলে পুরস্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ছবিটির জন্য প্রচুর দর্শকের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি পৃথিবীর সর্বকালের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব, চার দশকেরও বেশি সময় জুড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসসৃষ্টিতে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। এর মধ্যে কখনো কখনো এখানকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তিনি মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। কোনো সিনেমায় প্রদর্শিত না-হলেও বাংলাদেশেও *গান্ধি* অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং ভি.সি.আর.-এর কল্যাণে অনেকে ছবিটি দেখেছেন এবং এর ওপর কয়েকটি মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে আইনজীবী হিসাবে গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ আন্দোলন পরিচালনা থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালে তাঁর ভারত-প্রত্যাবর্তন এবং এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংস্কারমূলক ও 'আধ্যাত্মিক' তৎপরতার পর ১৯৪৮ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীকাল সময় হল *গান্ধি* চলচ্চিত্রের পটভূমি। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমাদের উপমহাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত তৎপরতার প্রত্যেকটির সঙ্গে তিনি জড়িত। অনেক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে, কোনো কোনো আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করেন। কোনো কোনো আন্দোলন সম্পর্কে তিনি নীরব, আবার কোনো-কোনোটি এড়িয়ে গেছেন। নীরব থেকে বা এড়িয়ে গিয়েও গান্ধি তাঁর ভূমিকা পালন করে গেছেন। এই সময়কালে কেবল শৌচাগারে ছাড়া তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কোনো জীবন নেই। তাঁর খাওয়াদাওয়া, পোশাক, চলাফেরা—জীবনযাপনের সর্বাংশে গান্ধি অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনী নিয়ে সৃষ্ট যে-কোনো শিল্পমাধ্যমের ভিত্তি তাই রাজনৈতিক এবং এর বিচারও রাজনৈতিকভাবে হওয়া দরকার।

অ্যাটেনবরোর প্রধান বিবেচনা গান্ধির অহিংসা। হিংসা বা ক্রোধ বা ভালোবাসা বা ভয়ের মতো অহিংসাও একটি মানবিক প্রবৃত্তি। অহিংসা একটি রাজনৈতিক মতবাদ বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। অহিংসাকে এমনকী আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলে চালানোটাও অসম্ভব কাণ্ড। গান্ধির বহুকাল আগে কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ অহিংসার বাণী প্রচার করেন, কিন্তু অহিংসা তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। অহিংসা ছিল নির্বাণলাভের জন্য অনুসরণীয় পথ। অ্যাটেনবরো অহিংসাকে মনে করেন গান্ধির প্রধান লক্ষ্য বলে। ছবির প্রথম দিকেই দেখি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর শ্বেতকায় শাসকদের নিপীড়নের প্রতিবাদে গান্ধি অহিংসা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আয়োজন করেছেন। কিন্তু, সেখানে তিনি কতটা সফল হলেন তার কোনো পরিচয় এই ছবিতে নেই। অহিংসা ব্যাপারটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া অ্যাটেনবরোর পক্ষে অসম্ভব, এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণাও তাঁর নেই। এ–সম্বন্ধে গান্ধির নিজেরই সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা কী আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংসা আন্দোলন পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধি আর–কিছু তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অ্যাটেনবরো সযত্নে সেসব এড়িয়ে গেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র জাতির বিদ্রোহদমনের জন্য ইংরেজ শাসকদের আক্রমণকালে গান্ধি ইউনিয়ন জ্যাক সমুন্নত রাখার জন্য ইংরেজদের সরাসরি সহায়তা করেন। এই আক্রমণ কি অহিংস ছিল? আরেকটি আফ্রিকান জাতি জুলুদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের সময় ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করেন। এমনকী প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের সেবা করার জন্য গান্ধি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা বিদেশি বেসামরিক নাগরিকের সেবা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার চার মাস পর গান্ধি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনে গান্ধি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সরাসরি সেবা করতে উৎসাহী ছিলেন এবং তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে সাহায্য করতেও তাঁর বাধেনি।

গান্ধি ভারতে ফেরার আগেই তাঁর খ্যাতি এখানে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে নানারকম খবর এসেছে, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে এখানে জনমতসৃষ্টির কাজ চলছে এবং ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য তাঁর সহানুভূতির কথা ঘোষণা করেছেন। আফ্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে গান্ধিকে যতটা দৃঢ়চিত্ত ও সংকল্পবদ্ধ দেখানো হয় তা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। তা–ই যদি হত তা হলে হার্ডিঞ্জ সাহেব তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন কেন? তবে এটা ঠিক, ভারতীয়দের অনেকেই তাঁর দেশে ফেরায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।

ভারতে ফিরে এসে গান্ধি স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের হতাশ করেন। প্রথমদিকে তাঁকে নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এইসব সংবর্ধনাসভায় যাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একজন ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। গুজরাট সভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঐ সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি নিজেও একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। *Gandhi as I Know Him* বইতে যাজ্ঞিক জানান, প্রত্যেকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাধীনতাকামী যুবকদের বক্তৃতার জবাবে গান্ধি কোনোরকম রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করেননি। এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর নিপীড়ন বা তার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

গান্ধি ছবিতে দেখি, রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশের আগে গান্ধি বেরিয়ে পড়েন ভারত-দর্শনে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে গান্ধির স্বদেশ-দর্শন ছবির দর্শকদেরও ভারতের বিচিত্র নিসর্গের সঙ্গে একটুখানি পরিচিত করে বইকী। গান্ধি নিজেও ভারতীয়, এবং ভারতীয়দের সমস্যায় উত্তেজিত হয়েই তাঁর রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা। রাজনীতি করতে করতে দেশবাসীর সমস্যা তাঁর কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে এবং তাঁর রাজনীতিও সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছবি দেখে মনে হয় সদ্য-অর্জিত ভারত-প্রেমে গদগদ তরলমতি কোনো সায়েবের মতো গান্ধি ভারত-পরিচিতিলাভের জন্য হিচহাইকে বেরিয়েছিন। রাজনীতি যে স্বতঃস্ফূর্ত একটি প্রক্রিয়া—ছবির প্রথমদিকেই এই সত্যটিতে অস্বীকার করা হয়েছে।

স্বতঃস্ফূর্ততা, সামঞ্জস্য ও সততার অভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অহিংসার বক্তব্য প্রচারের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনায় গান্ধি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে মানুষ জঙ্গি হয়ে ওঠে এবং চৌরিচোরায় জনতার আক্রমণে পুলিশ নিহত হয়। দেশবাসী তাঁর অহিংসা নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে—এই আক্ষেপ করে গান্ধি জনতার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এই ঘটনাটিকে দেখানো হয়েছে সমগ্র ভারতবাসীর হিংসা-প্রবৃত্তির অমানবিক প্রকাশ বলে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম এইভাবে চিহ্নিত হয় গুণ্ডামি হিসাবে। আবার অন্যদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিশ্বস্ত প্রতিফলন সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, ঘটনাটি একটি মাথাগরম ইংরেজ সেনাপ্রধানের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের বীভৎস কার্যকলাপ হল সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। লাহোরে কার্ফু-আদেশ লঙ্ঘনকারী নাগরিকদের ওপর গুলি চালানো হয়, দিন-দুপুরে দোকানপাট লুট করা হয়। গুজরানওয়ালার বিক্ষোভরত নিরস্ত্র মানুষের ওপর রীতিমতো বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল এবং এই হত্যাযজ্ঞের নায়ক সেনাবাহিনীর মেজর কার্বি খুব বাহাদুরির সঙ্গে তাঁর তৎপরতার কথা ঘোষণা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের নিপীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি। অথচ অ্যাটেনবরোর ছবিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কসাই জেনারেল ডায়ারের ওপর ব্যক্তিগতভাবে সব দোষ চাপানো হয় এবং ইংরেজ বিচারকরা পর্যন্ত তাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বলে উপস্থাপিত করার সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা চালান। সাম্রাজ্যবাদকে এইভাবে রেহাই দেওয়ার কায়দা কিন্তু দর্শকের চোখ থেকে রেহাই পায় না। তবে এই ব্যাপারে গান্ধি স্বয়ং নানাভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু, ঘটনাটি যে একজন বদমাইশ ইংরেজের কাণ্ড নয়, সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অংশবিশেষ—এই সত্যটি স্বীকার করার জন্য গান্ধি প্রস্তুত ছিলেন কি না সন্দেহ। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি বর্জন করেন। কাইজার-ই-হিন্দ উপাধিটি কিন্তু গান্ধি তখনও আঁকড়ে ছিলেন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারি উপাধি বর্জনের জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে পর্যন্ত এটাকে তিনি সগৌরবে বহন করে গেছেন।

অহিংসার গোঁজামিল ও অসামঞ্জস্যের জন্য অ্যাটেনবরোকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। তাই ভারতীয় রাজনীতির যেসব ঘটনা গান্ধির অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলো এড়ানো হয়েছে। এমনকী গান্ধির এই উদ্ভট ও সাম্রাজ্যবাদতোষণ পদ্ধতির কাছে যাঁরা মাথা নত করেননি এমনসব ব্যক্তিত্বকে ছবি থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য অ্যাটেনবরো দ্বিধা করেন

না। নানারকম রাজনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। *গান্ধি* ছবি দেখে তা বোঝা অসম্ভব। ১৯৪৬ সালে বম্বের নৌ-বিদ্রোহের আভাসমাত্র নেই। এমনকী ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গান্ধি যার প্রধান নেতাদের একজন—তারও চিহ্নমাত্র অনুপস্থিত।

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে গান্ধির আপোসমুখী নীতির জোর বিরোধিতা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। জালিয়ানওয়ালাবাগ অসহযোগ প্রভৃতির কয়েক বৎসর পরেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে গান্ধি তাঁর জেদ অব্যাহত রাখেন। ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির উত্থাপকদের মধ্যে জওয়াহরলাল নেহরুকে গান্ধি নিজের পক্ষে পটাতে পারলেও সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতার পক্ষে অবিচল থাকেন। স্বাধীনতার পক্ষে জওয়াহরলালের অনেক বিপ্লবী উক্তি সত্ত্বেও গান্ধি বুঝতে পারেন, জওয়াহরলালকে নিজের কবজায় নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ নয়। একথা মানতেই হয় যে, সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতিতে স্ববিরোধিতা ছিল। কিন্তু, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা গান্ধি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতি থেকে তাঁকে হটাবার জন্য গান্ধি তাই উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন। একই কারণে অ্যাটেনবরোও সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চিত্রায়িত করার সংকল্প নেন। অহিংসা নীতি যদি সৎ ও স্বতঃস্ফূর্ত হত এবং এর যদি কোনোরকম দার্শনিক ভিত্তি থাকত, তবে সুভাষচন্দ্র বসুকে উপস্থিত করে তাঁর জঙ্গি মনোভাবের বিরুদ্ধে অ্যাটেনবরো অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিতেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা বই এবং তাঁর সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মীদের লেখা পড়ে বোঝা যায় তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। গান্ধির সঙ্গে বহু বিষয়ে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছে, নিজের মতামত ও বিশ্বাসের পক্ষে দলীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি অনেক দূর পর্যন্ত চেষ্টা করতেন। কিন্তু অ্যাটেনবরোর কল্যাণে এই ছবিতে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। বল্লভভাই প্যাটেলও প্রায়ই আসেন। তাঁরও কিছু করার নেই। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির তিনি একজন পাণ্ডাব্যক্তি। কিন্তু এই ছবিতে মাঝে মাঝে তাঁড়ামো করার মধ্যে তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

জওয়াহরলাল নেহরু চাবি-দেওয়া-পুতুলের মতো গান্ধির করতালুতে হাস্যকরভাবে নাচেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রথম থেকে স্বাধীনতা, মুক্তি, সাম্য, সমাজতন্ত্র, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নিপীড়িত মানুষের ঐক্য প্রভৃতি উরধ্বনি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তিনি সিদ্ধির পরিচয় দেন। তাঁর বক্তৃতা, চিঠিপত্র এবং রচনায় তাঁর যে-মানসিক গঠন ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় ঐসব বিষয়ে জওয়াহরলাল রোমান্টিক আকর্ষণ বোধ করতেন। কিন্তু, নিজের প্রচারিত মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি তিনি জীবনেও অর্জন করতে পারেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার সঙ্গে তাঁর ঘোষিত মতামত ও চিন্তাভাবনার মিল নেই। দেশি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ তাঁর কাছে যেমন অনেক আশা করেছিলেন, হতাশ হয়েছেন ঠিক তেমনই। নিজের চিন্তাভাবনা ও মতবাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ এবং সদাসর্বদা দোদুল্যমানচিত্ত ভারতীয় রাজনীতির হ্যামলেট এই নেতা গান্ধির অভিভাবকত্ব, শাসন ও পৃষ্ঠপোষকতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। জওয়াহরলালের এই হ্যামলেটিয় দ্বিধা ও অস্থিরতা প্রতিফলিত হলে ছবিতে তাঁর ঘনঘন আসা-যাওয়াটা

তৎপর্যময় হত। অহিংসার পরম স্পর্শে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার বেদনা থেকে জওয়াহরলাল মুক্তি পান—জওয়াহরলালের এরকম একটি পরিণতির সাহায্যে অহিংসাকে পাকাপোক্তভাবে স্থাপন করার কোনোরকম উদ্যোগ অ্যাটেনবরোর ছবিতে অনুপস্থিত। এর কারণ হল যে, অহিংসার প্রচারক হলেও অহিংসা ব্যাপারটি তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। গান্ধির আমলেও জিনিসটা ফাঁপাই ছিল, শিল্পমাধ্যমে অবয়ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত ভার ও শক্তি তার মধ্যে খুঁজে বার করা অসম্ভব। এই ছবিতে জওয়াহরলালের প্রধান কাজ মাঝে মাঝে গান্ধিকে অনশন ভাঙার জন্য কাকুতিমিনতি করা। ছবিতে তিনি প্রায়ই আসেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকাই তিনি কিছুমাত্র পালন করেন না।

ব্যক্তিত্বের পরিচয় বরং পাওয়া যায় মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মধ্যে। জিন্নাহ্‌কে ভিলেন করবার দিকে অ্যাটেনবরোর দুর্বল ও অপরিণত শিল্পীসুলভ প্রবণতা প্রথম থেকে ধরা পড়ে। জিন্নাহ্‌র রাজনীতি আজ সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রাজনীতিতে বা কোনো কার্যকলাপের সমালোচনা করতে হলে রাজনৈতিক উপায়েই করা দরকার। কোনো যুক্তিতর্কের ধারেকাছে না-গিয়ে জিন্নাহ্‌কে তৈরি করা হয়েছে রগচটা ও শয়তান ধরনের এক চরিত্রে। এটা করে অ্যাটেনবরো শিল্পী হিসাবে দুর্বলতা ও চরম অপরিণতির পরিচয় দেন। তবে গান্ধির বিরোধিতায় সোচ্চার হওয়ার ফলে এর মধ্যেই জিন্নাহ্‌র স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানের পক্ষে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র এবং এর বিরুদ্ধে গান্ধি ও তাঁর অনুরাগীদের যুক্তিসমূহ অতি সরলীকৃত। পাকিস্তান মেনে না-নিলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে—জিন্নাহ্‌র এই হুমকিতে গান্ধি একেবারে থতমত খান এবং পাকিস্তান মেনে নেন। এইসব দেখেশুনে সন্দেহ হয়, অ্যাটেনবরো আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ইয়ার্কি করতে নেমেছেন। তিনি কি জানেন না যে দেশ জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করা হয় অনেক আগেই ; তা যে-প্রকট রূপ ধারণ করে তাকে গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কী বলব? আর পাকিস্তান কি গৃহযুদ্ধ এড়াতে পারল? দাঙ্গাহাঙ্গামা অব্যাহত রইল, অসংখ্য মানুষকে নিজেদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হল। এর ওপর নতুন উপসর্গ হল পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে নিয়মিত বিরোধ। গান্ধির অহিংসা ভারতীয়দের দাঙ্গা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অহিংসা ব্যবহৃত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে ঠান্ডা করে দেওয়ার কাজে। ভারতীয়দের ঐক্যের জন্যে সদিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধি এখানে অহিংসার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

জীবদ্দশায় গান্ধি ব্যবহৃত হন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা। অহিংসার নামে, আধ্যাত্মিক মুক্তি উদ্বোধনের নামে দেশবাসীদের তিনি সংগ্রামবিমুখ করে রাখার তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে তিনি তাঁর দেশবাসীকে পশ্চাৎপদ করে রাখেন। দেশের গ্রামগুলোকে স্বাবলম্বী করার জন্য গান্ধি চরকার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থনৈতিক কাঠামো কী কিংবা কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চরকা কী ভূমিকা পালন করবে—এ-সম্বন্ধে গান্ধি কিছুই বলতে পারেননি। কাপড় বোনা আমাদের দেশে নতুন জিনিস নয়। মোটা কাপড় থেকে শুরু করে ঢাকার মসলিন বা জামদানি বা মুর্শিদাবাদ-রাজশাহীর সিল্ক বোনার ইতিহাস হাজার বছরের। কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। চরকা যে মানুষের অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনে কী কাজে আসবে সে-সম্বন্ধে গান্ধির স্বচ্ছ কোনো ধারণা ছিল না। তা গান্ধিরই যখন

এই অবস্থা, অ্যাটেনবরোর ধারণা তখন কী হতে পারে? গান্ধির চেয়ে পরে এক ধাপ ওপরে উঠে অ্যাটেনবরো চরকার মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধান করেন।

ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের সঙ্গে একই সারিতে নেমে আসার জন্য গান্ধি আহারে ও পোশাকে কৃচ্ছ্রতা পালন করেন। এইসব কৃচ্ছ্রতাসাধন ছিল বহুবিজ্ঞাপিত এবং এর জন্য যে-আয়োজন করতে হত তাতে খরচও হত প্রচুর। 'It takes a great deal of money to keep Bapu in poverty'—কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডুর এই উক্তিতে গান্ধির শৌখিন দারিদ্র্যচর্চার স্বরূপ ধরা পড়ে। তাঁর অহিংসা, তাঁর চরকা, তাঁর দারিদ্র্যচর্চা—সবই নানারকম অসঙ্গতি ও গোঁজামিলে ভরতি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁর অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে ব্যবহার করে নিজেদের শাসনের পক্ষে। এইরকম রাজনৈতিক স্বভাবের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী প্রসারিত গণআন্দোলনকে গান্ধি ধিক্কার দেন আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলা বলে এবং দেশের বিশাল জনশক্তির উত্তুঙ্গ প্রবাহ তাঁর কল্যাণে প্রবাহিত হয় সংগ্রামবিমুখ সংস্কারবাদী আন্দোলনে।

এই গোঁজামিল ও অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্য ও উদ্ভট চিন্তাভাবনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা অ্যাটেনবরোর সাধ্যের বাইরে। সেরকম ইচ্ছাও তাঁর নেই। বরং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশাল ও ব্যাপক পটভূমির দিকে চোখ মেলেও তাঁর ক্ষীণদৃষ্টির জন্য আন্দোলনের মূল সত্য, মূল শক্তি ও সামগ্রিক রূপ তাঁর চোখের আড়ালে রয়ে যায়। খণ্ডিত ও টুকরো টুকরো পটভূমিতে বিদঘুটে তত্ত্বগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মহা জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন চালান। এই ছবিতে তাই বস্তুনিষ্ঠতার অভাব খুব প্রকট।

গান্ধিজীবনকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে অ্যাটেনবরো ব্যর্থ হয়েছেন। একটি শিল্পকর্মে যে-বিষয় অবলম্বন করে কোন বক্তব্য প্রকাশিত হবে তার সঙ্গে শিল্পীর গভীর পরিচয় থাকা অপরিহার্য। এমনকী শিল্পীর নির্লিপ্ততা আয়ত্ত করতে হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে গভীর সংলগ্নতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, তাদের জীবনযাপন, তাদের বিশ্বাস ও সংশয়, তাদের সংঘাত ও সংগ্রাম, তাদের বঞ্চনা ও বেদনা সম্বন্ধে মনগড়া ও উদ্ভট ধারণা প্রয়োগ করার কাজে ব্যস্ত থাকায়, বরং বলা যায়, ব্যতিব্যস্ত থাকায় ছবিতে গান্ধি-ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটেনি। ক্যামেরা ও অভিনয়ের অপূর্ব দক্ষতা সত্ত্বেও ছবিটি দর্শকের মনে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে কিংবা নতুন করে দেশ ও নিজেকে উপলব্ধি করাতে ব্যর্থ হয়। কলাকৌশলগত নৈপুণ্য সত্ত্বেও শিল্পকর্ম হিসাবে গান্ধিকে উঁচু আসন দেওয়া যায় না।

ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভাবান শিল্পী থাকা সত্ত্বেও গান্ধির জীবন-রূপায়ণের দায়িত্ব অ্যাটেনবরোকে দেওয়া হল কেন? এর জবাব খুব সোজা। এই উপমহাদেশের শোষক-শক্তি খুব প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত চতুর এবং সংগঠিত। বর্ণে বর্ণে ভাগ করে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উসকে দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত মানুষকে সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা এদের অনেকদিনের। শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত শোষিত মানুষ যখনই মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন খুব কৌশল করে এরা সামনে চলে আসে এবং নানারকম মুখরোচক বুলি প্রচার করে তাদের সংগ্রাম বিনাশ করে। গান্ধিকে ইংরেজরা নিজেদের অবস্থানকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ব্যবহার করেছেন এটা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হয়, গান্ধিও নিজেকে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন কেবল ইংরেজদের প্রতি গদগদচিত্ত হয়ে নয়, তাঁর দেশি শোষকশক্তিকে চিরায়ু করাই ছিল প্রধান সাধনা।

ইংরেজরা বিদায় নেওয়ার পর শোষকশক্তি বরং আরও নতুন উদ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে মানুষের প্রতিরোধস্পৃহাও বেড়েই চলেছে। ভারতের কোনো কোনো এলাকায় কেবল বিক্ষোভ নয়, প্রতিষ্ঠিত সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়ে চলেছে। সরকারকে কখনো কখনো মুষ্টি শিথিল করতে হয়েছে এমনকী কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত আপাত-প্রগতিশীল দলকে সরকারগঠনে বাধা দিতে পারেনি। এমনকী সরকার ও শোষক-শক্তি 'সমাজতন্ত্র' 'সাম্যবাদ' প্রভৃতি বুলি কপচাতেও পেছপা হয় না। কিন্তু শোষণের যারা শিকার তাদের পক্ষে এইসব মিথ্যাচারকে শনাক্ত করা কঠিন নয়। কোনটা দুধ আর কোনটা পিটুলিগোলা তা বোঝার জন্য মানুষের জিভই যথেষ্ট, এজন্য পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় না। ভারত সরকার তাই শুধু 'প্রগতিশীল' বুলি আউড়িয়ে পার পায় না। তাদের মূল কৌশলগুলোকে তাই পাশাপাশি চালু রাখা দরকার। ধর্ম, আধ্যাত্মিক শক্তি, অহিংসার মহিমা, শ্রেণীনিরপেক্ষ প্রেম-শোষণের পুরনো হাতিয়ারগুলো শানানো শুরু হয়। জওয়াহরলাল নেহরু ঘোরতর সংশয়বাদী হওয়া সত্ত্বেও যদি গান্ধির আধ্যাত্মিক মহিমার কাছে মাথা নত করতে পারেন তো তাঁর উত্তরসূরিরা সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করেও গান্ধির একই মাহাত্ম্যকে প্রচার করতে পারবেন না কেন? জীবিত গান্ধিকে শোষকশক্তি ব্যবহার করে ইংরেজদের সাহায্যে। মৃত গান্ধিকে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ইংরেজ কেন, যে-কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য নিতে তারা পেছপা হবে না।

এখন অ্যাটেনবরো-ধরনের কলাকুশলীকে তাদের খুব দরকার। গান্ধির ওপর ভর করে মানুষের শোষণমুক্ত হবার সংগ্রামস্পৃহা দমন করার জন্য এরকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে যে-কোনো দেশের সৎ ও প্রতিভাবান শিল্পীর ইতিহাসবোধ, শিল্পবোধ, মর্যাদাবোধ এমনকী সাংস্কৃতিক রুচিতে বাধত। মানুষের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে জব্দ করাই ভারতের নতুন সায়েবদের প্রধান দায়িত্ব। তখন সায়েবদের সহায়ক শক্তি হিসাবে গান্ধিকে চাগিয়ে তুলতে পারলে এই সায়েবদের বরং সুবিধা। অ্যাটেনবরোর কাছে ধরনা না-দিয়ে তাদের তাই উপায় কী?

গুন্টারগ্রাস ও আমাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার

গুন্টার গ্রাসের *টিন ড্রাম* পড়ি ১৯৭১ সালে।

পূর্ব বাংলায় তখন ঘোরতর পাকিস্তান এবং রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেনাবাহিনী একনাড়াগে মানুষ খুন করে চলেছে। ঢাকার রাত্রিগুলো তখন কারফ্যু-চাপা, ব্ল্যাক-আউটের বাধ্যতামূলক অমাবস্যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। গলির মাথায় বড় রাস্তায় আর্মির ট্রাক চলে যায়, গ্রাস ফ্যাক্টরির শ্রমিক কলোনিতে ব্রাশফায়ার চলছে শুনে বুঝতে পারি আরও কয়েকটা মানুষ লাশে পরিণত হল। গলির ভেতর জিপ থামলে নিজের হার্টবিট সারা ঘর জুড়ে গুলিবর্ষণের ধ্বনি হয়ে ওঠে। মিলিটারি বুটের সদম্ভ পদক্ষেপে আবার এই শব্দ চাপা পড়ে। এই বুট ঘা মারতে পারে আমার দরজায়, আবার থামতে পারে প্রতিবেশীর ঘরের ভেতর ঢুকে। পরদিন পাড়ার কয়েকজন মানুষকে দেখা যায় না। আর্মির জিপ•জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের কোথায় নিয়ে গেছে, তারা আর কোনোদিন ফেরে না। সকালবেলায় রাস্তায় বেরুলেও খালি মিলিটারি। তাদের কাজের বিরতি নেই। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের খোঁজে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বস্তিতে, বাজারে। আগুনের গ্রাস থেকে পালাতে গিয়ে বাজারের লোকজন মারা পড়ে ব্রাশফায়ারের সামনে। বিকালবেলা হতে-না-হতেই রাস্তাঘাট শুনশান, সন্ধ্যা হতে-না-হতে গভীর রাত। আবার কারফ্যু; আবার ব্ল্যাক-আউট, বুটের সদম্ভ পদচারণা, ব্রাশফায়ার নরহত্যার যজ্ঞ। এই আতঙ্কে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কাজটা করতেই হাঁপিয়ে উঠি।

ঐ সময় পড়ি *টিন ড্রাম*। অসকার ড্রাম পেটায় আর তার আকাশফাটানো আওয়াজ কানে ঢোকে বজ্রপাতের মতো। এবং কানের পর্দা ছিঁড়ে চলে যায় মগজে, মগজ থেকে এ-শিরা ও-শিরা হয়ে পড়ে রক্তধারার ভেতর। অসকারের ঐটুকু হাতের বাড়ি এতটাই প্রচণ্ড যে তা ছাপিয়ে ওঠে মেশিনগান স্টেনগানের ব্রাশফায়ারকে। আমরা কয়েকজন বন্ধু একে একে বইটা পড়ি আর হাড়ের মধ্যে মজ্জার কাঁপন শুনি : ঘোরতর বিপর্যয়েও মানুষ বাঁচে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও বাঁচা যায়। বাঁচার ইচ্ছা যদি তীব্র হয় তা হলে তা-ই পরিণত হয় সংকল্পে। তখন মৃত্যুর আতঙ্ক মাথা নত করে।

টিন ড্রাম কিন্তু আমাদের বিজয়ের ডঙ্কা শোনায়নি। বিজয় সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রেরণা ও একমাত্র ভরসা ছিল আমাদের প্রতিরোধের অদম্য স্পৃহা। সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনে এই স্পৃহা নতুন নতুন শিখায় জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু কবুল করতে দ্বিধা নেই, ১৯৭১

সালের শেষ কয়েকটা মাস অসকারের ড্রামের ডম্বরু আমাদের ভয় ও আতঙ্ককে শ্লেষ, কৌতুক, বিদ্রূপ ও ধিক্কার দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখতে আমাদের প্ররোচিত করে। নিজেদের আতঙ্কের এই ময়না–তদন্তের ফলে আতঙ্ককে বাগে আনা সহজ হয়েছিল।

ঐ বছরের শেষে আমাদের দেশ থেকে পাকিস্তান লুপ্ত হয়, ঐ ভয়াবহ আতঙ্ক ও উত্তেজনা থেকে আমরা রেহাই পাই।

দিন যায়। আরও অনেক বইয়ের সঙ্গে গুন্টার গ্রাসের আরও বই জোগাড় করে পড়ি। তাঁর কবিতা পড়ি। এখানে–ওখানে আঁকা তাঁর স্কেচও দেখি। বেশির ভাগই আত্মপ্রতিকৃতি। অদ্ভুত, ভয়াবহ ও বীভৎস সব ছবি। ১৯৮৫ সালে এক সন্ধ্যায় *টিন ড্রাম* চলচ্চিত্রটা দেখে ফেলি।

চলচ্চিত্র তো দেখা ও শোনার মাধ্যম। কিন্তু, ১৯৭১ সালে বই পড়ার সময় ড্রামের যে–পিটুনি কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল, বরং বলা যায় কানের তালা খুলে দিয়েছিল, ১৯৮৫ সালে ফিল্মে তা অনেকটা ফাঁপা মনে হল। কিন্তু ফিল্ম হিসাবে তো *টিন ড্রাম* বেশ ভালো। তবে? হয়তো ফিল্মের দোষ নয়, কয়েক বছরে আমার কানও বোধহয় ভোঁতা হয়ে গেছে।

গুন্টার গ্রাস কিন্তু ভোঁতা হননি। এই দেড় দশকে তাঁর ধার অনেক বেড়েছে। তিনি এখন খুব বড় ব্যক্তিত্ব, কেবল জার্মানিতে নয়, তাঁর তৎপরতা ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে। বড় শিল্পীর মতো কেবল নিভৃত শিল্পচর্চায় তিনি মগ্ন থাকেন না, কিংবা ব্যাপক ও প্রশস্ত কর্মকাণ্ডকে তিনি মনে করেন শিল্পচর্চার অংশ। পরাশক্তির আণবিক ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য ইউরোপের যুবকদের সঙ্গে তিনি মিছিলে নামেন, বড় সমাবেশের আয়োজন করেন। স্ফীতোদর পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী চোয়াল বন্ধ করার তাগিদে উদার গণতন্ত্রী নেতা উইল ব্রান্টের নির্বাচনী প্রচারণায় শামিল হন। স্ফীতোদর পুঁজিবাদের মেদ চেঁছে ফেলার জন্য ইউরোপে যেসব তৎপরতা চলছে তাতে কেবল সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত হন না, এর সমস্ত উদ্যোগেও তিনি তৎপর। শেষ পর্যন্ত ইউরোপেও সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। পুঁজিবাদের শোষণে ক্লিন্ন ও ক্লিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের চেহারা দেখতে ছুটে আসেন এই উপমহাদেশের জনাকীর্ণ শহরে। মুমূর্ষু কলকাতা, অবক্ষয়ী কলকাতা, রুগ্ণ ও নোংরা কলকাতা তাঁকে ক্ষিপ্ত তোলে। একটি উপন্যাসের কয়েক পাতা জুড়ে এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে, এই শহরকে তিনি মনে করেন নরকের বিষ্ঠা।

এবার তাঁর পদার্পণ ঘটছে ঢাকায়। শুনলাম, আমাদের এই পুরনো শহরটির নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাপন দেখার জন্য তিনি উদ্গ্রীব। কলকাতা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া দেখে ভয় হয়, আবার আশাও হয়, এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে অসকারের ড্রামের কাঠি এবার হয়তো তিনি নিজের হাতে তুলে নেবেন।

১৫ বছর আগে এলে রাষ্ট্রের নির্যাতন ও মানুষের প্রতিরোধের আগুনে হয়তো উষ্ণ হতে পারতেন। সেই উত্তাপ এখন কোথায়? এক রাষ্ট্রের পতন ঘটেছে, অভ্যুত্থান ঘটেছে আরেক রাষ্ট্রের। কিন্তু দেশের বদল হয়নি। আগেকার রাষ্ট্রের শোষন বর্তমান রাষ্ট্রেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নির্যাতনের সরাসরি পদ্ধতিটা বাতিল হয়ে গেছে, এখন নতুন নতুন পথ খোলা হচ্ছে। পুরনো রাষ্ট্রের নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে–প্রতিরোধস্পৃহা মানুষকে দারুণভাবে জ্যান্ত করে রেখেছিল সেই স্পৃহা এখন স্তিমিত। রুখে দাঁড়াবার বদলে মানুষ এখন ভোঁতা হতাশায় নিস্তেজ। উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এখানকার কর্ণধার কারা? গুন্টার গ্রাস তরুণদের উদ্দেশে যে–বয়স্ক লোকদের পঙ্গু ও নপুংসক বলে রায় দিয়েছেন,

আমাদের রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব সেইসব চির-অপরিণত পঙ্গু ও নপুংসক লুম্পেনদের হাতে। এদের সকলের ওপর চেপে বসে রয়েছে বিদেশি পরাশক্তি। ঘাড় থেকে তাদের সরাবার কোনো ইচ্ছা বরদাস্ত করা হবে না। আর সেরকম ইচ্ছা এদের হবেই-বা কেন? নিজেদের স্বার্থ যাতে ঠিক থাকে তার জন্য এখানকার নেটিভ নেতাদের আসন অটল রাখার উদ্দেশ্যে প্রভুরা সবসময় সতর্ক। পুঁজিবাদের গতর আরও মোটাসোটা করতে হলে এই ভাড়াটে ঠ্যাঙাড়েদের টিকিয়ে রাখাটা খুব দরকার। এজন্য কত ফন্দিফিকিরই-না বার করা হয়।

কোথাও ব্যবস্থা দেওয়া হয়, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের চওড়া সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে ওঠো। উঠতে উঠতে একদিন সমস্ত দেশবাসীর সামগ্রিক মুক্তির সোনার কাঠিটি পাওয়া যাবে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহা উৎসাহে বাণী ছাড়েন, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যাঁরা এসব কথা বলেন তাঁরা কোথাকার লোক? এঁদের বাড়ি সেই দেশে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিহত হলে তাঁর রাজনীতিবিমুখ পেশাদার পাইলট পুত্রসন্তানকে ককপিট থেকে ধরে এনে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে না-পারলে সংসদীয় দল তো দল, রাষ্ট্র পর্যন্ত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। যেসব দেশে দলনেতার মৃত্যুর পর নেতার বিধবা স্ত্রী বা কন্যাকে নেতৃত্বে বসাতে না-পারলে দলের লোকজন একসঙ্গে বসতে চায় না, সেসব জায়গায় ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য এত উৎসাহ কেন? শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ-স্পৃহাকে নিভিয়ে দেওয়া ছাড়া এই উৎসাহের আর কী কারণ থাকতে পারে? এর অন্তর্নিহিত বাণী একটিই, তা হল এই : বেশি জ্বলে ওঠা ভালো নয়। মানুষ জ্বলে উঠলে এইসব পঙ্গু ও চির-অপরিণত সাবালকদের হাতে নেতৃত্ব থাকে না।

যেখানে দেখা যায় এসব ব্যবস্থায় ঠিক জুত হচ্ছে না সেখানকার ব্যবস্থাপত্র একটু আলাদা। বাইরে থেকে সেখানে প্রভুরা লেলিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। কোন সেনাবাহিনী? না, না, বাইরের লোক নয়। দেশের মানুষ দিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী। কিন্তু সেনাপতিদের মুণ্ডু থেকে ল্যাজ পর্যন্ত বাঁধা পুঁজিবাদের স্ফীতোদর শক্তির হাতের শক্ত দড়িতে। প্রভুরা ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পাঠায়। পঙ্গুর হাতে, নপুংসকের হাতে অস্ত্র পড়লে নিরন্ন ও নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর ছাড়া আর কোথায় তার প্রয়োগ হতে পারে?

এদের ওপর গুন্টার গ্রাসের ক্রোধ নানাভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়, তবে সরাসরি পাই তরুণদের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে। পুঁজিবাদের ক্রমপ্রসারমাণ মেদ চেঁছে ফেলার আন্দোলনের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। আর আমাদের এই উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বা ঠ্যাঙাড়ে সেনাবাহিনী—দুইই হল আত্মসম্প্রসারণে তৎপর পুঁজিবাদের নপুংসক ও পঙ্গু সেবাদাস। স্ফীতোদর পুঁজিবাদের মেদ চেঁছে ফেললে কি তার সাঁড়াশি থেকে বেরুনো সম্ভব? পুঁজিবাদের মেদ কমলে তার শক্তি কমবে না, বরং মেদহীন ছিপছিপে চেহারা দেখিয়ে উপমহাদেশে আরও বেশি মানুষকে দলে টানা তার পক্ষে সহজ হবে। তারপর সুযোগ পেলেই তার আসল মূর্তি ফের প্রকট হয়ে উঠবে। তখন তার সম্প্রসারণ ঘটবে নতুন বেগে।

আজ থেকে সোয়াশো বছর আগে গুন্টার গ্রাসের আরেকজন দেশবাসী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এই উপমহাদেশের শোষিত মানুষের সুখদুঃখের শরিক হতে

চেয়েছিলেন। নাম তাঁর কার্ল মার্কস। সমসাময়িক ঘটনা থেকে তিনি বুঝতে পারেন তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দেশে রাজ্যগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে কী করে তাদের নির্মম শোষণের প্রসার ঘটাচ্ছে। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাইদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কেউ-কেউ এটাকে উৎপাত বলে গণ্য করেন। আর হাজার হাজার মাইল দূরে বসেও সিপাহিদের ওপর হামলে-পড়া-ইংরেজদের মার্কস অভিহিত করেন কুত্তা বলে এবং ইংরেজকুত্তাদের সেবায় লিপ্ত ভারতীয় দলালদের ধিক্কার দিতে তাঁর কিন্তু এতটুকু দেরি হয়নি।

মার্কস জানতেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে, বিনা রক্তপাতে, পুঁজিবাদী শক্তিকে পরাভূত করা যায় না। একটি রুগ্ণ ও শোষিত সমাজের জন্য 'শান্তি' হল বিলাসিতা। তরুণ নাগরিকদের উদ্দেশে গুন্টার গ্রাসও বলেন, 'দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বড় ভালো জিনিস'। কিন্তু এটা অস্বস্তিকর, বিরক্তিকর। শান্তি দিয়ে আমরা করবটা কী? এতে দম বন্ধ হয়ে আসে, ফলে গ্যাস্ট্রিক আলসার দেখা দিতে পারে।

গুন্টার গ্রাসকে আমরা আশ্বাস দিতে পারি যে, পরাশক্তির প্রভুত্ব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ওয়েস্টমিনস্টার-মার্কা গণতন্ত্রের ভেলকি দেখিয়ে কিংবা তোপের মুখে তাদের এদেশি দালালরা শান্তিপূর্ণ অবস্থার মায়াসৃষ্টির যত আয়োজনই করুক-না, ওরকম শান্তি আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। পেটে যাদের খাবার নেই, আর কিছু না-হোক পেটটা তাদের জ্বলবেই। আমাদের গ্যাস্ট্রিক আলসারের উৎস আমাদের দমবন্ধ-করা-শান্তি নয়—দীর্ঘদিনের অনাহার-অর্ধাহার। হ্যাঁ, অনাহার ও অর্ধাহারই হল আমাদের আলসারের প্রধান কারণ। বহুকাল থেকে আমরা ঠিকমতো খেতে পাই না। এক হাজার বছর আগে লেখা সবচেয়ে পুরনো বাংলা কবিতা শুরু হয়েছে অন্নহীন হাঁড়ির খবর দিয়ে। অনাহারে-অর্ধাহারে পেটের অসুখের ঐতিহ্যও আমাদের বহুকালের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের বহু লোকালয়, বহু জনপদ উজাড় হয়ে গেছে কলেরায়। কার্ল মার্কস, এমনকী, ১৮১৭ সালের একটি মহামারির কথা উল্লেখ করেছেন। এই কলেরা প্রথম দেখা দেয় আমাদের যশোরে, সেখান থেকে এশিয়া হয়ে তা চলে যায় ইউরোপে, সেখানে প্রচণ্ড লোকক্ষয় করে যায় ইংল্যান্ডে এবং সেখান থেকে আমেরিকায়। আজ আণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য পরাশক্তিগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে, আর আমাদের দেশের মানুষের অনাহারজনিত পেটের রোগ উপশমের কোনো লক্ষণই চোখে পড়ে না।

আমাদের আলসারের ব্যথা দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠছে। স্ফীতোদর সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদকে শ্লেষ আর বিদ্রূপে বিদ্ধ করে এই ব্যথাকে চিরে চিরে দেখার মতো সময় শেষ হয়ে এসেছে, সেই বিলাসিতা আমাদের পোষায় না। পুঁজিবাদের গতর রোজই একটু একটু করে মোটা হচ্ছে, উপমহাদেশের বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন তাদের নপুংসক ও পঙ্গু কুকুরগুলোর দাঁতের ধারও বাড়ছে। অবস্থা এমন যে এদের কামড়ে আলসার-ভোগা মানুষের জলাতঙ্ক হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে। তাদের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে তাদের দিকে তাক করতে না-পারলে আমাদের আলসার ও সম্ভাব্য জলাতঙ্ক থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

গুন্টার গ্রাস আমাদের এইসব রোগের কারণ নিশ্চয়ই শনাক্ত করতে পারেন। অসকারের বয়স এখন ৬০ বছর। তবু আমাদের কাছে সে চিরকালের তরুণ। পঙ্গু ও নপুংসক স্যাবালকদের লিস্টে সে নাম লেখায়নি। তার হাতে এবার আরও শক্ত, আরও কর্কশ একটি ড্রাম তুলে দেওয়ার কথা গুন্টার গ্রাস কি বিবেচনা করে দেখবেন?

সমাজের হাতে ও রাষ্ট্রের খাতে প্রাথমিক শিক্ষা

শিশু যে-বয়সে স্কুলে যায় সেটা তার শেখার বয়স। স্কুলে যেতে পারুক আর না-ই পারুক, মনুষ্যজীবন-যাপনের জন্য প্রাথমিক ও অপরিহার্য বিষয়গুলো শেখার সূত্রপাত তার ঘটে এই বয়সেই। ভদ্দরলোক, মজুর—শ্রেণীনির্বিশেষে সব ছেলেমেয়ে এই বয়সে বাপের নাম জানে, বারের নাম, মাসের নাম শেখে, প্রতিদিন দেখা পশুপাখি, ফুল, ফল, গাছ ও লতাপাতার নাম শেখে, পরিচিত খাবার চেনে, নিজের গ্রাম বা শহরের নাম, পাড়া বা রাস্তার নাম ও দেশের নাম শেখে, দিনের বেলার মস্ত বাতির নাম ও রাত্রির ছোট বাতির নাম শিখতে বিকটদর্শন বিরাট আকারের দৈত্য ক্যালিবানকে মেলা বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও ছোটখাটো মানবশিশু শিখে ফেলে যে একটি সূর্য এবং আরেকটি হল চাঁদ। ঐ বয়সে ১, ২, ৩, ৪ গুনতে শেখে, আত্মীয়স্বজন এবং প্রভু ও চাকরদের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝে, বাপদাদার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও একটুআধটু জানতে পারে ; তার শব্দের ভাণ্ডার প্রতিদিনই একটু একটু বাড়ে। কোন শ্রেণীতে তার অবস্থান সে-সম্বন্ধেও দেখতে দেখতে সে সচেতন হয়, কাকে সমীহ করা দরকার এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে হবে কাকে, তাও মোটামুটি রপ্ত হয় এই বয়সেই। তারপর পরিপূর্ণ বালকে পরিণত হতে হতে নিজ নিজ পেশা অনুসারে সে শিখে ফেলে কোন মাসে কী ফসল বুনতে হয়, ফসল পাকলে কীভাবে তা ঘরে তুলতে হয় বা আর কার ঘরে তুলে দিয়ে আসতে সে বাধ্য; কোন ঋতুতে কী মাছ ধরা পড়ে, জাল ফেলার কায়দা, নৌকা বাওয়া, কাস্তেকোদাল ধার দেওয়া, মাটি ছেনে হাঁড়িবাসনে রূপ দেওয়া, কাঠ চেরাই বা চুল কাটা—সব ব্যাপারেই প্রাথমিক ধারণা তার এই বয়সেই ঘটে। এজন্য স্কুলে না-গেলেও চলে। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবনে স্কুলে পা না-দিয়েও ঐসব ধারণা রপ্ত করে, নিজ নিজ পেশায় দক্ষ হয়, বয়স বাড়ে আর তাদের দক্ষতাও বাড়ে এবং নানা ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। যে-পয়সার জোরে আমরা প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটি বানাই তার সিংহভাগের জোগান দেয় তারা যাদের হাতে কোনোদিন বই ওঠেনি।

এই অবস্থা তো নতুন নয়। তবু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নিজের ছেলেমেয়েকে পাঠশালা মক্তব টোল—যেরকম হোক একটি প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার এত আগ্রহ পায় কোত্থেকে? অথচ পড়াবার ক্ষমতা কিছু নেই, স্কুলে পাঠালেও বছর ঘুরতে না-ঘুরতে

লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে ছেলেকে নিজের পেশায় ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাউসটা প্রত্যেকেরই আছে, ছেলেকে একবার পাঠশালায় পাঠালে হত।

এ কি শুধু নিজের বংশধরকে ভদ্দরলোকের সিঁড়িতে তোলবার আকাঙ্ক্ষা? নাকি ভদ্দরলোকি কায়দায় পয়সা কামাবার শর্টকাট রাস্তাটা ধরিয়ে দেওয়া?

না। স্কুলে পাঠাবার সিদ্ধান্ত বাপ একা নেয় না। এই সিদ্ধান্ত লোকটি পায় সমাজের আর-পাঁচজনের কাছ থেকে। সমাজের গঠনই এমন যে ব্যক্তির সব কাজই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিকভাবে। শিশুকে পাঠশালা কী টোল কী মক্তবে পাঠাবার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল তাকে সমাজের সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না-ঢুকেও বড় হতে হতে জীবিকার চাপেই মানুষ তার পরিবারের বাইরে একটি সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় বটে, কিন্তু তা একেবারেই ছোট, পরিবারের ঈষৎ সম্প্রসারিত গোষ্ঠী ছাড়া তা আর কিছুই নয়। পাঠশালায় কিন্তু সে কেবল বাপের ছেলে নয়, কেবল অমুক বংশের সন্তান নয় কিংবা কেবল চাষি বা জেলেসম্প্রদায়ের মানুষ নয়। সেখানে সে একটি বৃহত্তর সমাজের অংশ এবং একটি দেশের নাগরিক। তার পাঠ্যসূচিতে যা-ই থাকুক, তাকে ঠিকঠাক পড়ানো হোক আর না-ই হোক স্কুলেই সে জানতে পারে যে তার গ্রাম কী শহরের বাইরে একটি সমাজের সে সদস্য এবং অবচেতনভাবে হলেও মনের গভীরে এই কথাটি তার গেঁথে যায় যে এই সমাজের কাছে তার কিছু প্রাপ্য রয়েছে, এর প্রতি কিছু দায়িত্বও তার ওপর বর্তায়। রাষ্ট্র বলে একটি শক্তির দাপট সে টের পায় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটি অনুভূতি তার মধ্যে জন্মায়।

সমাজের সঙ্গে সন্তানকে সম্পৃক্ত করাই তাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানে অভিভাবকের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধার তোয়াক্কা না-করেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন গ্রিসে জিমনাশিয়ামগুলো কেবল শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিল না, প্রাথমিক বিদ্যাচর্চাও হত ওখানেই। শিশুদের ওখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের গণ্ডি থেকে তাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে জিমনাশিয়ামগুলো ব্যবহৃত হয়েছে শিশুদের শরীর ও মনের উৎকর্ষসাধন এবং মানবিক বৃদ্ধি ও শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সামাজিক প্রাণীতে পরিণত করার জন্য। রাষ্ট্র-ব্যাপারটি ইউরোপে বেশ আগেই সংগঠিত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা খবরদারি তখন থেকেই ছিল। তবে প্রধান দায়িত্ব পালন করেছে স্থানীয় সমাজ। এই ব্যাপারে উন্নত সভ্যতা কী পশ্চাৎপদ সমাজের কোনো পার্থক্য নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন আফ্রিকান গোত্রসমাজেও ব্যায়ামাগার ছিল, শিশুদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তোলাই ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কোনো-না-কোনোভাবে ছিলই এবং এর পরিচালনার ভার ছিল স্থানীয় সমাজের হাতে। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপগুলো ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা এবং এর এককোণে থাকত গুরুমশায়ের পাঠশালা। অনেক মুদির দোকানে একপাশে মাদুর পেতে পাঠশালা বসত, তেল নুন ডাল বেচার ফাঁকে ফাঁকে পণ্ডিতমশাই বেত ও বচন দিয়ে ছেলেদের বিদ্যাদান করতেন। নিম্নবর্ণের মানুষও ভিটে ও

জমি দান করে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসত—নিজেদের ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয় করানো, একটুখানি গুনতে শেখানো—এটুকু করতে পারলেই তাদের বিদ্যাস্পৃহা মিটত। মুসলমানরা মসজিদ কী জুম্মাঘরের বারান্দায় একটু ব্যবস্থা রাখত, ফজরের নামাজের পর ছেলেরা আমপারা সেপারা পড়ত। পণ্ডিতমশাই কী ওস্তাদরা যে মস্ত দিগগজ বিদ্বান কী আলেম ছিলেন তা মনে করার কোনো কারণ নেই, সংস্কৃত কি আরবিফারসি উচ্চারণের সময় তাঁদের মাতৃভাষার প্রভাব ছিল বড় প্রকট। তবে মাতৃভাষা তাঁরা মোটামুটি জানতেন, গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান তাঁরা রপ্ত করেছিলেন। অভিভাবকদের আশাও এর বেশি ছিল না, সম্পূর্ণ গ্রামনির্ভর জীবনযাপন করার জন্য এইটুকু বিদ্যাই যথেষ্ট। গুরুমশায়ের ভরণপোষণের ব্যাপারটিও গ্রামবাসীদের সামাজিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়েছে, নাপিত কী কামার কী কুমারের মতো গুরুমশাইও গ্রামের ঘরগুলো থেকে বরাদ্দ পেতেন, তাঁর বেলায় এই বরাদ্দের হয়তো সম্মানজনক কোনো নাম ছিল।

ইংরেজদের আগে রাজা মহারাজা বাদশা নবাবদের শোষণস্পৃহা কী নির্যাতনের ক্ষমতা কম ছিল না। কিন্তু দেশের সম্পদ বাইরে পাচারের দরকার না-থাকায় নিভৃত গ্রামের মানুষকে নিংড়ে ফেলার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সাঁড়াশির মতো ব্যবহার করা একটি নিয়মিত রেওয়াজে পরিণত হয়নি। কৃষকের সীমাহীন দারিদ্র্যমোচনে এবং গ্রামীণ-সমাজের কোনো রীতিতে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে সে-সময়কার রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা প্রায় একইরকম। গুপ্ত, মৌর্য, পাল, সেন থেকে শুরু করে পাঠান মোগল শাসকদের সবাই ছিলেন নিরঙ্কুশভাবে ভারতীয়। এঁদের কেউ-কেউ ধর্মচর্চা, ধর্মপ্রচার, এমনকী নতুন ধর্মমত প্রবর্তনেও উৎসাহী ছিলেন, ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করে কেউ-কেউ নির্যাতনও চালিয়েছেন। কিন্তু এইসব কর্মকাণ্ড ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো, একবার তোলপাড় তুলে ফের থিতিয়ে আসত। সমাজকাঠামোতে বড়রকমের অদলবদল তাতে ঘটত না, সেরকম ঘটাবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এই পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে রাজা মহারাজা বাদশা নবাব সম্বন্ধে তথ্য এ রকম অনুপস্থিত ছিল। বর্ণবাদ কিংবা আশরাফ আতরাফ নিয়ে বিরূপ মনোভাব তৈরির কোনো সুযোগ কী সম্ভাবনাই সেখানে ছিল না। রাজবংশ বা অভিজাতদের ছেলেদের শিক্ষালাভ হত বাড়িতে, দেশের বা এলাকার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ তাদের বিদ্যাদান করতেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিতই ছিল।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য আংশিকভাবে লাভ করেছে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ আমলে বাসুবিহার, শাবনবিহার, সোমপুরবিহার এবং অন্যান্য বিহার সরাসরি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। চাপাই নবাবগঞ্জে কানসাটের উত্তরে গৌর-নগরীর শহরতলিতে যে-মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা নির্মিত হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র আমলে এবং রাজকোষের টাকায়। ঐ সময়কার উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপমহাদেশীয় এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহের দুই-একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলেও চারপাশের গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না সন্দেহ। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষায় এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালেও নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠসমূহ ন্যায়রত্ন, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, বিদ্যাবাচস্পতি, চতুর্বেদী প্রমুখের ন্যায়শাস্ত্র থেকে শুরু করে 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তর্কে

মুখরিত হয়ে উঠলে চরপাশের মানুষ আতঙ্কিত ভক্তিতে নুয়ে পড়ত ঠিকই, কিন্তু তাদের শিক্ষাদীক্ষায় এঁরা কোনো প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করেননি। গ্রামের পাঠশালার নিস্তরঙ্গ চেহারা স্থবির সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না-থাকলেও ধর্মীয় সংস্কারকদের মতামত প্রচারের তাগিদ কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় রক্তসঞ্চার করতে পারে। মানুষের সহজবোধ্য ভাষায় ধর্মসংস্কারকদের প্রচারের প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রচারের সময় মার্টিন লুথার বাইবেলের জর্মন অনুবাদ সম্পন্ন করেন। জর্মন গদ্যের গঠনপর্বে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ভক্তির মোহ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রত্যয়ের বন্ধনে মানুষকে বন্দি করার যে-উদ্যম তিনি নিয়েছিলেন তা সামন্তসমাজের অন্ধ-আচ্ছন্নতা থেকে মানুষকে বার করে এনে পুঁজিবাদ বিকাশে সাহায্য করে। জর্মন কৃষকদের সঙ্গে জর্মন শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করলেও নতুন মত স্থাপনের জন্য মার্টিন লুথারকে কাজ করতে হয়েছে সমাজের সর্বস্তরে। স্বভাবতই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁকে মনোযোগী হতে হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক—জন্মও মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে—বাংলায় শ্রীচৈতন্যও আত্মনিয়োগ করেছিলেন ধর্মের সংস্কারসাধনে। সেই সময়ে ধর্মব্যবস্থা ও রাজ্যশাসনের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষ। এই আস্থাকে সংগঠিত করলে মানুষকে নতুন প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হত। সেই অবস্থায় মানুষকে শিক্ষিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে চৈতন্য বা তাঁর অনুসারীদের আত্মনিয়োগ করবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। কারণ, চৈতন্য তো কোনো প্রত্যয় কী বিশ্বাস প্রচারের উদ্যোগ নেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের ভেতর ভক্তিসঞ্চার। ন্যায়রত্ন আর তর্কবাচস্পতি আর বিদ্যাবাচস্পতিদের তর্কের ধূম্রজাল থেকে টেনে এনে মানুষকে তিনি আবদ্ধ করতে চাইলেন ভক্তির মোহের ভেতর। বিদ্যাচর্চা মানুষের ভক্তিকে কখনো গাঢ় করে তোলে না, বিদ্যাচর্চায় মানুষ ভক্তিতে গদগদ হয়ে নুয়ে পড়ে না, বরং বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে ঋজু হতে শেখে। তাই যে-মানুষকে ভাই বলে, একই কৃষ্ণের জীব বলে বুকে টেনে নিলেন তার শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি রইলেন উদাসীন। তাঁর তৎপরতা তাই ভক্তিগদগদ ভালোবাসায় বাংলা কবিতায় প্রাণসঞ্চার করলেও সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। প্রাথমিক শিক্ষার স্থবির চেহারা আগের মতোই রয়ে গেল।

তবে কেন্দ্রীয় রাজধানীর আশেপাশে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাদানের রেওয়াজ মোগলদের সময়ও অব্যাহত ছিল। কিন্তু দূরবর্তী প্রদেশে এ-ধরনের আনুকূল্য মেলেনি। মোগোলদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কেন্দ্র আমাদের এখান থেকে মেলা পশ্চিমে, পুবের মুলুকে উঁচুনিচু সব শিক্ষাই সম্রাটের নজর থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষাও চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সাম্রাজ্যের পতন, সাম্রাজ্যের উত্থান, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রাজপরিবারে হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক পরিবর্তন এসব প্রাথমিক শিক্ষায় ভূমিকা পালন করতে পারল না। পাঠ্যসূচি যা ছিল তা-ই রইল। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কিন্তু থেমে ছিল না, গ্রামে-গ্রামে গুরুমশাইদের পাঠশালার সংখ্যা দিনে-দিনে বেড়েই চলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুবে বাংলার মক্তব-পাঠশালা ও টোলের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সমাজের হাতে ছিল বলে এরকম বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া, পয়সা বা ক্ষমতার জোরে কিংবা বিদ্যা ও

বৃদ্ধির কল্যাণে যে-ব্যক্তি রাজদরবারে সম্মানিত হয়েছে রাজপ্রদত্ত সম্মান তার কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি, তার গৌরববৃদ্ধির জন্য তার নিজের গ্রামসমাজের স্বীকৃতি ছিল অপরিহার্য। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু পাঠশালা বা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অনেক মসজিদ ছিল লাখেরাজ সম্পত্তির ওপর, মসজিদসংলগ্ন মক্তবের সংখ্যাও কম ছিল না। ঐ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সংশ্লিষ্ট মসজিদ ও মক্তবের বাবদ খরচ করার শর্তেই খাজনা মাফ করা হলেও সম্পত্তির সিংহভাগ ভোগ হত ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে। দেবোত্তর সম্পত্তির হালও অন্যরকম হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু এর মধ্যেও মক্তব, পাঠশালা ও টোলগুলো টিকে তো ছিলই, এমনকী সংখ্যার দিক থেকেও বাড়ছিল। সমাজে শিশুদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতাই প্রধানত এইসব প্রতিষ্ঠান চালাবার পেছনে প্রধান প্রেরণা। সমাজের বিবর্তন শ্লথ, বিকাশের গতি ধীর, তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও অপরিবর্তিত রয়ে যায়। সমাজের প্রতি রাষ্ট্র উদাসীন, সমাজও রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় আগ্রহ বোধ করে না। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই উদাসীনতা প্রতিফলিত।

এই অনড় অবস্থায় আঘাত আসে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর। তাদের উপনিবেশ-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শোষণকর্মটি একটি সুসংগঠিত কাঠামোর ভেতর বিন্যাসের আয়োজন চলল। নিজেদের দেশের আদলে ইংরেজ এখানে প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হয়। তবে এখানে তাদের নীতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন রাষ্ট্র এখানে সম্পূর্ণ মনোযোগী হল নিজেদের দেশ গ্রেট ব্রিটেন ও নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার দিকে। যেসব ব্যবস্থা নিজেদের দেশে নিয়োজিত ছিল রাজতন্ত্রের আবরণে একটি সামজকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য তা-ই এখানে ব্যবহৃত হতে লাগল শোষণকে সংগঠিত করার কাজে। নিজেদের দেশে সামন্তবাদের অবসানের পর গড়ে উঠছে নতুন বুর্জোয়াসমাজ, আর এখানে তখন চলল কৃত্রিম একটি সামন্তগোষ্ঠী তৈরির পাঁয়তারা। নতুন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ইংরেজ সরকারের নীট মুনাফা হল একটি জমিদারশ্রেণী যাঁদের হাতে শাসনক্ষমতা বা বিচারক্ষমতা কিছুই রইল না, জমিদার নামটি অর্জন করলেও সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা থেকে এঁরা বঞ্চিত। এঁদের কেউ-কেউ রাজা, মহারাজা, নবাব, খানবাহাদুর, রায়বাহাদুর প্রভৃতি অলঙ্কারে ঝলমল করে উঠলেন ; কিন্তু এ সবই গিল্টি গয়না ; নবাব কী মহারাজা তো দূর কা বাত, আমলাদের ক্ষমতাও এঁদের দেওয়া হয়নি। ক্ষমতা কী অধিকার না-পেয়ে এঁরা যা পেলেন তা হল লুণ্ঠনের সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে এঁরা হলেন সরকারের খাজনা-আদায়ের ঠিকাদার, বেতনের বদলে তাঁরা পান কমিশন, তবে কমিশনটা যে যেভাবে পারুক আদায় করুক তাতে সরকারের কিছু এসে যায় না। এই স্বাধীনতা, বরং বলা যায়, এই সুযোগ পেয়ে প্রজার রক্ত নিংড়ে নেওয়ার কাজে এঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তবে বেতনভুক খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে এঁদের তফাত এই যে এঁরা এই কাজে বহাল হয়েছিলেন বংশপরম্পরায়। তাই শোষণের মাত্রা ক্রমাগত না-বাড়িয়ে এঁদের আর গত্যন্তর রইল না। কারণ, দিনে-দিনে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের চাহিদা বাড়ে। ইংরেজ মনিবকে নকল করতে গিয়ে জীবনযাপন যেভাবে করতে হয় তাতে খরচ হয় মেলা। ছেলেমেয়েরা থাকতে চায় শহরে, তাদের জীবন বিলাসবহুল। এঁদের খরচ জোগাতে গিয়ে গ্রামের প্রজারা একেবারে সর্বস্বান্ত হতে লাগল। প্রথম খাঁড়াটা সরাসরি পড়ল চাষির ঘাড়ে। জমিদারদের নায়েব গোমস্তারা বলত 'চাষি বিনা কোই দাতা নেহি, জুতা বিনা উও দেতা

নেহি'। চাষির চেয়ে বড় দাতা কেউ নেই, আবার পাদুকাপ্রহার ছাড়া তার কাছ থেকে আদায় করাও কঠিন। এই শেষ কম্মটি করতে জমিদারবাবুদের জুড়ি ছিল না। নিরন্ন কৃষক মহাজনের কাছে ঘটিবাটি বন্ধক রেখে গোরু বেচে জমিদারের চাহিদা মেটাত। আবার বিলাতি সামগ্রীর অবাধ আমদানির ফলে ধস নামল গ্রামের কুটিরশিল্পে : তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতোর সবাই নানাভাবে আর্থিক মার খেতে লাগল। নতুন সমাজপতি জমিদাররা এই ধস ঠেকাতে আগ্রহী নন, তাঁরা বরং বিদেশি সামগ্রী ব্যবহারে নিজেরাও আগ্রহী। বিদেশি মনিবের পক্ষে খাজনা-আদায়ের কাজটুকু করতে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁদের রাখতে হল বইকী, কিন্তু একপুরুষ যেতে-না-যেতে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন শহরে। বড়বাবু মেজবাবু পুজোপার্বনে বৌরানিদের নিয়ে গ্রামের চকমেলানো দালানে পদার্পণ করতেন তো তাঁদের খাঁই মেটাবার দায় বইতে হত এই অর্ধাহার-অনাহারে ক্লিষ্ট কালোকিষ্টি চাষাভুষোদেরই। নতুন সমাজপতিদের দায়িত্ব না-থাকায় সমাজ ক্রমে অনাথ এবং তাঁদের শোষণে ক্রমে রিক্ত হতে লাগল। এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে লাগল। অ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে বাংলার প্রতি গ্রামে একটি এবং কোথাও কোথাও একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল উনিশ শতকের শুরুতেও। বিভিন্ন সরকারি দলিল ও মিশনারিদের প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ম্যাক্সমুলার জানান যে, বাংলা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮০,০০০। সামাজিক ভাঙনের সঙ্গে এই সংখ্যা দ্রুত কমে আসতে থাকে।

ওদিকে গ্রামে রাষ্ট্রের ভয়াবহ অস্তিত্ব হাড়ে-হাড়ে অনুভব করা যাচ্ছে বলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার নিয়ন্ত্রণ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তা হল না।

এর মানে এ নয় যে, নতুন সরকার শিক্ষাবিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। শাসন, পুলিশ, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি ব্যবস্থার সঙ্গে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের দিকেও তারা তৎপর হয়। এদেশে এই প্রথমবারের জন্য একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে। হান্টার, ওয়ার্ড, অ্যাডাম প্রমুখ তাঁদের প্রতিবেদনে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য, মতামত ও সুপারিশ রেখে গেছেন। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট হুইগ নেতা পার্লামেন্টারিয়ান, ঐতিহাসিক ও কবি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ওপর এখানকার শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

মেকলের আগেই 'হিন্দু কলেজে' পাশ্চাত্য শিক্ষাদান প্রচলিত হয়েছে, 'মাদ্রাসা আলিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেকলের প্রতিবেদনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেলাশহরগুলোতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই সবগুলো জেলা একটি করে এই ধরনের স্কুল লাভ করে। এরপর কয়েকটি সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৭ সালে সমগ্র দেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ, শিক্ষক নিয়োগের নিয়মবিধি নির্ধারণ প্রভৃতি দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ভার এভাবে রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হল।

তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির যথোচিত প্রয়োগের ফলে যে তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ অর্জিত হবে এ সম্বন্ধে মেকলে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন এই শিক্ষাব্যবস্থা এখানে

অনেক কালো সাহেবের জন্ম দেবে। গায়ের রঙ পালটানো না-গেলেও নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা ইংরেজ স্বার্থ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করবে বলে মেকলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ স্বার্থ সাধনেই নিয়োজিত হয়েছে এ-কথা কিন্তু ঠিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর নতুন মধ্যবিত্তের একটি অংশ অন্তত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের হাতে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটল, বাংলা গদ্য হয়ে উঠল সৃজনশীল রচনা ও উচ্চচিন্তা প্রকাশের সফল বাহন। বাংলা কবিতা মুক্ত হল পয়ারের একঘেয়ে বন্ধন থেকে। চাকরিবাকরিতে বাঙালি ভদ্রলোকেরা একটু একটু করে আসন পেতে লাগলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিদ্যার প্রভাবে ভদ্রলোকদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। এমনকী পৌত্তলিকতাকে আঘাত করে যে-ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচারের আয়োজন চলে তার অবলম্বন উপনিষদ হলেও প্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আরও পাশ্চাত্য রুচি থেকে। ফলে একটি এলিট-গোষ্ঠী তৈরি হল এবং মেকলে এইটিই চেয়েছিলেন। এই নতুন গোষ্ঠী দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থেকে দূরে রইলেন তো বটেই, এমনকী নিজেদের ভিন্ন জাতের মানুষ বলে গণ্য করতে লাগলেন। বাঙালিদের সম্বন্ধে মেকলে যে কী নিচু ধারণা পোষণ করতেন তা মর্মে মর্মে বোঝা যায় ক্লাইভের ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধটি পড়লে। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে এই জঘন্য জাতের একটি ছোট ভাগের হিতসাধন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কি না জানি না, তবে এ দিয়ে তৈরি ছোট একটি অংশকে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে এ-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে তাঁর বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক মেধার পরিচয় বহন করে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশ ও মন্তব্য থেকে মেকলের নিম্নমানের কবিসুলভ চালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, নিম্নবিত্তের মানুষের শিক্ষাদানের ভারটা তাঁরা অনায়াসে এই নতুন এলিটশ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। এখানে শ্রেণী কথাটাই তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত শিক্ষালাভ করে এই শ্রেণী তাদের জন্য মাথা ঘামাবে কেন? না, তাঁরা মাথা ঘামাননি। এঁরা কোনো জাতীয় বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হননি যে গোটা জাতের ন্যূনতম উন্নয়নের সঙ্গে নিজেদের মস্ত উত্তরণকে সম্পর্কিত করে ভাবতে পারবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি শ্রেণীর জন্ম দিল যে কোনো-না-কোনোভাবে দেশবাসীর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী অংশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তাঁদের স্বভাবে পরিণত হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সংবেদনশীল চিত্তের মনীষীর মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করি। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনিই এসেছিলেন গরিব ঘর থেকে, আক্ষরিক অর্থে কষ্ট করে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং জীবনের শেষদিন অবধি কলকাতার এলিটদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে গেছেন। তো এহেন বিরল ব্যক্তিত্বও দেশবাসীর সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজনে আপত্তি করেন যে সর্বজনীন শিক্ষা কাম্য হলেও ব্যয়বহুল বলে তা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা বাস্তবোচিত নয়। পৌত্তলিকতার কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে আত্মনিয়োজিত ব্রাহ্মদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল ভদ্রলোকদের মধ্যেই।

সমাজপতিদের উদাসীনতায় অনাথ এবং সমাজপতিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শোষণে রিক্ত হয়ে গ্রামের সমাজ ভেঙে পড়ল, সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। *শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক* বইতে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ লক্ষ করেন, 'পাঠশালা যেখানে টিকে থাকল সে

কেবল ব্যক্তিগত দায়িত্বে থাকল—ক্ষীণতর ও দীনতর রূপে। দেশি বিদেশি শোষকদের নৃশংস লুঠতরাজ সত্ত্বেও কোথাও কোথাও গ্রামের পাঠশালা টিকে থাকল এ শুধু শোষিত-লুণ্ঠিত কৃষকদের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক'।

মক্তব ও টোলের শিক্ষা তো নতুন এলিটদের স্বীকৃতিই পায়নি, আরবি-ফারসি কিংবা সংস্কৃত পণ্ডিতদের অশিক্ষিত বা বড়জোর অর্ধশিক্ষিত লোক বলে গণ্য করা শুরু হল। আর পাঠশালার শিক্ষকগণ হলেন ভদ্রলোকদের করুণা ও কৌতুকের পাত্র। ১৯১২/১৩ সালেও চাষির ছেলে সীতারামের পাঠশালার শিক্ষক হবার আকাঙ্ক্ষা তার বাপের সানন্দ অনুমোদন পায়নি। পাঠশালা করতে গিয়ে ভদ্রলোকদের হাতে সীতারামের হেনস্থাটা হল, শিক্ষাদান অব্যাহত রাখতে তার যে কী বৈরী অবস্থার মধ্যে পড়তে হল *সন্দীপন পাঠশালা* উপন্যাসে তার বর্ণনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এতটুকু অত্যুক্তি করেননি।

তবু এর মধ্যেই চাষিদের শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে বইকী। লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসাবে অনুভব করেছিলেন যে অধিক খাজনা-আদায়ের লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হলে চাষিকে প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান দেওয়া উচিত। কিন্তু এজন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হল না। চাষিকে লেখাপড়া শেখালেই তাঁর চোখ খুলে যাবে, তাকে ঠকানো কঠিন—এই গভীর উপলব্ধি থেকে তাকে শিক্ষাদানে সবচেয়ে প্রবল বাধা আসে দেশি ভদ্রলোকদের কাছ থেকে।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকে ক্ষীণভাবে হলেও প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হলে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধে এবং ক্ষুব্ধ মানুষ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে আয়ের ওপর করধার্যের প্রস্তাব করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতা করা হয় বাংলা থেকে। ব্যাপারটা এমন বিশ্রী পর্যায়ে পৌঁছয় যে একটি সাম্প্রদায়িক চেহারা নেওয়ার উপক্রম ঘটে। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ তাঁর বইতে এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। চাষিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান অনুপাত প্রায় সমান-সমান হলেও জমিদারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত। শিক্ষাপ্রদানে জমিদারদের অস্বীকৃতিকে মুসলমান নেতারা তাঁদের সম্প্রদায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিরোধিতা বলে প্রচার করলেন। ১৯০৮ সালে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই কর আরোপের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলা হয়, হিন্দুরা রাজি না-হলে কেবল মুসলমানরাই এই কর দিতে প্রস্তুত। সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারাও বলতে লাগলেন যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বর্ণভুক্ত অধিবাসীদের শতকরা একশো ভাগই শিক্ষিত, এই কর প্রবর্তন করলে লাভবান হবে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান। সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ওপর এই করপ্রয়োগ অন্যায়। ব্যবস্থাপক পরিষদে এই নিয়ে যে-তর্ক চলে তাতে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আপত্তি জানিয়ে কয়েকজন সদস্য এমন আচরণ করেন যা কেবল গণবিরোধী নয়, বরং সামন্ত কী বুর্জোয়া দৃষ্টিতেও অত্যন্ত অমার্জিত ও অশোভন।

কিন্তু দেশ তো এইসব নেতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, মানুষ সচেতন থেকে সচেতনতর হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এখানে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে। অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন বাংলার নিভৃত গ্রামেও সাড়া তোলে। গান্ধি, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতা ঘরে-ঘরে

মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। গ্রামের ভাঙাচোরা পাঠশালাগুলোতেও বিদেশিশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রূপান্তরিত হতে থাকে রোষে। মানুষের শিক্ষালাভের স্পৃহা যেভাবে বাড়তে থাকে তাতে এলিটশ্রেণীভুক্ত নেতৃত্ব আর উদাসীন থাকতে পারলেন না। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি অনুকূল হস্তক্ষেপের দাবি উঠতে লাগল।

১৯২৯ সালে হার্টোগ কমিশন প্রতিবেদনে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার করুণ চিত্র প্রকাশ করেন। সেখানে এ-তথ্যও প্রকাশিত হয় যে, এর আগের দুই দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি এবং সাক্ষরতার হার অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এর পরের বছর বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়, এই বছরেই প্রাথমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জেলাগুলোতে জেলা স্কুল বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির মতো এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাইরে যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ে এই প্রতিষ্ঠানের ওপর। জেলা স্কুল ইনস্পেকটারের একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হত সরকারি ট্রেজারি থেকে, তবে স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে। শিক্ষকদের বেতন ছিল খুব কম, সরকারি অফিসের পিওনদের বেতনও তার চেয়ে বেশি। শিক্ষকদের প্রায় সবাই অন্য কোনো পেশার সঙ্গেও জড়িত থাকতে বাধ্য হতেন, এঁদের বেশির ভাগই কৃষক-পরিবারের লোক। মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গেলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতা অব্যাহত রইল। শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তারপর বাপের পেশায় নিয়োজিত হল। তবে পাঠ্যসূচি গোটা দেশ জুড়ে অভিন্ন রাখার আয়োজন চলল।

১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যথারীতি হতাশ মন্তব্য করেন। তাঁরা সুপারিশ করেন যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। ৪০ বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের মধ্যে এই প্রস্তাব যাতে কার্যকর করা হয় সে-ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। বরং দেশভাগের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ২০০০ হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে জেলা স্কুল বোর্ডগুলো বিলোপ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকার প্রায় সবটাই নিজের হাতে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্কুলগুলো বেসরকারিই রয়ে গেছে, কেবল সেগুলোর তত্ত্বাবধান করার কাজ সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে করানো হচ্ছে। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন বা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা পাঠদানের মান উন্নয়ন—কোনো ব্যাপারেই কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, এর প্রমাণ এই যে, এত বাগাড়ম্বর, এত হৈচৈ-এর পর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯৬৩৩ থেকে ১৯৭০ সালে নেমে আসে ২৯০২৯টিতে। রাষ্ট্র যেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য প্রতি ঘণ্টার জন্মহার বৃদ্ধির হিসাব দিয়ে বেড়ায়, বিদ্যালয়ের সংখ্যার ব্যাপারে তারা চুপচাপ ছিল কেন তা ঐ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়।

সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পায়নি। বিশের দশকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে শুরু

করে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের লক্ষ্যে দলেদলে ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করেছিল। কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশে কয়েকটি ন্যাশনাল কলেজ, এমনকী ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল স্কুল পর্যন্ত স্থাপিত হয়। তো ঐ সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক অল্প ব্যয়বহুল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবেননি কেন? জমিদারের প্রতিষ্ঠিত অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এখন পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের বা পুণ্যাত্মা পিতামাতার নাম বহন করে চলেছে। নিজেদের এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাঁদের উদাসীনতার কারণ কী? পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কলেজের সংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েক গুণ। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে গেছে। রাজনীতিবিদরা এই বিষয়টিকে সামনে আনেননি কেন? এখন বিভিন্ন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা সাধারণ কলেজ করার দাবিতে আন্দোলন হয়, এইসব আন্দোলনে শরিক হন স্থানীয় নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ। ঐসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ছেলেমেয়ে কি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে? নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা এর উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয় না। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথা তো ইংরেজ আমল থেকে এমনকী ইংরেজদের আমলারাও বলে এসেছেন। প্রতিশ্রুতিরক্ষায় ইংরেজ আমলাদের সঙ্গে আমাদের রাজনীতিবিদদের কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। ১৯৬২ সালে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি। এরপর ১১ দফা আন্দোলনের প্রথম দফাতেই কলেজগুলোকে বেসরকারি করার দাবি জানানো হয়। ১১ দফার কোথাও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, অথচ তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। কেউ-কেউ হয়তো মনে করেছেন যে, স্বায়ত্তশাসনই সবকিছুর সমাধান। স্বায়ত্তশাসন তো স্বায়ত্তশাসন, ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র পর্যন্ত অর্জিত হল। এরপর প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থাটি কী দাঁড়িয়েছে দেখা যাক।

১৯৭৩ সালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর মানে যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, তবে রাতারাতি সব স্কুলকে সরকারি করা সম্ভব নয় কিংবা একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে কাজটি করতে হয় বলে সম্পূর্ণ সরকারিকরণ করতে কয়েক বছর সময় নেওয়া হয়। এইসঙ্গে প্রস্তাব করা হয় যে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) দেশে ৫০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করা হবে। ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮ বছর করা হোক এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে।

রাষ্ট্রীয়করণের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার, এর মধ্যে প্রায় আটত্রিশ হাজার হল সরকারি এবং বাকিগুলো বেসরকারি। এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র প্রায় দেড় কোটি এবং শিক্ষক দুই লাখের কাছাকাছি। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পরিদপ্তর স্থাপিত হয়, ১৯৮৭ সাল থেকে এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক তত্ত্বাবধান এই

অধিদপ্তর করে থাকে, পাঠ্যসূচি প্রণয়নের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব অধিদপ্তরই পালন করে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগবিধি, চাকুরিবিধি এবং বেতন নির্ধারিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের তুলনায় এই বেতন অনেক কম হলেও স্বীকার করতেই হবে যে গ্রামের অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের তুলনায় তাঁরা এখন সচ্ছল। গ্রাম থেকে সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের লোকজন শহরের দিকে ধাবমান বলে গ্রামের ভাঙাচোরা সমাজে বিত্ত ও বিদ্যার অধিকারী বলে গণ্য করা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। প্রাথমিক শিক্ষকের পদ লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় কেউ-কেউ সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও এই চাকুরির আশায় যথাস্থানে অর্থ বিনিয়োগ করেন। বহুকাল ধরে এঁদের অর্ধাহারে জীবনযাপন করতে হয়েছে, তাঁরা ছিলেন ভদ্রলোকদের করুণা ও কৌতুকের পাত্র। আজ তাঁদের এই ভাগ্যোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ প্রভৃতি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে তোলে।

কিন্তু স্কুলে ভরতি হওয়ার পর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে কতজন শিক্ষার্থী? তাদের ড্রপ আউট বা ঝরে পড়ার হার এখন আতঙ্কজনক। ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পরিসংখ্যান অনুসারে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২২৪৪৯২, সেখানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে ১১১২৫৪৫ জন। এটা হল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাব। বেসরকারি স্কুলগুলোতে এই হার আরও মারাত্মক। ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রস্তুত ভূমণ্ডল ও বাংলাদেশের সুদৃশ্য মানচিত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ খুব কমই ব্যবহার করা হয়। আসবাবপত্রের পরিমাণ বাড়লেও গ্রামের স্কুলগুলোতে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়েকে ক্লাস করতে হয় মাটিতে বসে। শিক্ষা অধিদপ্তরগুলোর গৃহনির্মাণ ও মেরামতের জন্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ তৈরি করা হয়েছে, প্রতি বছর এরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চলেছে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয়ের ঘর ভাঙা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এগুলো একবার নষ্ট হলে সহজে মেরামত হয় না বললেই চলে। একই কামরায় একাধিক ক্লাস হতে দেখা যায় প্রচুর স্কুলে। পুরনো জেলাসদরগুলোতে এবং নতুন জেলাগুলোর কোনো কোনোটিতে জিপগাড়ি রয়েছে, ফ্যাসিলিটিজ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা অফিসের কাজের জন্য সেগুলো বরাদ্দ করা হলেও ভেতরের গ্রামগুলোতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের আগ্রহ কম।

সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি। গোটা শিক্ষার মান অধঃপতনে যাচ্ছে বলে সবাই আক্ষেপ করে, কিন্তু এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। এমনকী মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যসূচি যা-ই হোক, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার সামগ্রিক মানের অবনতি ঘটছে। বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলোকে প্রাইমারি স্কুল বলা হয়, যেসব স্কুলে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালাভ করে, ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উদ্বেগজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে।

উচ্চবিত্তদের কথা না-বললেও চলে, তাঁরা তো প্রায় বিদেশিদের পর্যায়েই পড়েন। উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরতি করতে চান না। এমনকী শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী

নিজের ছেলেমেয়েদের নিজের স্কুলে পড়ান না এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখন অভিভাবকদের লক্ষ্য কিন্ডারগার্টেন বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিচের ক্লাস। কেউ-কেউ মনে করেন যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি মানুষকে বিমুখ করে তুলছে। ধারণাটি ঠিক নয়। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্প্রতি একটু বাড়লেও এদের সংখ্যা এখন পর্যন্ত বেশ কম এবং বৃদ্ধির হারও ধীরগতি। ঢাকা কি চট্টগ্রামে কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল আছে, খুলনায় হয়তো থাকতে পারে। ক্যাডেট কলেজ বা কিন্ডারগার্টেনের মাধ্যম বাংলা। বিষয়গুলো বাংলাতেই পড়ানো হয়, তবে ইংরেজি একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় এবং ইংরেজির ওপর একটু জোরও দেওয়া হয়। অভিভাবকদের ধারণা এই যে ওখানে পড়লে ছেলেমেয়েদের ইংরেজির ভিত্তি পাকা হবে, পোশাক-পরিচ্ছদে তারা পরিপাটি এবং কথাবার্তায় স্মার্ট হয়ে উঠবে। এইসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন, এক প্রজন্ম আগের শিক্ষিত অভিভাবকদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি সতর্ক। এঁরা ছেলেমেয়েদের খাতপত্র সব দেখেন, কোথাও কোনো গোলমাল দেখলে পরদিন স্কুলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করেন, অনেকে মোটা বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। এটা শুধু ঢাকা বা চট্টগ্রামে নয়, দেশের সব শহরেই, এমনকী উপজেলা সদরগুলোতে শিক্ষিত পরিবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঐসব নিম্নশহরেও আজকাল কিন্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দেখতে দেখতে হয়ে পড়ছে নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ড্রপ আউটের হার দেখেই বোঝা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত পড়ে না, আগেই ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কায়ক্লেশে যারা টেকে তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মাধ্যমিক স্কুলের দিকে পা বাড়ায় না। মাধ্যমিক স্কুলে যে-কয়েকজন ঢোকে তাদের আবার অনেকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না, আগেই কোনো-না-কোনো পেশায় ঢুকে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের কেউ-কেউ কলেজেও ভরতি হয়, কিন্তু স্নাতক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারি পড়ছে এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তারা প্রায় নেই বললেই চলে। এখন কিছু আছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার যে-হাল তাতে আগামী এক দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাইমারি স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না সন্দেহ।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাইমারি স্কুলগুলোর এই অবস্থা কেন? নিজেদের ছেলেমেয়েরা পড়ে না বলে এইসব স্কুলের দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোযোগ নেই। আবার শিক্ষিত পরিবেশ থেকে এখানকার শিক্ষার্থীরা আসে না বলে চৌকস ছেলেমেয়ে না-পেয়ে শিক্ষকরাও পাঠদানে উৎসাহ পান না। তাঁরা ঠিকমতো স্কুলে যান না, শিক্ষার উপকরণগুলো ব্যবহারে আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শ্রেণীগত অবস্থান অভিভাবকদের নেই। শিক্ষার্থীদের সাড়া এবং অভিভাবকদের চাপের অভাবে প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ পেয়েও শিক্ষকগণ পেশার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। যতই দিন যায়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ না-হয়ে তাঁরা হতাশায় ক্লান্ত হতে থাকেন।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসার পর ব্যাপারটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজের তত্ত্বাবধানে যখন ছিল তখন ঐসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সমাজের যে অধিকার ছিল এখন তা থাকার কথা নয়।

রাষ্ট্র এখন সমাজ তো বটেই ব্যক্তিরও অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কামরায় তার শাসন-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে, তাদের সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা বলে বিবেচিত। এজন্য ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম এবং টাকাপয়সার জন্য সরকারকে খুব বেগ পেতে হয় না। পশ্চিমের দাতা দেশগুলো এই উদ্দেশ্যে দেদার টাকা ছাড়তে রাজি। তবু এখন পর্যন্ত উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সাড়া তুলতে ব্যর্থ। হাজার বক্তৃতা দিয়ে, পোস্টার বিলি করে এবং নগদ টাকা, লুঙ্গি ও শাড়ির লোভ দেখিয়ে নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষকে পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। জীবনযাপনে যাদের কোনোরকম পরিকল্পনা নেই, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিরূপণে যাদের মাথাব্যথা নেই, সন্তান-প্রজননে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রত্যাশা করা অর্থহীন। পরিকল্পনার জন্য দরকার জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার নিশ্চয়তা। আগামীকাল কাজ জুটবে কি না, পরশু কী খাবে, লুঙ্গিটা শাড়িটা ছিঁড়ে গেলে ফের কিনতে পারবে কি না এইসব তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থেকে পরিবার পরিকল্পনার মতো একটি ছক তৈরিতে মনোযোগী হওয়া কারও পক্ষে অসম্ভব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাঁরা ছেলেমেয়ে পাঠান তাঁরা ঐ শ্রেণীভুক্ত মানুষ। তাঁদের বর্তমানকাল অসহায়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে কী হবে সে-সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। এমন কোনো প্রবৃত্তিও তাঁরা চারপাশে দেখতে পান না যাতে আজ না-হলেও একদিন-না-একদিন স্বাভাবিক জীবনযাপনের সম্ভাবনা আঁচ করা যায়। সুতরাং বইখাতা বিনা পয়সায় হাতে পেলে কিংবা এমনকী ছেলেমেয়েদের পড়তে দিলেই সরকারের লোক এসে হাতে দশটা করে টাকা গুঁজে দিলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখা তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন জিইয়ে রাখে যে-সমাজব্যবস্থা তাকে রাতারাতি ভেঙে ফেলা যায় না। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে না-পারলেও অন্তত সহনীয় করার আয়োজনের বদলে মানুষ কেবল লক্ষ করে যে অতি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির পুরুষানুক্রমে ভোগের জন্য বিপুল বিত্তসৃষ্টির উদ্যোগে রাষ্ট্র তাদের আরও দুর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন কেবল প্রাণে বাঁচা ছাড়া তাদের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসার মতো শিক্ষাও তাদের কাছে বিলাসিতা। রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না-দিয়ে তাকে কেবল নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় নানা ফন্দি আবিষ্কার করতেই নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে। এইসব ফন্দি খুঁজে বের করার জন্য মোটা বেতন দিয়ে আমদানি করা হয় বিদেশি বিশেষজ্ঞদের। পরিবার পরিকল্পনার মতোই প্রাথমিক শিক্ষাতেও বিদেশি টাকা আসছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় নানাভাবে অর্থ দিয়ে চলেছে। এসব সাহায্য কী ধরনের বিনিয়োগ তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এইসব সাহায্যের সঙ্গে আসে শক্ত শক্ত সব শর্ত। বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে আমরা বাধ্য, সেইসব বিশেষজ্ঞ যে-পরিমাণ টাকা নিয়ে যায় তা না হয় বাদই দিলাম, তাদের

টাকা তারা নেবে এতে কার কী বলার আছে? এ নিয়ে কথা বলার মতো বুকের পাটা থাকলে ওদের ভিক্ষে ছাড়া চলার মতো শক্তি অর্জনের চেষ্টাই হয়তো করা হত। কিন্তু মুশকিল হল এইখানে যে এইসব বিশেষজ্ঞ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের নামে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাটা হাতে তুলে নেন। রংবেরঙের নিরীক্ষায় ব্রতী হন তাঁরা, তাঁদের নিরীক্ষাস্পৃহার কঠিন দাম দিতে হয় দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষায় এক-একটি পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ নেন তাঁরা, প্রায় সবসময়েই এগুলো ব্যর্থ হয়, কিছুদিন পর এগুলো বাতিল করে নতুন প্রেরণায় নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য তাঁরা লিপ্ত হন নব পদ্ধতির উদ্ভাবনে। নিরীক্ষাস্পৃহায় উদ্বেল বিদেশি বিশেষজ্ঞরা দুনিয়া চষে নানারকম বাতিল শিক্ষাপদ্ধতি এনে হাজির করেন এবং সেগুলো এখানে প্রচলনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষায় নিরক্ষর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য স্থানীয় সমাজকে সম্পৃক্ত করা দরকার—এই কথাটি ঘোষণা করে তাঁরা একটি বিরল আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন এবং বিশেষ একটি পাঠদানপ্রথা প্রচলনের মাধ্যমে এই তত্ত্বপ্রয়োগের বিপুল আয়োজন চলল কয়েক বছর ধরে। না, নতুন কোনো স্কুল তৈরি হল না, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে কিছু স্কুল বেছে নিয়ে মহা সমারোহে নতুন পদ্ধতির পাঠদান শুরু হল। অন্য একটি দেশে এই পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা চলেছিল, সেখানে সুবিধা করতে না-পেরে বিশেষজ্ঞরা একটি ল্যাবরেটরি খুঁজছিলেন, বাংলাদেশে কিছু টাকা নিয়োগ করে শ'খানেক স্কুলে ল্যাবরেটরি বসালেন। কয়েক কোটি টাকা বেরিয়ে গেল জলের মতো, মোটা টাকা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিরীক্ষা চালালেন, কয়েকজন নেটিভ শিক্ষাবিদ দিব্যি বিদেশ গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন। আবার নিজেরাই মেলা টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করে দেখলেন যে ফলাফল শূন্য। 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'—সুতরাং ফের নতুন আর একটি পদ্ধতি খোঁজা। এবার ড্রপ আউটের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করলেন আর-এক মনীষী। কী?—না, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করে বলে স্কুল ছেড়ে গিয়ে বাপের সঙ্গে লাঙল চষে। প্রতিকার করতে গিয়ে প্রস্তাব করা হল বার্ষিক পরীক্ষা উঠিয়ে দাও, সবাইকে পাশ করিয়ে দিলেই ছেলেমেয়েরা আর স্কুল ছাড়বে না। তাতেও কিছু হয় না। ড্রপ আউট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত—এই সোজা কথাটি তাঁদের মহামূল্যবান ঝুনা করোটি ফুঁড়ে ঢোকাবে কে?

আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা আকাশচুম্বী হলেও শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রশাসনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখানে একেবারে কম নেই। আমাদের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকেই নিজ নিজ পেশায় আন্তর্জাতিক মানের অধিকারী। বিদেশ থেকে আগত শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের তুলনায় এঁদের মান কম নয়। বরং, যতদূর জানি, কোনো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিদেশি বিশেষজ্ঞ এখানে আসেন না। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু মনস্তত্ত্বের উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সেই যোগ্যতার বলে বিদেশি বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছেন মানবশিশুদের লেখাপড়া নিয়ে নিরীক্ষা করতে। নিজের বোলচাল ও বাখোয়াজির জোরে এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছায় তিনি মাসে লক্ষ টাকা বেতন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল তৎপরতা চালিয়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কখনোই গণনার মধ্যেই ধরা হয় না, প্রবীণ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসকদের সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলা হয়, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ

দাতাদের প্রভুত্ব সহ্য করবেন না বলেই এই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় কাঠামোই এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে, যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের সময় অযোগ্য ও আত্মসম্মানবোধশূন্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যাতে প্রভুদের যে-কোনো স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্ন করার প্রবণতা না থাকে। একটি বুর্জোয়া সমাজকাঠামো গঠনের জন্যও দক্ষতা ও প্রজ্ঞা যে অপরিহার্য একথাটি এঁরা মানতে চান না দেখে সন্দেহ হয় যে এঁরা কি দেশে এখন ঔপনিবেশিক অবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর? দেশে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের প্রধান মনোনীত হয়েছিলেন এমন একজন শিক্ষাবিদ যিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কথা প্রচার করতে গৌরব বোধ করতেন। আত্মমর্যাদার অভাবই ছিল তাঁর প্রধান যোগ্যতা এবং জীবনভর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পদলেহন করতে তাঁর আনন্দ ছিল সবচেয়ে তীব্র। কিছুদিন আগে সংস্কৃতি কমিশনের প্রধান নিয়োগের সময়ও এই যোগ্যতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষাস্পৃহা মেটাতে সাহায্য করার জন্য কিছু নেটিভ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের উচ্ছিষ্ট যে-পরিমাণ অর্থ দিয়ে এঁদের নিয়োগ করা হয় তাও আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। এঁদের বেশির ভাগই অবসরপ্রাপ্ত আমলা, কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন শিক্ষাবিদও মাঝে মাঝে সুযোগ পান। অবসর নেওয়ার পর মোটা মাসোহারা নিয়ে এঁরা গোটা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কখনো ঢেলে সাজান, কখনো ভাঙেন, ফের সাজান, ফের ভাঙেন। এঁদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একই ভঙ্গিতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর দিব্যি লাঠি ঘুরিয়ে চলেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকজন ধুরন্ধর বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের দেশি ধান্দাবাজ মিলে নষ্ট করে ফেলেছে—এই কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষক, বিদ্বান শিক্ষাবিদ ও দক্ষ শিক্ষা-প্রশাসক কি অনেক বেশি শক্তি ধারণ করেন না? হ্যাঁ, করেন। এঁদের অনেকেই বর্তমান অবস্থায় সুখী নন, কেউ-কেউ বিরক্ত ও কেউ-কেউ অসহায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদপ্রান্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন লুটিয়ে পড়ে তখন শিক্ষাব্যবস্থাও তা থেকে রেহাই পায় না। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জড়িত রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক শক্তি সংহত করার লক্ষ্যে একটি প্রধান আঘাত হানবে এখানেই। এখন তা-ই করছে। এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে গোটা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে। রাষ্ট্রের স্বভাব, প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা যখন সমাজের হাতে ছিল তৎকালীন সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার ওপর প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। আজ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এই শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ-তোষণ-স্বভাব থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা কি অসম্ভব নয়?

কঠিন, নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ, তবে অসম্ভব কিছুতেই নয়। এই শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই অনুভব করেন যে সমস্যাটি মূলত রাজনৈতিক। কিন্তু সমাজকাঠামোর পরিবর্তন যে-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় তা সময়সাপেক্ষ। সকলের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে যে-কোনো ক্ষেত্রে কাজ করলে এই সংগ্রামকে সাহায্য করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক ও এর নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত শিক্ষাবিদগণ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের নামে নিয়ন্ত্রণের ফন্দি প্রতিহত করতে সচেষ্ট হবেন।

অনেকে অবচেতনভাবে এই প্রতিরোধ করে চলেছেন, সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসক হিসাবে তাঁরা এই উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ অবস্থাটি মেনে নিতে চাইছেন না। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে, এর উন্নয়ন ও ব্যাপক প্রচলন সম্বন্ধে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল হলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষকের পদটিকে লোভনীয় করা হয়েছে, কিন্তু আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হয়নি। উপযুক্ত মর্যাদা না-দিলে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটবে না। শিক্ষক নন—এমন ধড়িবাজ টাউট ধরনের নেতৃত্বে তাঁদের তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন থেকে উদ্ধার করতে পারেন সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক কর্মী।

কেবল প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ নিজ পেশা সম্বন্ধে তাঁদের সশ্রদ্ধ করতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষক হবেন আন্তন শেখবের কল্পনার সেই শিক্ষক যিনি গ্রামের মানুষের যে-কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারেন, দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের সংকটে তাঁদের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় যে-কোনো নতুন উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষকের মতামত সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সততা ও বিষয়ের গভীরে প্রবেশের ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁকে সাহায্য করবেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকগণ। নিজেদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যদি সচেতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংকল্পের সাহায্যে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে এদের প্রতিরোধ করা অবশ্যই সম্ভব। এই প্রতিরোধের সাহায্যে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত গতি আনতে পারবেন, সমস্যার মূল উৎসের অনুসন্ধান করতে পারবেন। তাঁদের এই প্রতিরোধ ও অনুসন্ধান প্রাথমিক শিক্ষাকে গতি দেবে এবং এই কাজের সাহায্যে তাঁরা দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে শামিল হতে পারবেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির উত্তাপ ও গতি

বাংলাকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে পাকিস্তান হওয়ার আগেই এবং এই দাবি যাঁরা তোলেন তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পরপরই দাবিটি একটি আন্দোলনের চেহারা পায়। ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করলে প্রতিক্রিয়া এরকম আশু ও তীব্র হত কি না সন্দেহ। কারণ, শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই ঐ ভাষায় তখন কমবেশি স্বচ্ছন্দ। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইংরেজির সাহায্য নিতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। কিন্তু পাকিস্তানের বাঙালির কাছে তামিল বা পুশতুর মতো একেবারে গ্রীক না-হলেও উর্দু একটি প্রায়-অপরিচিত ভাষা। শহর এলাকায় এই ভাষার মৌখিক ব্যবহারে অনেকে একটুআধটু অভ্যস্ত হলেও এর মাধ্যমে লেখাপড়া করা বা চাকরির প্রতিযোগিতায় নামা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে। খানদানি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উর্দুকে যারা মাতৃভাষা বলে গণ্য করতে চাইত তাদের আভিজাত্যের মতো উর্দুতে তাদের দখলও ছিল একেবারেই ঠুনকো, দুটোরই কোনো ভিত্তি ছিল না। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালী প্রদেশ পাঞ্জাবে শিক্ষিত মুসলমান মাত্রই উর্দুর চর্চা করত এবং নিজেদের মাতৃভাষার তোয়াক্কা না-করে সাহিত্যচর্চা করত উর্দুতে। উর্দু ভাষার এবং উপমহাদেশের দুজন বিশিষ্ট কবি মোহাম্মদ ইকবাল ও ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মাতৃভাষা পাঞ্জাবি। পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার পর পাঞ্জাবেই মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাঞ্জাবিরাও অংশ নিতে পারত। কিন্তু উর্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে পাঞ্জাবি মধ্যবিত্ত বরং পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষানীতির সমর্থক হিসাবে সক্রিয় হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ভারতীয় মুসলমানদের একটি অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির কথা জোরেসোরে বলা হত, সেই অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উর্দুকে উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঐ উদ্ভট সংস্কৃতির কথা বলা হত ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানের আত্মীয়তা-প্রকাশের জন্য যত-না, তার চেয়ে অনেক বেশি হিন্দুদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে। আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রচারের প্রভাব লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, সংস্কৃতিচর্চা মধ্যবিত্তের যথাযথ বিকাশের একটি শর্ত হলেও কেবল সেই ভিন্ন সংস্কৃতিচর্চার, আরও ঠিক করে বললে, সেই সংস্কৃতিসৃষ্টির তাগিদেই মুসলমান মধ্যবিত্ত পাকিস্তান আন্দোলনে নিয়োজিত হয়নি। মধ্যবিত্তের সামগ্রিক বিকাশই

ছিল সেখানে প্রধান আকাঙ্ক্ষা। উর্দুকে মেনে নিলে এই বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় বলে পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্তের প্রায় সিংহভাগ মানুষ ভাষা আন্দোলনে অনুকূল সাড়া দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলে পরিচিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মান্ধ রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারক, এমনকী বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতিতে ইসলাম ধর্মের প্রভাবকে যাঁরা প্রধান উপাদান বলে গণ্য করেন কিংবা/এবং প্রধান উপাদানে পরিণত করার জন্য নানারকম ফন্দিফিকিরে লিপ্ত তাঁদেরও প্রায় সবাই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কেবল উর্দুর দাবির বিরোধিতা করেছেন। বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে গোলাম মোস্তাফা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না যিনি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ব্যক্তিত্বহীন, অযোগ্য ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান বা সৈয়দ সেলিমকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পর্যায়ে রাখার মানে হয় না। পূর্ব বাংলায় যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগ নেতা মনেপ্রাণে বাংলাকেই চাইতেন। কিন্তু বদরুদ্দীন উমরকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, গদিপ্রেমের কাছে তাঁরা ভাষাপ্রেম বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁদের দলের অনেক ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ও সংবাদপত্রকেও ঐ সময় বাংলা ভাষাকে সমর্থন করতে দেখি। এই পর্যায়ে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক প্রায় গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এর নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের হাতে, এর কর্মী সবাই ছাত্র।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলনের মূল স্বভাবে খুব বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটল। এর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসত। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের ঘোরতর অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য আইনমাফিক আন্দোলন কোনো কার্যকর পদ্ধতি নয়—২১ ফেব্রুয়ারি এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করল। ২১ ফেব্রুয়ারি হয়ে দাঁড়াল নির্যাতন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘাতের প্রতীক। এর আগে আমাদের দেশে এরকম হত্যাকাণ্ড আরও ঘটেছে। বাঙালির শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার ইতিহাস এবং এর প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াবার ঐতিহ্যও হাজার বছরের। কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে নানা কৃষক বিদ্রোহ, তাঁতিদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ—শাসকরা এসব দমন করেছে অহিংসার পুণ্য বাণী ছেড়ে নয়, গানের সুরে নয়, ধর্মের অজুহাত দিয়েও নয়, সরাসরি তোপের মুখে। এসব আন্দোলন হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে, আর ২১ ফেব্রুয়ারি গোটা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করল একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের দিকে, ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদের অনুভব করতে লাগল একটি জাতি হিসাবে কিংবা জাতি হিসাবে নিজেদের পরিচয়-অনুসন্ধানে নিয়োজিত হল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতিরোধ, হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আপোস করে সম্ভব নয়। ২১ ফেব্রুয়ারি যে-প্রতিরোধের স্পৃহার জন্ম দিল, দিনে-দিনে ঐ দিনটি উদ্‌যাপনের সঙ্গে তাই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ১৯৫৪ সালে ভাষা আন্দোলনের শত্রু বলে বিবেচিত রাজনৈতিক সংগঠন এই দেশ থেকে চিরকালের মতো উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলা পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল। তখন পরম তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির সুখের মরণ বরণ করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলা ভাষা আদায়ের দাবি জানাবার দিন নয়, মানুষের প্রতিবাদকে প্রকাশ করার, প্রতিরোধকে ভাষা দেওয়ার দায়িত্ব

নিয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার ঐ হত্যাকাণ্ডের মুহূর্ত থেকে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ২১ ফেব্রুয়ারির একমাত্র লক্ষ্য নয়; দেশবাসীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লব ঘোষণা এবং তা সংঘটিত করা হয়ে দাঁড়ায় এর অঙ্গীকার। তাই দেখি, ১৯৫২ সালের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবি মানুষের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে, দাবি আদায়ের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এখানেই। সেই দাবি আদায় হবার আগেই কিংবা হতে–না–হতে পরের ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়েছে নতুন দাবি উত্থাপনের মধ্যে, ঘোষিত হয়েছে নতুন অঙ্গীকার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা ছিল শিশু ও বালক, যাদের জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারির পর, যাদের জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারির অনেক পরে, ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের কাছেও কেবল ইতিহাস নয়। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিচারণ তাদের যত আকর্ষণ করে তার চেয়ে তারা বেশি শিহরিত হয় এর শক্তি দেখে। এটা তাদের কাছে নিজেদের যৌবনের মতো, এখানে তারা নিজেদের শক্তি অনুভব করার শক্তি অর্জন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের কাছে কেবল একটি দিনমাত্র নয়, এটা একটা ঋতু যার শুরু কখনো কেউ বুঝতেও পারে না এবং শেষ এ–পর্যন্ত দেখা যায়নি। তাই, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক বিবর্তনের চাহিদা, রাজনৈতিক দাবি ও সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসা ঘোষণা করার শ্রেষ্ঠ সময় এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির বিবর্তন দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়।

পাকিস্তানের প্রথম পর্যায়ে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে কেবল স্বৈরাচার ছিল তা নয়, স্বৈরাচার বাংলা–প্রেমিকদেরও কিছুমাত্র কম নয় তা আমরা গত বিশ বছর থেকে অহরহই হাড়ে–হাড়ে টের পাচ্ছি, উর্দু চাপানো ছিল একটি সামন্ত মনোভাবের প্রকাশ। উর্দু অবশ্যই সামন্তদের ভাষা বলে পরিচিত হতে পারে না, এই ভাষায় কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ কথা বলে। উর্দুতে প্রগতিশীল সাহিত্যের চর্চা এবং মেহনতি মজদুরের উপর জুলুম এবং তার প্রতিরোধ লড়াইয়ের বাণী বাংলার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেই। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দুভাষীদের মধ্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর বেদনা ও বঞ্চনা বাঙালি শ্রমজীবীর বেদনা ও বঞ্চনার তুলনায় এতটুকু কম নয়। বাঙালি শ্রমজীবী বাঙালি সুবিধাভোগী মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আত্মীয়তা বোধ করেন অন্যভাষী শ্রমজীবীর সঙ্গে। কিন্তু, পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রবল পরিচয় তাদের ধর্ম দিয়ে এবং ঐ পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে উর্দু ছাড়া আর গতি নেই—এই সামন্ত মনোভাবটিই ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রধান যুক্তি। উর্দুকে ঘৃণা করে নয়, বরং ঐ মানসিকতার শাসকদের উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে বাঙালিরা সামন্ত সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যা ছিল একটি ভাষাগোষ্ঠী মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ২১ ফেব্রুয়ারিতে এসে তাই ব্যাপ্তি পেল সামন্ত ধারণাকে ছুড়ে ফেলার সংকল্পে। উর্দু ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং এই ভাষার সাহিত্যে অনুরাগ হল মানবিক প্রবৃত্তি। আর উর্দুর প্রতি আনুগত্য হল সামন্ত–সংস্কার। ২১ ফেব্রুয়ারি এই সংস্কার ও দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করার প্রেরণা। ধর্মের দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঐক্যবদ্ধ করার পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ত তৎপরতাই হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এই রাষ্ট্রের দর্শন আর ব্যবস্থার ওপর মানুষের আনুগত্যকে পরিণত করেছে সন্দেহে, সন্দেহ পরিণত হয়েছে অবিশ্বাসে, অবিশ্বাস পরিণত হয়েছে সম্পূর্ণ অনাস্থায়

এবং এই অনাস্থাকে ২১ ফেব্রুয়ারি রূপ দিয়েছে ঘৃণায় ও ক্রোধে। তাই দেখা গেছে, ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অনেকেই ২১ ফেব্রুয়ারির মূল স্রোতধারা থেকে ছিটকে পড়েছেন। ২১ ফেব্রুয়ারির গতির সঙ্গে পা ফেলে অনেকে চলতে পারেননি। এর তাপ সহ্য করতে না-পেরে অনেকেই আড়ালে পড়ে গেছেন। আজকাল কাউকে কাউকে আক্ষেপ করতে দেখা যায় যে কারাবরণ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলনে অনেক তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা উপেক্ষিত। তাঁদের উল্লেখ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারির গতি ও তাপের সঙ্গে তাঁরা সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি বলে ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ইতিহাস থেকে তাঁরা গড়িয়ে পড়েছেন ঘটনাপঞ্জির স্তূপে। কোনো এককালে আন্দোলনের মস্ত বড় নেতা হলেও এই অবস্থা থেকে তাঁরা উদ্ধার পেতে পারেন না।

২১ ফেব্রুয়ারি ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় যতটা তার চেয়ে তার অনেক বড় গৌরব-ইতিহাস নির্মাণে। ১৯৫২ সালে এই ইতিহাস-নির্মাণের সূত্রপাত এবং আজ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তা ইতিহাস-নির্মাণ এবং সৃষ্টি করেই চলেছে।

ইতিহাসের সৃষ্টির এই গতিধারায় কোনো আপোসকে ২১ ফেব্রুয়ারি সহ্য করে না। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ কখনোই এর চরম লক্ষ্য ছিল না। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাকিস্তান আমলেই পাওয়া গিয়েছিল। পশ্চিম বাংলার অনেক লেখকের ধারণা পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে লুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে পাকিস্তান ছিল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে রাষ্ট্রভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম বাংলায় হিন্দির যে-দাপট এখন লক্ষ করা যায় পাকিস্তানে কোনো সময়েই পূর্ব বাংলায় উর্দু তার কাছাকাছি অবস্থান লাভ করতে পারেনি। এজন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু আবার বলি, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ২১ ফেব্রুয়ারি ফুরিয়ে যায়নি। পরে পাকিস্তান যখন একটি আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করছিল, এই পুঁজিবাদীকে রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদের লেলিয়ে দেওয়া ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী যখন রাষ্ট্র কর্তৃত্ব কবজা করেছিল তখন তার বিরুদ্ধে প্রধান প্রেরণা এসেছে ২১ ফেব্রুয়ারির কাছ থেকেই। ১৯৫৮ সালের পর রাজনীতি যখন বন্ধ, প্রতিরোধের সমস্ত পথ রুদ্ধ করার আয়োজন চলছে একটির পর একটি, তখনও প্রতিবাদী মানুষ নীরবে হাজির হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারির জমায়েতে : ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্যেই প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, পাকিস্তানে সামরিক শাসন না-হলে এবং সংসদীয় রীতির শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে দেশটা টিকে যেত। না, টিকত না। ১৯৫২ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি যতবার এসেছে দেশবাসী ততবার নিজেদের আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে আরও গভীরভাবে নিয়োজিত হয়েছে, এই গভীর আত্মানুসন্ধান কোনোরকম রাষ্ট্রীয় গোঁজামিল সহ্য করতে পারে না। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা মেনে নেওয়া হলে একটি শিথিল কেন্দ্র পাকিস্তানের আয়ু হয়তো আরও কয়েক বছর বাড়লেও বাড়তে পারত। কিন্তু, কিছু বাঙালি রাজনীতিবিদদের ক্ষমতালাভ, বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের পদোন্নতি, কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ীর বড় শিল্পপতিতে রূপান্তর, এমনকী কিছু বুদ্ধিজীবীর তৃপ্ত প্রতিষ্ঠার পরও ২১ ফেব্রুয়ারির অনুসন্ধানবৃত্তিকে ধ্বংস করা যেত না। বুর্জোয়া শোষণকে প্রতিরোধ করার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি স্ফুলিঙ্গের চেহারা গ্রহণ করত। ১৯৬৯ সালকে তখন

হয়তো দুই–এক বছর ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব হত, কিন্তু পাকিস্তানের নতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে মানুষের রুখে দাঁড়ানো আটকাবার সাধ্যি কারও হত না।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও ২১ ফেব্রুয়ারির দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে দেখে। যে–বিপুল সম্ভাবনা ও স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম, জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার নিদারুণ বিনাশে মানুষ যখন হতাশ ও বিচলিত, ২১ ফেব্রুয়ারির স্ফুলিঙ্গই তখন তাকে ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বরাবরই ঘোরতরভাবে প্রতিষ্ঠানিকতা–বিরোধী। পাকিস্তান আমলেই দেখেছি যে, রাষ্ট্র কখনো কখনো ছোঁৎ ছোঁৎ করে এগিয়ে এসেছে তাকে নিজেদের গতরের অংশ করে নেওয়ায় লালসায়। একটি প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়, একটি সামরিক সরকারের আমলে তার খানিকটা সম্প্রসারণ ঘটে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এর সবটাই কবজা করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে, আজও তারা সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত দেয়নি। এতে একুশে ফেব্রুয়ারির তেজ ও শক্তি কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়লেও তার স্বভাবের প্রবণতা অনুসারেই সে আবার ঠিক স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হয়। মানুষকে আবার নতুন সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করার ভার সে নিজেই হাতে তুলে নেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি আজ চল্লিশে পা দিল। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ তাকে এতটুকু স্পর্শ করেনি। প্রথমদিকে তার সঙ্গে ছিল এমন অনেকে আজ আড়ালে চলে গেছে, একুশে ফেব্রুয়ারি এখন নতুন প্রজন্মের প্রেরণা। চল্লিশ বছর পরও ২১ ফেব্রুয়ারির দায়িত্ব এখনও কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। শোষণ ও নির্যাতন, ভক্তি ও আনুগত্য এবং কুসংস্কার ও পশ্চাৎমুখীনতার বিরুদ্ধে যে–প্রতিরোধস্পৃহা একদিন সে জ্বালিয়ে তুলেছিল আজ আবার সেইসব কালো উপসর্গ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের সভ্যতাকে, মানুষের ইতিহাসকে এবং মানুষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে তাকে পেছনপানে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে তৎপর। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির একটি পর্যায় সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্য শুধু মানুষের গতিকে রুদ্ধ করা নয়, সভ্যতার প্রাণস্পন্দনকেও স্তব্ধ করে দেওয়া। ঘড়ির কাঁটার মতো সমাজবিবর্তনকে বিপরীত দিকে নেওয়ার পরিণতি ঘড়ির অবস্থার মতোই হতে বাধ্য, গতির মতো স্তব্ধ হবে তার স্পন্দন এবং মানবিক বৃত্তির বিকাশ চিরকালের জন্য ঘুরপাক খাবে একটি আলোহাওয়াহীন বৃত্তের ভেতর। এই অবস্থায় যারা উল্লাস বোধ করে তারা হয় মানববিরোধী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত গোলাম, নয়তো মানুষের বিবর্তনের সংগ্রাম থেকে অবসর নিয়ে নিরাপদ সুখে বসবাসের জন্য লালায়িত পঙ্গু মানুষ। একই সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদের মচ্ছব কিন্তু কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। মৌলবাদ হল ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করার এবং সভ্যতার স্পন্দন স্তব্ধ করার ঐ চক্রান্তের ফসল। আমাদের এই ২১ ফেব্রুয়ারির দেশেও এর ধাক্কা এসে লাগে বইকী! কুসংস্কার ও পশ্চাৎমুখীনতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নামে সংগঠিত জানোয়ারদের দ্বারা সংঘটিত নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের কীর্তির রেশ কাটাবার পর আমির–ওমরা সেজে ফের বাইরে আসার পাঁয়তারা কষছে। এদের প্রতিহত করার ডাক আমরা জানি ২১ ফেব্রুয়ারির কাছ থেকেই আসছে। দিন যায়, ২১ ফেব্রুয়ারির গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। দিন যায়, ২১ ফেব্রুয়ারির তাপ বাড়তেই থাকে। অনেকে অনেকদূর পর্যন্ত এসেও পেছনে চলে গেছে, অনেকে এই তাপ সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ঝরে পড়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি যৌবনের তেজে উদ্দীপ্ত, তার গতিতে সাড়া দেয় নতুন প্রজন্মের মানুষ, তারা তার তাপকে শুধু সহ্যই করে না, বরং এই তাপে জ্বলে ওঠার জন্য উদ্গ্রীব।

চাকমা উপন্যাস চাই

চাকমা ভাষায় সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ মোটে এক বছরের, তাও বাংলা অনুবাদের হাত ধরে। ভাসাভাসা ধারণা নিয়ে এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ ফেঁদে বসা বেয়াদবির শামিল, এ-ধরনের কম্ম ঘটান মস্ত মস্ত পণ্ডিত-সমালোচকরা, তাঁদের কাছে বিদ্যাচর্চা মানে ছুরিকাঁচি নিয়ে শিল্পীদের ময়নাতদন্তে নামা। কিন্তু আমি আমার মাতৃভাষায় তোতলাতে তোতলাতে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি; কানা হোক, খোঁড়া হোক, সেগুলো আমার অনেক কষ্ট, অনেক সুখ, অনেক পুলক ও অনেক উত্তেজনার প্রকাশ; তাই ঐসব অজর, অক্ষর ও চোখে-পিচুটি-জমা মহাপণ্ডিতদের অত কঠিন কঠিন দায়িত্ব নেওয়া কি আমার পোষায়?

তবে আমি কোন সাহসে চাকমা সাহিত্য নিয়ে লিখি? আমার সাহস হল চাকমা বন্ধুদের সঙ্গে দিনের পর দিন চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া; বাংলায় তাদের কবিতা, গল্প, রূপকথা পড়া এবং চাকমা ভাষায় সেগুলো শোনা; তাদের সঙ্গে গল্প করা, ঝগড়া করা এবং আবার ভাব করার অভিজ্ঞতা। আরও আছে। কী?—সবচেয়ে বেশি সাহস পেয়েছি তাদের সঙ্গে পাহাড়ে, জনপদে, নদীতে, পাঠশালায়, বিহারে, গানের জলসায় এবং কবিতার আসরে খুব কাছ থেকে তাদের দেখে। কয়েক মাস থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে চাকমাদের উপন্যাস চাই। চাকমা শিল্পীর লেখা চাকমা ভাষার উপন্যাস চাই; সেই উপন্যাসের বেশির ভাগ লোক চাকমা, তাদের বাড়ি রাঙামাটি কী খাগড়াছড়ি কী সুন্দরবনের কোনো পাহাড়ি জনপদে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে তাদের বঞ্চনা, অপমান ও প্রতিরোধ এমন মিলেমিশে থাকবে যে একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা যাবে না।

চাকমাদের পুরনো কাব্য উপাখ্যান 'রামাধন ধনপুদি'র বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিনা জানি না, আমি এক তরুণ চাকমা-বন্ধুকে দিয়ে এর ছিটেফোঁটা সামান্য অংশ অনুবাদ করিয়ে নিয়ে পড়েছি, আর গল্পটা শুনেছি অনেকের মুখে। গেংগুলি বা কথকরা পুরুষানুক্রমে চাকমা জনপদে জনপদে এই উপাখ্যান সুরে আবৃত্তি করে বেড়ান। এটি ছাড়াও সমিল ছন্দে রচিত আরও অনেক কাহিনী গেংগুলিরা এখন আবৃত্তি করে বেড়ান। অনুমান করতে পারি যে, তাঁদের সৃজনশীল আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চাকমা গাথার নতুন নতুন প্রসঙ্গ যুক্ত হয়, পুরনো

কিছু-কিছু অংশ হয়তো ঝরেও পড়ে। তবে বড় ধরনের যোগ-বিয়োগ বোধহয় ঘটে না, কারণ পুরনো চাকমা পাথা তাদের গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির সম্পদ, এর গায়ে বড় ধরনের চিড় ধরানো চাকমা গেংগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যতই জনপ্রিয় হোক, আধুনিক চাকমা কি এই উপাখ্যানগুলোতে সম্পূর্ণ সাড়া দিতে পারেন?

বাংলায় চাকমা কবিতা পড়েছি অনেক, বাংলা অনুবাদ পড়ে ও মূল চাকমায় শুনে এটুকু বুঝি যে চাকমা কবিরা আজ ক্ষুব্ধ। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার দুর্যোগ ও নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার অপমান তাঁদের কবিতাকে দিনদিন উত্তেজিত করে তুলছে।

আগে চাকমারা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গেছে জীবিকার তাগিদে; সেটা গৃহচ্যুতি তো নয়ই, এমনকী গৃহত্যাগও তাকে বলা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের, আরও আগে সমগ্র চট্টগ্রামের, সমস্ত পাহাড় জুড়েই ছিল তাদের বাড়ি, চাকমারা ছিল মস্ত বড়, বিশাল বাড়ির বাসিন্দা। সব পাহাড়ই তাদের কোল দেওয়ার জন্য উন্মুখ; নিজেদের শরীর তারা উর্বর করে রাখত, একেকটি পাহাড় নিজের সমস্ত রস উজাড় করে দিয়ে এইসব শান্ত ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দিত। পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা পাহাড়ের স্নেহ নিংড়ে নিয়ে ফের পাড়ি জমাত অন্য পাহাড়ের দিকে। আবার এই 'অন্য' পাহাড়টিও তার দুগ্ধভারাক্রান্ত স্তন নিয়ে নীরবে তাকিয়েই থাকত, ছেলেমেয়েরা পা বাড়ায় সামনের দিকে আর সুখী পাহাড় একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে ফের নিজেকে উর্বর করে সাজাতে তৈরি হয়। পাহাড় এই ছেলেমেয়েদের কী না-দিয়েছে? জুম চাষ করে তারা পাহাড়ের বুক থেকে তুলে এনেছে ধান, যব, নানা সবজি : পাহাড়ের বন থেকে পেয়েছে পশু, পাখি, আর কত রকমের ফল। আবার, ছেলেমেয়েদের পরনের কাপড়ের সংস্থানও হয়েছে পাহাড় থেকেই, পাহাড়ের কার্পাসে তাদের কাপড় তো হয়েছেই, এই তুলা দিয়ে রাজার খাজনাও মেটানো গেছে।

তাই এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে যাওয়া পাহাড়িদের গৃহত্যাগ নয়, বরং মায়ের এক স্তন থেকে আরেক স্তনে মুখ গুঁজে মাকে নিবিড় করে অনুভব করা। এই মায়ের বুক থেকে শিশুর মুখ উপড়ে ফেলার চক্রান্ত কিন্তু আজকের নয়। দুশো বছর আগে গোটা উপমহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করার দক্ষযজ্ঞের শিকার হয়েছে এই পাহাড়ি জাতিরাও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উপনিবেশদাবীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নিয়োজিত হয়েছিল চাকমারা। ঐ সময়টি তো পূর্ব ভারতের সবটা জুড়েই বিস্ফোরণ : সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ওয়াহাবি, ফরায়েজি। একই সময়ে কার্পাস মহলের জুমিয়ারা যে অন্যায় খাজনা দিতে অস্বীকার করে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার মহিমা ঘোষণা করতে আমাদের এত দ্বিধা কেন? দেশের ইতিহাসে তারা ঠাঁই পায় না কেন? দেশের এক কোণে থাকার কারণে তারা ইতিহাসেরও আড়ালে পড়ে যাবে? নাকি তাদের আড়াল করে রাখার চক্রান্তের অংশ হল অন্য জাতের কাছে তাদের ইতিহাস গোপন করা আর তাদের নিজেদের ইতিহাস চাকমাদের ভুলিয়ে দেওয়া? ফরাসি বিপ্লবের পর বলা হয়েছে, বিপ্লব তার নেতাদের খেয়ে ফেলে। এখানে দেখি, বিপ্লবের নেতাদের বংশধররা লুকিয়ে রাখেন পূর্বপুরুষের শৌর্যের কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদের তোষণে নিয়োজিত হয়ে জাতির ইতিহাস মুছে ফেলতে তাঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন।

এতে ইতিহাসের ঘটনা হয়তো চাপা পড়ে, নায়কদের নাম ভুলে যায় মানুষ, ফন্দিবাজ পেশিশক্তির কাছে মাথা না-নুইয়ে নিজেদের তুলার স্তূপে আগুন জ্বালাবার কথাও কেউ মনে

রাখে না। কিন্তু সেই আগুন নেভে না। ধিকিধিকি করে তা জ্বলতে থাকে চাকমা রক্তের ভেতরে। তাদের ওপর একেকটি ঘা এলে তাই লাফিয়ে ওঠে দীপ্ত শিখায়।

উপমহাদেশের রাজনীতি থেকে পাহাড়িদের আড়ালে রাখার যত চেষ্টাই করা হোক, এর ফল থেকে তারা রেহাই পাবে কেন? দেশ ভাগ হয়, দফায়–দফায় দেশ স্বাধীন হয় আর চাকমাদের ঘরে লাগে নতুন নতুন ধাক্কা। গোটা দেশে আলো জ্বালাবার জন্য তাদের বাড়িঘর ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার পানির নিচে। বাঁচার জন্য তারা চলে যায় আরও ভেতরে আরও আড়ালে। বাঁচার লড়াই করতে করতে কষ্টে, দুর্যোগে ও অপমানে নিজেদের পরিচয় নিজেদের কাছে স্পষ্ট হয়। তারা উদ্যোগ নেয় সেই পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার আয়োজনে। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রাষ্ট্রের কাছে গণ্য হয় স্পর্ধা বলে। এই স্বপ্ন মুছে ফেলার আদেশ তারা প্রত্যাখ্যান করলে পেশিশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। আবার নতুন করে গৃহচ্যুত হওয়ার পালা। তাদের রক্তে পাহাড়ের রঙ পালটায়, পেশিশক্তির কাছে তাদের মেয়েরা ভোগ্যবস্তুর বেশি মর্যাদা পায় না। আবার তাদের পালাবার পালা। তবে এবার শুধু পালানো নয়। আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবার তারা ফুটিয়ে তোলে স্পৃহায়, সেই স্পৃহা বিস্ফোরিত হয় সংকল্পে। চাকমারা, পাহাড়িরা রুখে দাঁড়ায়।

চাকমা কবিতা আজ এই স্বপ্নপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে উত্তেজিত। নরনারীর প্রেম সেখানে গৌণ। প্রকৃতি, কেবল প্রকৃতি বলে, কবিতায় ঠাঁই পায় না, প্রকৃতির হৃতসর্বস্ব চেহারা তাদের ক্রোধের কারণ। তাদের প্রকৃতি অন্য পেশিসর্বস্ব শক্তির দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্য সঞ্চিত পাহাড়ের বুকের অন্ন চলে যায় আজ অন্যের গ্রাসে, গাছপালা চেঁছে পাহাড়ের আব্রুহরণ চলছে অহরহ। পাহাড়ে চিবিদ গাছের জায়গায় আজ জলপাই রঙের ছাউনি। গোলাবারুদের গন্ধে পালিয়ে গেছে রংরাং পাখি। চাকমা কবিতা আজ গৃহচ্যুত, মৃত্যু ও হত্যায় নীল এবং একই সঙ্গে প্রতিরোধের সংকল্পে রক্তাক্ত।

কবিতা হল মানুষের অনুভূতির সারাৎসার। চাকমা কবিতা থেকে তাদের বেদনা ও ক্রোধ বেশ আঁচ করা যায়। কিন্তু তাদের সামগ্রিক চেহারা দেখব কী করে? চাকমা–সমাজে আধুনিক ব্যক্তির উত্থান ঘটেছে বলেই তো জাতিগত অপমান তাদের গায়ে এভাবে লাগে, প্রত্যেককে স্পর্শ করে ব্যক্তিগতভাবে। তো এই আধুনিক ব্যক্তিকে সমাজের ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এবং প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও প্রতিরোধের ভেতর জানতে হলে উপন্যাস ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত মাধ্যম আছে কি?

আধুনিক ব্যক্তির অনুভূতিতে প্রকাশের প্রধান মাধ্যম উপন্যাস। শুধু একক অনুভূতি নয়, কোনো একক মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের কালপঞ্জি নয় কিংবা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প–ঘোষণাও নয়, বরং জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের গোটা সত্তাটিকে বেদনায়, উদ্বেগে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশের দায়িত্ব নেয় উপন্যাস। এভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ ঘটে এবং ব্যক্তি তাগিদ পায় মানুষ হওয়ার জন্য। মানুষের সমগ্র সত্তাটির প্রতি এরকম মনোযোগ দেওয়া এখন আর কোনো মাধ্যম কী শাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। দর্শনের আবেদন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, কবিতা স্পর্শ করে আবেগকে। বিজ্ঞানের প্রধান বিবেচনাও মানুষ এবং মানুষই। সৃষ্টি, মহাশূন্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য–উন্মোচনে আজ বিজ্ঞান যেভাবে নিয়োজিত তারও চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু মানুষের কল্যাণসাধন যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, তার বেদনা ও কষ্টের দিকে মনোযোগ

না–দিয়ে মানুষকেই ছাড়িয়ে যায় তখন তার সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ আর থাকে না। আধুনিক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানেরই তৈরি। কিন্তু এই ব্যক্তির খোঁজখবর নেওয়া ও তার স্বপ্নকে লালন করার দায়িত্ব বিজ্ঞান নেয় না। ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাকে শনাক্ত করে মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলার কাজটি নিয়েছে উপন্যাস। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে স্পেনের সারভান্তেস একটি রুগ্‌ণ ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন দন কিহোতোকে। কিহোতোর মৃত্যু তো তার যাত্রা রোধ করতে পারেনি; যেখানেই ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছে উপন্যাস সেখানেই হাজির হয়েছে তার আয়না হয়ে। ব্যক্তির স্বপ্ন ও সংকটকে কেবল সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত করেই উপন্যাস কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। তার ব্যক্তিগত সংকটকে শনাক্ত করে সামাজিক সমস্যা বলে এবং এইভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। সংগঠিত শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেতন হয় গোটা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে।

চাকমা ব্যক্তির উদ্বোধন টের পাই তার তীব্র অপমানবোধের ভেতর, তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে এবং তার পরিচয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পে। এই অপমানবোধ ও প্রতিরোধের স্পৃহা গৌরবান্বিত হয় চাকমা কবিতায়। কিন্তু কেবল অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া আর সংকল্প দিয়ে চিহ্নিত হবে না, এর সবই আসবে জিজ্ঞাসা আর বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। কেবল তখনই চাকমা আধুনিক ব্যক্তি তার জীবনযাপনে চাকমা ইতিহাস, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে সন্ধান করার উদ্যোগ নেবে।

চাকমাদের সমৃদ্ধ কাব্য উপাখ্যান, অপূর্ব রূপকথা, লোকগীতি সবই নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হবে চাকমা উপন্যাসে। লোকসাহিত্য শুধু মিউজিয়ামে রাখার বস্তু নয়। চাকমা শিল্পীর কণ্ঠে চাকমা লোকগীতির সুরের আধুনিক প্রয়োগ শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আধুনিক সংকটে তার প্রয়োগ না–করতে পারলে তার আবেদন তীব্র হবে কেন? গেংগুলিরা তাদের পূর্বপুরুষের গানের প্রতি ভক্তিতে গদগদ। তাঁদের গান যেমন চলছে, তেমনি চলবে। কিন্তু ঐ ভক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েও বলি যে, ভক্তি ঐতিহ্যকে আটকে রাখে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে—ঐতিহ্যের গতিতে তা বরং বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ভক্তির জায়গায় জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ না–এলে আধুনিক চাকমাকে তা কতদিন আর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে? গেংগুলিদের ঐতিহ্যকে জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণের সাহায্যেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মেলাতে পারেন চাকমা ঔপন্যাসিক। আবার বলি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সংগঠিত করতে পারে গোটা সমাজকে। স্বপ্নের বিশ্লেষণ ছাড়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আয়োজন নেওয়া যায় না, জিজ্ঞাসাবঞ্চিত স্বপ্ন একধরনের ইচ্ছাপূরণ মাত্র। উপন্যাসই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনেও স্বপ্নকে শনাক্ত করে এবং তার বিশ্লেষণ করে তাকে সংকল্পে এবং সামাজিক সংকল্পে রূপান্তরিত করার আয়োজন ঘটায়।

উপন্যাস কোনো সমস্যার সমাধান দেয় না, কিন্তু মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দেখায়। বঞ্চিত, অপমানিত ও নিগৃহীত চাকমার সংকটে ও সংগ্রামে উপন্যাস তাকে প্রতিফলন করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনবোধকে পরোক্ষভাবে হলেও সংগঠিত করতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি।

চাকমা সমাজে ব্যক্তি–উদ্বোধনের এই ক্রান্তিলগ্নে চাকমা ভাষা ও চাকমা জাতি আজ উপন্যাসের প্রতীক্ষা করছে। অনুপ্রাণিত ও দায়িত্বশীল চাকমা শিল্পী কি মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির এই তৃষ্ণা মেটাবার উদ্যোগ নেবেন না?

প্রকাশক্রম

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু। *সংস্কৃতি*; আশ্বিন ১৩৯১ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।
উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা। *সংস্কৃতি ;* ফাল্গুন ১৩৯৩ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।
সংশয়ের পক্ষে। *রোববার*; ২ আগস্ট ১৯৮১।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। ঢাকা, ১৯৮৪।
বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে? *বিচিত্রা*; ১৯৯০।
রবীন্দ্রসংগীতের শক্তি। *অপ্রকাশিত।*
বুলবুল চৌধুরী। *রোববার*; ২৪ জুন ১৯৮৪।
শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রকৃতি। *নিসর্গ*; ফাল্গুন ১৩৯৭ : মার্চ ১৯৯১। বগুড়া।
স্মৃতির শহরে কবির জাগরণ। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*; ১৯ ভাদ্র ১৩৮৭ : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮০।
ক্ষুব্ধ শহীদ ক্লান্ত শহীদ। *শহীদুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*। জানুয়ারি ১৯৯৩।
আসহাবউদ্দীন আহমেদের ক্রোধ ও কৌতুক। *উজান স্রোতের যাত্রী*। শ্রাবণ ১৩৯৬।
কৌতুকে ক্রোধের শক্তি। *তৃণমূল*; ১৯৯২।
জতুগৃহে দিনযাপন। *সংস্কৃতি*; পৌষ ১৩৯৪ : ডিসেম্বর ১৯৮৭।
মরিবার হ'লো তার সাধ। *ভোরের কাগজ*; জুন ১৯৯২।
প্রসঙ্গ : সূর্যদীঘল বাড়ী। *চলচ্চিত্রপত্র*; সেপ্টেম্বর ১৯৮১।
অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ। *কোরক*; শারদীয় ১৩৯৭। কলকাতা
লেখকের দায়। *আনন্দবাজার পত্রিকা*; ২৮ এপ্রিল ১৯৯৬। কলকাতা
সায়েবদের শাস্তি। *সংস্কৃতি*; শ্রাবণ ১৩৯০ : জুলাই ১৯৮৩।
গুন্টার গ্রাস ও আমাদের প্যাস্টিক আলসার। *চালচিত্র*; ডিসেম্বর ১৯৮৬।
সমাজের হাতে ও রাষ্ট্রের খাতে প্রাথমিক শিক্ষা। *বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*। ঢাকা, ১৯৯০।
একুশে ফেব্রুয়ারির উত্তাপ ও গতি। *দৈনিক বাংলা*; ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
চাকমা উপন্যাস চাই। *সংস্কৃতি*; আষাঢ় ১৪০০ : জুলাই ১৯৯৩।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩। মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭। প্রকাশিত অন্যান্য বই। গল্প গ্রন্থ : অন্যঘরে অন্যস্বর, খোঁয়ারি, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, গল্প সংগ্রহ। উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা।

প্রচ্ছদ : কাইয়ূম চৌধুরী